আত্ম-সমর্পণ

'স্বয়ংসিদ্ধা' 'জাগ্রতা ভগবতী' 'দুঃখের পাঁচালী' 'অদৃষ্টের ইতিহাস'

প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুচরণ পাবলিশিং হাউস,

কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীরমেশচন্দ্র পাল, বি-এ
গুরুচরণ পাবলিশিং হাউস
২৯।১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

আষাঢ়, ১৩৪৬

দাম দুই টাকা

কলিকাতা, ২৭নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীটস্থ
সাহিত্য-ভবন প্রেস হইতে
শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

[illegible]

আত্ম-সমর্পণ

১

স্কুলের ছুটির পর খাতা বই বগলে করিয়া ছেলেরা বাড়ী ফিরিতেছিল।

অন্যদিন এই সময় ইহাদের কোলাহলে পল্লীপথ মুখরিত হইয়া উঠে, কিন্তু আজ সকল কণ্ঠই সংযত এবং দলটি বিক্ষিপ্ত ও বহুধা বিভক্ত হইয়া মৃদুস্বরে কোনও গুরুতর বিষয়ের গবেষণায় একান্ত ব্যস্ত ছিল।

ইহাদের গবেষণার বিষয় চিত্ত-উপভোগ্য এবং কৌতুকাবহ, একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত নয়। তাহার সংক্ষিপ্ত-সার এইরূপ:—

জমিদার-বাড়ীর ছেলে বিশু শুধু বনেদীয়ানার চালে নয়, নিজের গায়ের জোরে ও সমস্ত বিদ্যার ভারে স্কুলের ছেলেদের এ পর্য্যন্ত কোণ-ঠাসা করিয়া রাখিয়াছিল, কোন ছেলে কোন-বিষয়ে কোন-দিন তাহাকে হারাইয়া দেওয়া ত দূরের কথা—তাহার সমকক্ষ হইতেই পারে নাই। কিন্তু আজ এই স্কুলে এমন এক পড়ুয়া আসিয়াছে, একদিনেই যে লেখাপড়ায় বিশুরই প্রায় সমান সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদিও পাঁচটা আঁকের সব কটাই বিশু 'রাইট' করিয়াছিল, নূতন ছেলেটি একটি শুধু ভুল করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়,—রচনায় সে হইয়াছে 'ফাষ্ট'; পণ্ডিত মহাশয় পর্য্যন্ত বলিয়াছেন—'বাঃ! খাসা ত!'

অতএব, 'বিশু' ছেলেটির এই একচ্ছত্র প্রভাব এতদিন যাহাদিগকে বিদ্যা-মন্দিরে অবহেলিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা আজ এই নবাগত ছেলেটিকে বিশুর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী সাব্যস্ত করিয়া সাদরে নিজেদের দলে টানিয়া লইয়াছিল এবং এমনই ভাবভঙ্গীর সহিত অনুচ্চস্বরে বিশুর বেয়াদপির কথা ও কাহিনীগুলি তাহাকে শুনাইতেছিল—যাহাতে সেগুলি অদূরবর্ত্তী সেই আলোচ্য ছেলেটির কর্ণে সহসা প্রবেশ না করে।

ছেলেদের এই সতর্কটুকু অবলম্বনের একমাত্র কারণ যে, নূতন ছেলেটির বিদ্যার পরিচয় যদিও তাহাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছে কিন্তু তাহার দেহের শক্তির পরিমাণটুকু এখনও তাহারা নির্ণয় করিতে পারে নাই। অথচ এ সম্বন্ধে বিশুর দুর্ব্বার প্রভাব বহুবার তাহারা অনুভব করিয়াছে; দলের মধ্যে যাহাদের সাহস একটু বেশী, তাহারা প্রত্যেকেই একা একা বিশুর সহিত লড়িতে গিয়া যে মার খাইয়াছিল, তাহা কেহই এখনও ভুলিয়া যায় নাই; গায়ের জ্বালায় ইহার শোধ তুলিতে কয়েকবার দল বাঁধিয়াও তাহারা বিশুর উপর 'চড়াও' করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাহাকে দাবাইতে পারে নাই। ছেলেটা এমনই দুর্দ্দান্ত ও গোঁয়ার এবং প্রকৃতি তাহার এমনই উগ্র ও দুর্ব্বার যে, মারামারির সময় আগা-পাছা ভাবিয়া সে হাত চালায় না কোনদিন,—কেহ পড়িল কি মরিল, মাথা ফাটিল কি দাঁত ভাঙ্গিল, সে সব দিকে কোন ভাবনাই তাহার থাকে না, সে যেন হারিবে না—এই পণ করিয়াই মরিয়া হইয়া লড়ে, কাজেই হিসাবী যোদ্ধৃদল খুনখারাপির ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পিছাইয়া পড়ে;—এমন গোঁয়ার যে ছেলে, তাহাকে আঁটা ত সোজা কথা নয়! অগত্যা, এই অঞ্চলের ছেলেরা সকলেই এ-হেন দুর্দ্ধর্ষ ছেলে বিশুকেই 'চ্যাম্পিয়ন' বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। কাজেই বিশুর সহিত ইহাদের আশার প্রতীক

এই নূতন ছেলেটির শক্তি পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে কিছুতেই ইহারা বিশুকে ঘাঁটাইতে পারে না। বয়স ইহাদের যতই কাঁচা থাকুক ও বুদ্ধিশুদ্ধি পরিপক্ক না হউক, তথাপি এই বয়সেই এইরূপ একটা 'পলিটিক্স' ইহারা খাড়া করিয়া ফেলিয়াছিল ও তাহার অনুসরণ করিয়াই কচি কচি মাথাগুলি চালাইতেছিল!

নূতন যে ছেলেটিকে দলে পাইয়া পুরাতন ছেলেদের এতটা স্ফূর্ত্তি ও আস্ফালন, তাহার নাম রহিম। কিন্তু নাম লিখাইবার পূর্ব্বে কেহই সাব্যস্ত করিতে পারে নাই যে, ছেলেটি হিন্দু নয়, মুসলমান।

ছেলেটির চেহারা, চাল-চলন, কথা-বার্ত্তা ও বেশ-ভূষায় তাহাকে হিন্দু বলিয়া ভুল করিবার মূলে এই কারণটুকুই যথেষ্ট ছিল,—যে আনন্দপুর গ্রামে এই স্কুলটি অবস্থিত, তাহারই পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী বাহির-আনন্দপুরের সমস্ত অধিবাসীই যদিও মুসলমান, এবং পরিবার সংস্থিতিও প্রায় সহস্রাধিক, তথাপি সমস্ত গ্রামখানি তোলপাড় করিলেও এমন একটি পরিবারের অস্তিত্ব পাওয়া যাইবে না—যেখানে শিক্ষার ঈষৎ আলো পড়িয়াছে ও সেই আলোকে পরিবারভুক্ত কেহ বালির বাদামী কাগজের উপর কালি-কলমে বর্ণ পরিচয়ের বর্ণ কয়টি দাগিবার যোগ্যতাটুকুও অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে! বিদেশের সিঙ্গার-মেসিন এই পল্লীর প্রায় প্রতি 'দলিজে'ই অপ্রতিহত প্রভাবে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ খানিও এ পর্য্যন্ত এই গ্রামে প্রবেশাধিকার বা আসিবার আহ্বান পায় নাই; প্রয়োজনও হয় নাই। কেন না, কথার আড় ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতেই ওস্তাগর সাহেবদের দলিজে নাম লিখাইয়া সূঁচের ছেঁদায় সুতা পরাইতে পারিলেই শিশুরা যদি খাবার সংস্থান করিতে পারে, পয়সা খরচ করিয়া পাঠশালায় তাহারা নাম লিখাইতে যাইবে কেন? ঘরের কড়ি দিয়া নায়ে চড়িয়া ডুবিতে যাইবার কি দরকার? সুতরাং, সিঙ্গার

মেসিনের চাকার অবিরাম ঘুর্ঘর শব্দ ইহাদের চিত্তে আত্মপ্রসাদের একটা একঘেঁয়ে স্পন্দন তুলিলেও, শিক্ষার সংস্রবে বিশ্বের প্রাণশক্তির যে উদ্দীপনাময় স্পন্দন—তাহার কোন অনুভূতিই এ পর্য্যন্ত ইহাদের দেহ মন প্রাণ স্পর্শ করে নাই !

কাযেই, রহিম তাহার পরিচয় ও পাঠাভ্যাসের অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, স্কুল শুদ্ধ সকলকেই প্রথমে চমকিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। অবশ্য, পরে তাহার কথাসূত্রে সকলেই জানিবার অবকাশ পায় যে, কলিকাতায় চাঁদনী-চকে রহিমের বাবার কাটা কাপড়ের কারবার, তাহারা বরাবর কলিকাতাতেই মানুষ, সেলাইয়ের কারখানা খুলিবেন বলিয়া তাহার বাবা বাঙ্গির-আনন্দপুরে বাড়ী করিয়াছেন। রহিমরা সকলেই এই বাড়ীতে আসিয়াছে। তাহাদের বংশের সকলেই লেখাপড়া শিখিয়াছেন, সেও শিখিবে।

রহিমের এই কাহিনীর পর শিক্ষক মহাশয় স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশে আবেগের সহিত এই মর্ম্মে এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন,—তোমাদের নূতন সহপাঠী এই রহিম ছেলেটিকে দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে, শিক্ষার কি প্রভাব, বিদ্যার সামান্য ছায়াটুকুও মনের ওপর পড়লে মানুষের কত পরিবর্ত্তন হয়, তাকে কেমন সুন্দর দেখায়। ও-পাড়ার দর্জ্জীর ছেলেদের দেখলে তোমরা মুখ ফেরাও, মিশতে চাওনা; তার কারণ, তারা কোনো পুরুষে পাঠশালার ত্রিসীমায়ও আসেনি, বিদ্যার আলো তাদের মনের আঁধারটুকু কাটাতে ত কোনো দিন পারেনি; তাই তাদের ব্যবহার অমন বিশ্রী; মুখে অশ্লীল কথা লেগেই থাকে, ঐটিই হচ্ছে তাদের কথার মাত্রা; এমন কি, আমি, তুমি, আপনি—এসব বলতেও মুখে বাধে, বলবে—মুই, মোর, মোকে, এমনি কত কি ! শিক্ষার দীনতা, সাহচর্য্যের অভাব, এদের এখনও সভ্যতার সংস্রব থেকে পঞ্চাশ বছর পেছিয়ে

দিয়েছে। আর, এদিকেও দেখছ ত রহিমকে, ওদেরই জাত, কিন্তু কত তফাৎ! যেমন চেহারা, তেমন স্বভাব, তেমনই কথাবার্ত্তা, সব দিক দিয়েই চমৎকার। এর কারণ, সুৎশিক্ষা, সৎসঙ্গ, সৎইচ্ছা। এই তিনটে কথা তোমরা সর্ব্বদা মনে রাখবে।

ছুটির পর যে সকল ছেলে পরমোল্লাসে রহিমকে দলে টানিয়া লইয়া বিশুর বিরুদ্ধে একটা দল পাকাইতেছিল, তাহারা শিক্ষক মহাশয়ের বক্তৃতার শেষের তিনটি উপদেশকে তাহাদের অপ্রোচিত কার্য্যাধারার সংশ্রবে শ্রদ্ধা-সহকারেই এইভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, রহিমের মত ছেলের সঙ্গ নিশ্চয়ই সৎ, বিশুকে আশু শিক্ষা দেওয়াও সৎ এবং দুইদলনের ইচ্ছাটুকুও সৎ। সুতরাং এক সঙ্গে তিনটি সৎকার্য্যেই তাহারা উদ্যোগী হইয়াছিল।

স্কুলে প্রথম দিনটি আসিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়া পড়ায় এবং এতগুলি ছেলে দলপতির সম্মান প্রদান করায়, রহিম মনে মনে খুসীই হইয়াছিল। তাহার ভক্তদের অস্ফুট আলোচনায় সে হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়াই চলিয়াছিল; কিন্তু কথার পীঠে যখন বিশুর বেয়াদপির কথা উঠিল ও এক ভক্ত আর্ত্তস্বরে প্রকাশ করিয়া ফেলিল, ওই পথেই একদিন বিশু একটি ঘুসিতে কি করিয়া তাহার দুইটি দাঁত ভাঙিয়া দিয়াছিল,—তখন রহিমের মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল, মুহূর্ত্তের জন্য সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল; তাহার মুখ দিয়া একটা বিস্ময়ের স্বর খুব মৃদুভাবেই বাহির হইল,—সত্যি! সঙ্গে সঙ্গে দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রখর করিয়া তাহাদেরই অগ্রবর্ত্তী দলের মধ্যবর্ত্তী ছেলেটির দিকে চাহিল।

এই দলেই ছিল বিশু,—যাহাকে লইয়া এতগুলি ছেলের এত আলোচনা। বিশু যে একেবারেই একা পড়িয়াছিল, তাহার অবস্থা দেখিয়া একথা বলা চলে না। কেন না, কতকগুলি ছেলে তাহাকেও

পরিবেষ্টন করিয়া চলিয়াছিল এবং রহিমকে খাড়া করিয়া তাহার বিরুদ্ধে যে একটা কাণ্ড উহারা বাধাইবে, তাহারই আভাস দিতেছিল। কথার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে মধ্যে তাহারা পশ্চাদ্বর্ত্তীদের দিকে কৌতুক-ভঙ্গীতে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিয়াও দেখিতেছিল।

বিশুর কিন্তু কোন দিকেই আজ ভ্রূক্ষেপ নাই, সঙ্গীদের কথা তাহার দুইটি কর্ণেই যে ফুটিতেছিল, তাহাতে সংশয় ছিল না, কিন্তু কোন কথা-তেই তাহাকে সায় দিতে দেখা গেল না। সে যেন নিজের মনেই গোঁ-ভরে চলিয়াছে। সমভিব্যাহারী সহপাঠীরা আর কোনও দিন তাহাকে এমন গম্ভীর হইতে দেখে নাই। তাহার এই গাম্ভীর্য্যের কারণটুকুও তাহারা নির্ণয় করিতে পারে নাই। কি এমন তাহার হার হইয়াছে? আঁকে ত কেহই তাহাকে আঁটিতে পারে নাই, আর এইটিই যখন সব চেয়ে কঠিন বিষয়! রচনায় না হয় রহিম তাহার চেয়ে একটু ভাল লিখিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হইয়াছে—যে মুখ ভার করিয়া থাকিতে হইবে!

কিন্তু এই গম্ভীর প্রকৃতি অদ্ভুত ছেলেটির এদিনের মনের গতি তাহার চপলমতি সহপাঠীরা নির্ণয় করিতে পারে নাই; পারিলে বুঝিতে পারিত, —'যেথানে অস্ত্রের লেখা, ব্যথাও তথায়!'

যে ছেলেটি চিরদিন শ্রেণীর পুরোভাগে প্রথম স্থানটুকু সদর্পে অধিকার করিয়া আসিয়াছে, কোন বিষয়ে কোন দিন কেহই তাহার সমকক্ষ হইবার স্পর্দ্ধা করে নাই, আজ বাহিরের এক অপরিচিত ছেলে অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত, তাহার সহিত বোঝাপড়া করিতে! যে পরীক্ষা আজ তাহাদের মধ্যে হইয়াছে, যদিও সে ঠিক হারে নাই, কিন্তু জিতিতেও ত পারে নাই! ইহাই যে তাহার পক্ষে মরণের অধিক হইয়াছে। রচনায় প্রথম হইয়া তাহার কি অহঙ্কার! আর—

চিন্তার সূত্রটা এইখানেই অকস্মাৎ ছিন্ন হইয়া গেল, সন্নিহিত আর একটি দলের কলকণ্ঠের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে।

অদূরেই আনন্দপুরের বড় রাস্তা; বিশুরা যে রাস্তা ধরিয়া স্কুল হইতে ফিরিতেছিল, সেই রাস্তাটি এইখানে আসিয়া বড় রাস্তার সহিত মিশিয়াছে। বিশুদের দলটি বড় রাস্তার উঠিতে না উঠিতেই বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীর দল কোলাহল তুলিয়া অন্যদিকের রাস্তা হইতে তেমাথার ঠিক সংযোগস্থলটিতে দেখা দিল। এই দলটিও ছুটির পর বাড়ী চলিয়াছে এবং ছেলেদিগকে ঠিক এই সময়টিতে দলবদ্ধ হইয়া আসিতে দেখিয়া তাহাদের কচি কচি মুখগুলি কৌতুকোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দলের প্রথমেই ফুলের মত ফুটফুটে যে মেয়েটি ছিল, সে বিশুকে দেখিয়াই মাথার লাল রেশমের ফিতায় বাঁধা বেণীটি দুলাইয়া করতালি দিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া গেল, উল্লাসের উচ্ছ্বাসে কহিল,—বিশুদা, দুদিন আমাদের ছুটি; কালও ইস্কুল নেই, পরশুও নেই।

কিন্তু যাহার উদ্দেশ্যে বালিকা এত বড় উল্লাসের খবরটি দিল, তাহার মুখে উৎসাহের কোন আভাস পাওয়া গেল না। কালো কালো দুইটি আয়ত চক্ষু মেলিয়া বালিকা বিশুর মুখের দিকে চাহিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল, পলকে তাহার সুন্দর মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল; তাহার বিশুদার এমন ম্লান মুখ ত এ সময় সে কোন দিন দেখে নাই!

পশ্চাতের দলটি ইতিমধ্যে ইহাদের অনেকটা নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। এই দলে রহিমের ঠিক পার্শ্বেই ছিল নুটবিহারী, বিশুর উপর ইহারই আক্রোশ ছিল সকলের চেয়ে বেশী; বিশু একদা ইহারই দুটি দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। সে রাগ এখনও তাহার পড়ে নাই; সুযোগ পাইলেই বিশুকে সে দংশন করিবার প্রলোভনটুকু ছাড়িত না, আজও ছাড়িতে পারিল না। বালিকাটি করতালি দিয়া কলকণ্ঠে বিশুর কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইতেই

সে তাহার দিকে আঙুল তুলিয়া রহিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিল,—ঐ মেয়েটাকে চিনে রাখ রহিম, ওর নাম হচ্ছে শোভা—বিশুর হবু বউ!

যে কণ্ঠগুলি এতক্ষণ রুদ্ধ হইয়াছিল, নুটবিহারীর এই অপ্রত্যাশিত সরস উচ্ছ্বাসে তাহারা যেন সহসা মুক্তি পাইয়া কলহাস্যে পল্লীপথ মুখর করিয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে শোভার গোলাপের মত সুন্দর মুখখানি অপরাহ্নের তাপক্লিষ্ট স্থলপদ্মের মত লজ্জাহত হইয়া মুসড়াইয়া পড়িল। আর কোন দিকে না চাহিয়া অচপলভাবে বালিকা নিজের দলের দিকেই ফিরিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই একটা প্রবল ঝাঁকুনিতে স্তব্ধ হইয়া সে চোখ তুলিতেই দেখিল, বিশু তাহার বইয়ের দপ্তরটি জোর করিয়াই যেন তাহার হাতের বই খাতার উপর চাপাইয়া দিতে ব্যস্ত, তাহার মুখের সে ভাবটুকু আর নাই, একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে, চোখের দুটি তারা যেন আকাশের তারার মত চক্ চক্ করিতেছে।

বালিকা দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া দুইজনের বইএর দপ্তর কোনো রকমে সামলাইয়া লইল বটে, কিন্তু পরক্ষণে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার বিশুদার যে কাণ্ড সে দেখিল, তাহাতে নিজেকে সামলাইয়া রাখা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

বিশু ইতিমধ্যেই ঘুসি পাকাইয়া নুটবিহারীর ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি অব্যর্থ আঘাত দিয়াছে যে, তাহার নাক দিয়া রক্তের ধারা ছুটিয়াছে ও সে রক্তে উভয়ের গায়ের জামা রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে।

একটা তীব্র আর্ত্তনাদ তুলিয়া নুটবিহারী মাটির উপর লুটাইয়া পড়িতেই দলের প্রায় সকলেই সভয়ে তফাতে হঠিয়া গেল। নুটবিহারীর দেহের রক্ত তাহার নাক দিয়া বাহির হইতেছে দেখিয়া বিশুর গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, এমন লক্ষণ দেখা গেল না। বরং ভূলুণ্ঠিত নুট-

বিহারীর চাবালি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে দ্বিতীয়বার মুষ্টি উদ্যত করিতে দেখিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু এই আঘাতটি মুটবিহারীর বদনখানি স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই রহিম অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রতায় বিশুর উদ্যত হাতখানি তাহার দুইটি সবল বাহুর সংযুক্ত মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া তীক্ষ্ণস্বরে কহিল,—হচ্ছে কি!

এই অপ্রত্যাশিত অথচ একান্ত আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্যটি ছেলেদের মনে একটা আগ্রহপূর্ণ উদ্দীপনার সঞ্চার করিল বটে, কিন্তু মেয়েগুলি ভয়ে চক্ষু কপালে তুলিয়া ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আর, মুটবিহারীও ঠিক এই সময় কোঁচার খুঁটে নাকের রক্তধারা মুছিতে মুছিতে রহিমের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাঙ্গা গলার কান্নার সুরে আব্দার তুলিল,—রহিম ভাই, তোমাকে বন্ধু বলেছি, যদি বিশের হাতখানা আজ মুচড়ে ভেঙ্গে না দাও ত অতি বড় দিব্যি তোমার রইল!

শোভার হাত হইতে খাতা বই রাস্তার উপর পড়িয়া গেল, সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সে সরোদনে চীৎকার তুলিল,—অ বিশুদা, তুমি চলে এসো, তোমার পায়ে পড়ি বিশুদা, চলে এসো!

মুটবিহারীর নাকে প্রথম আঘাত ও রক্তপাত এবং বিশুর দ্বিতীয় আঘাতের প্রয়াস ও তাহার উদ্যত হাতখানি দুইহাতে ধরিয়া রহিমের বাধা দিবার সঙ্গেই পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি ঘটিয়া গেল।

হঠাৎ এইভাবে বাধা পাইয়া বিশু প্রথমটা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। যে ছেলেটির সম্বন্ধে তাহার সমস্ত মনটাই আজ বিষাইয়া রহিয়াছে, সে যে এ সময় সহসা উপরপড়া হইয়া তাহাকে রুখিবে, ইহা সে কল্পনাও করে নাই। কিন্তু অকস্মাৎ এই ভাবে বাধা পাইয়া সে বুঝিল, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী মুটবিহারী নয়, স্কুলের আঁক ও রচনার পরীক্ষা অপেক্ষা এখানকার পরীক্ষা আরও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

রহিমের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া জ্বালাময় দৃষ্টিতে সে মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মুখের দিকে চাহিল, পরক্ষণেই হাতখানিকে মুক্ত করিয়া লইতে প্রবল বেগে একটা ঝাঁকুনি দিল। কিন্তু হাত মুক্ত হইল না। বিশুর সর্ব্বাঙ্গে তখন বিষের জ্বালা ধরিয়াছিল, সে স্পষ্ট বুঝিতেছিল, যাহারা দূরে দাঁড়াইয়া সকৌতুকে ইহা দেখিতেছে, তাহাদের কেহ যদি এই ভাবে তাহার হাত ধরিত ও সে একটা ঝাঁকুনি দিত, তাহা হইলে সে সঙ্গে সঙ্গে ঠিকরাইয়া রাস্তার খাতে গিয়া পড়িত!

রহিমও মনে মনে বুঝিতেছিল, দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া যে হাতখানি সে দুই হাতে মুষ্টিবদ্ধ করিয়াছে, তাহাকে অধিকক্ষণ আয়ত্ত করিয়া রাখা কতটা সম্ভবপর! সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বীকে একেবারে কাবু করিতে ধৃত হাতখানিতে সজোরে মোচড় দিল।

বিশুর মুখে ক্লেশের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, রুদ্ধকণ্ঠে কহিল,—হাত ছাড়বে না?

রহিম দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল,—না।

বিশু কণ্ঠস্বরে রীতিমত জোর দিয়া আদেশের ভঙ্গীতে কহিল,—এখনো বলছি ছাড়ো!

রহিম কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া উত্তর দিল,—ছাড়তে পারি, যদি দিব্যি কর, ওর গায়ে আর হাত তুলবে না!

প্রস্তাবটা শুনিয়াই বিশু জ্বলিয়া উঠিল, কোন উত্তর দিল না; কিন্তু এমন জোরে আর একটা ঝাঁকুনি দিল যে, রহিম সে বেগ সামলাইতে পারিল না, বিশুর হাত ছাড়িয়া দিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল; কিন্তু পরক্ষণেই উঠিয়া নিজের আসন্ন বিপদটুকু অনুমান করিয়া কয়েক পা পিছাইয়া গিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

বিশু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

শোভা এই সময় পিছন হইতে বিশুর জামার পশ্চাদ ভাগ টানিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে মিনতির সুরে কহিল,—আবার কেন এগোচ্ছ বিশু দা, মিটে ত গেল ; দোহাই তোমার, আর মারামারি ক'র না রাস্তায়—

কিন্তু এ সময় বিশুদা তাহার কথায় কান দিবার পাত্রই বটে ! এক ঝটকায় জামাটা ছাড়াইয়া লইয়া শোভার মুখের দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ করিয়াই সে সক্রোধে মুখখানা ফিরাইয়া লইল।

মেয়েটির ম্লান মুখ ও অশ্রুভরা এক জোড়া অপূর্ব্ব চক্ষুর উপর রহিমও ঠিক এই অবসরে তাহার দুই চক্ষুর পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই সহসা শিহরিয়া উঠিল ; কে যেন তাহার চক্ষুপল্লবের উপর অদৃশ্য কোমল করের অতি মধুর পরশ দিয়া স্মরণ করাইয়া দিল, এই মেয়েটি যেন তাহার অতি আপনার জন, ইহার সহিত যেন কতদিনের তাহার পরিচয়, কতদিন কতবার, কত পরিচিত স্থানেই সে ইহাকে দেখিয়াছে ! কিন্তু কোথায় তাহা সহসা সে নির্ণয় করিতে পারিল না। মেয়েটির মুখের মধুর কথা শুনিয়া, তাহার চক্ষুপ্রান্ত অশ্রুভারাক্রান্ত দেখিয়া, সমবেদনায় এই ভাবপ্রবণ ছেলেটির কোমল চিত্তখানি দুলিয়া উঠিল ; স্থান, কাল ও অবস্থা ভুলিয়া স্নেহাতুর কণ্ঠে সে কহিল,—খুকী, তুমি বাড়ী যাও।

খুকী দুই চক্ষুর দৃষ্টি অস্বাভাবিক উজ্জল করিয়া এই অপরিচিত ছেলেটির দিকে চাহিল, তাহার দৃষ্টি যেন অক্ষর হইয়া তাহাকেও অনুরোধ জানাইল,—তুমিও তা হলে মারামারি করবে না বল ?

রহিমের প্রায় সম্মুখে গিয়াই বিশু রূঢ় কণ্ঠে কহিল,—খুকীর ভাবনা ভাবতে হবে না তোমাকে, নিজের ভাবনাই আগে ভাব।

রহিম প্রস্তুত হইয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিশুর মুখের দিকে চাহিল।

বিশু কহিল,—তোমার সঙ্গে ত আমার ঝগড়া বাধে নি, তবে তুমি আমার হাত ধরলে কেন ?

রহিম উত্তর দিল,—তুমি ওকে মারছিলে তাই।

বিশু দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—ও দোষ করেছিল, তাই শাস্তি দিচ্ছিলুম, তুমি বাধা দেবার কে?

রহিম কহিল,—ওকে শাস্তি দেওয়া বলে না, বরং বলা চলে—মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া। আমি মানুষ, তাই বাধা দিয়েছিলুম।

বিশু কহিল,—মার খেয়েও ও ছেলেটা মাপ চায়নি, তাই আবার ঘুসি তুলেছিলুম; চাইলে, তুলতুম না। আর বছর ওর দুটো দাঁত ভেঙ্গে দিই, সে দাঁত দুটো আবার উঠেছে। আজ ওর নাক ভেঙ্গেছি, এবার দাঁত দুটোও ভেঙ্গে দেব,—যদি না মাপ চায়।

কথা কয়টি জোরের সহিত বলিয়া বিশু রহিমের পাশ দিয়া অদূরবর্ত্তী কুটবিহারীর দিকে ছুটিল। কিন্তু রহিম সঙ্গে সঙ্গে সলম্ফে বিশুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাধা দিবার ভঙ্গীতে কহিল,—না, তুমি ওর গায়ে হাত তুলতে পারবে না—কিছুতেই।

এরূপক্ষেত্রে বিশুর হঠকারিতার প্রকাশ স্বাভাবিক, কিন্তু আজ তাহার আচরণে সংযমের দৃঢ়তাই প্রকাশ পাইল। সে ক্ষণকাল রহিমের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার পর কহিল,—হঠাৎ তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয়, এ আমার ইচ্ছা নয়; কিন্তু দেখছি তুমি ঝগড়া না বাধিয়ে ছাড়বে না।

রহিম কহিল,—তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। ঝগড়া বাধাতে আমিও চাই না, কিন্তু তুমি যে আমার বন্ধুকে কুকুরের মত ঠেঙ্গাবে, তা হবে না।

বিশু কথাটা শুনিয়া ক্রুদ্ধভাবেই কহিল,—আমার যা ইচ্ছা, তা আমি করব; কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ, আমি তা বুঝি।

রহিম একটু বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কহিল,—তুমি শুধু মন্দটাই বোঝ।

বিশুও সশ্লেষে প্রত্যুত্তর দিল,—তাহলে এখনও তুমি এরকম খাড়া থাকতে না।

রহিম বিকৃত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—কি করতে ?

বিশু সহজ কণ্ঠেই উত্তর দিল,—আমার এই হাতখানা তোমার দুখানা হাত দিয়ে যখন চেপে ধরেছিলে, মন্দ ইচ্ছা মনে থাকলে, এই বাঁ হাতখানা চালিয়ে ঐ নুটোর মত তোমার নাকটাও ভেঙ্গে দিতে পারতুম।

মৃদু কণ্ঠে রহিম জিজ্ঞাসা করিল,—দাওনি কেন ? দিলেই ত পারতে।

বিশু এবার দৃপ্তস্বরে উত্তর দিল,—সেটা ঠিক নয়—মন্দ, তাই দিই নি। একজনের দুটো হাতই যখন জোড়া, তখন তার মুখের ওপর ঘুসি চালানো কি উচিত ? তাই চুপ করেছিলুম।

রহিম কিছুকাল স্তব্ধভাবে অপলক দৃষ্টিতে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার মনে হইল, এই ছেলেটির সম্বন্ধে সে যে সব কথা শুনিয়াছে, ইহাকে যতটা নীচ ও নৃশংস সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে, এ ত ঠিক তাহা নহে।

বিশু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিরুত্তর দেখিয়া আর কথা কহিল না, তাহাকে অতিক্রম করিতে প্রয়াস পাইল। কিন্তু রহিম তৎক্ষণাৎ তাহার হাত দুইখানা প্রসারিত করিয়া বিশুর অগ্রগমনে পুনরায় বাধা দিল।

রহিমের পশ্চাদ্ভাগে প্রয়োজন মত দূরবর্ত্তিতা বজায় রাখিয়া আহত নুটবিহারী ও তাহাদের এই দলের অন্যান্য সঙ্গীরা একটা সংঘর্ষের প্রতীক্ষায় ছিল। দুর্ব্বার ক্ষুধা এক্ষণে অদম্য আগ্রহ ও উদগ্র কৌতূহলে পরিণত হইয়াছে। বিশেষতঃ, বাড়ী ফিরিবার এই সরু ও সঙ্কীর্ণ রাস্তাটি অধিকার করিয়া দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দণ্ডায়মান। রাস্তার দুই পার্শ্বে জলপূর্ণ গভীর খাত, অগ্রসর হইবার উপায়ও ছিল না।

এই সঙ্কীর্ণ পথটি আটক করিয়া দাঁড়াইয়াছিল রহিম; হাত দুখানি

প্রসারিত, মুখে দৃঢ়তা। বিশু বুঝিল, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী কিছুতেই তাহাকে নুটবিহারীর কাছে ঘেঁসিতে দিবে না, মারা ত পরের কথা। অথচ, সে যদি এ চেষ্টা ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে তাহারই হার সাব্যস্ত হইবে; সবাই হাসিয়া হাততালি দিয়া বলিবে—দুয়ো, বিশু!

মনে মনে কি একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়াই বিশু সহসা তাহার গায়ের জামাটা সজোরে টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়া অনতিদূরে শোভা যেখানটিকে দাঁড়াইয়াছিল, সেইদিকে ছুঁড়িয়া দিল; পরক্ষণে কোঁচাটি কাছার দিকে গুঁজিতে গুঁজিতে দুই চক্ষু পাকাইয়া রহিমের দিকে চাহিয়া কহিল,—তাহলে এসো, তোমার সঙ্গেই আগে বোঝাপড়া হয়ে যাক।

রহিমও বুঝিয়াছিল, যে রাস্তায় তাহাকে ঘটনাচক্রে দাঁড়াইতে হইয়াছে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত একটা বোঝাপড়া না করিয়া তাহারও ফিরিবার উপায় নাই। এই বয়সেই নিজের শক্তি ও সাহস সম্বন্ধে তাহার একটা অভিমান ছিল, সুতরাং বিশুর আহ্বান প্রত্যাখান করা তাহার পক্ষেও অসম্ভব। সেও তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রহস্তে গায়ের জামা খুলিয়া ফেলিয়া মালকোঁচা আঁটিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে ফিরিল।

সমবয়স্ক, সমভাবে সুশ্রী, সুন্দর স্বাস্থ্যপুষ্ট, সুগঠিতকায়, প্রায় সমতুল্য আকৃতি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কিশোর শক্তি-পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় মুখোমুখী দণ্ডায়মান; অপূর্ব্ব তাহাদের দেহভঙ্গী, অপরূপ উভয়ের জয়াশাদৃপ্ত মুখ ও অতি সতর্ক দুই যোড়া চক্ষুর প্রদীপ্ত দৃষ্টি! সহসা দেখিলেই মনে হয়, যেন একই বংশের দুই সহোদর ভাই রেষারেষী করিয়া দন্দ্বযুদ্ধে নামিয়াছে।

প্রায় সকলেরই মুখে ও চক্ষুতে আগ্রহ উদ্দীপিত, বড় রাস্তা ধরিয়া এই সময় যাহারা গঞ্জে গস্ত করিতে যাইতেছিল এবং ধানের মোট মাথায়

করিয়া ফিরিতেছিল, তাহারাও সারি বাঁধিয়া এই দুইটি ছেলের 'দঙ্গল' দেখিতে দাঁড়াইয়াছে। ছেলেরা ক্লাসে 'পলাশীর যুদ্ধ' পড়ে, সুতরাং তাহাদের উদ্বেলিত মনে দ্বিধা জাগিতেছিল,—কি হয়, কি হয়, রণে, জয়-পরাজয়!

শুধু বালিকা শোভার মুখে উদ্দীপনার কোনো আভাই পড়ে নাই, বরং তাহাদের এই কাণ্ড দেখিয়া ভাবনায় চিন্তায় আশঙ্কায় তাহার মুখের স্বাভাবিক দীপ্তিটুকুও বুঝি নিবিয়া গিয়াছে। এই অপ্রীতিকর ঘটনাটা কিছুতেই তাহার পছন্দ হইতেছিল না, অথচ ইহাতে বাধা দিবার মত তাহার ত কোনো সাধ্যই নাই! সে ত তাহার বিশুদাকে চেনে এবং মেজাজটি যে তাহার কি প্রকৃতির, তাহা জানিতেও ত বাকি নাই! কিন্তু ঐ নূতন ছেলেটি কে? বিশুদার উপরেই বা ওর অত রাগ কেন? যদি বিশুদা সত্যই আজ হারিয়া যায়, ঐ ছেলেটির সঙ্গে জোরে না পারে!—সহসা মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি অনুভব করিয়া বালিকা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল এবং ত্রস্তা কুরঙ্গীর মত ক্ষিপ্রগতিতে বিশুর একখানি হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া অস্বাভাবিক কণ্ঠে কহিল,—আমি তোমাকে লড়তে দেবনা বিশুদা, কিছুতেই না।

এক সঙ্গে একই মুহূর্ত্তে তিন যোড়া চক্ষুর অপূর্ব্ব দৃষ্টি-সংঘাত! বালিকার মুখের নিষ্প্রভ ভাবটুক এখন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, উৎসাহে প্রদীপ্ত দুই চক্ষুর দীপ্তির সহিত অস্তমিত সূর্য্যের রক্তিম আভাটুকুর সংযোগে তাহার মুখখানি যেন ঝলমল করিতেছে।

শোভার এতটা বাড়াবাড়ি বিশু প্রত্যাশাই করে নাই, যুদ্ধের সূচনাতেই একি বিভ্রাট! সে তাহার হাত ধরিয়া বাধা দিয়া প্রথমেই বিঘ্ন ঘটাইতে চায়! বিরক্তিকুটিল দৃষ্টিতে সে শোভার মুখের দিকে চাহিতেই তাহাদের চোখোচোখী হইল; বিশু দেখিল, শোভার চোখে

এখন শুধু মিনতি নয়—আদেশের ভঙ্গীতে অপূর্ব্ব দীপ্তি তাহাতে! পুরক্ষণে দৃষ্টি ফিরাইতেই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর মুগ্ধ দৃষ্টি তাহাকে পলকে উগ্র করিয়া তুলিল। সেও শোভার সুন্দর মুখখানির দিকে তন্ময় হইয়া চাহিয়াছিল। বিশুর চক্ষুর সঙ্গে সঙ্গে শোভার চক্ষুদুটিও বিস্ফারিত হইয়া এই অপরিচিত নূতন ছেলেটির মুখের দিকে পড়িয়াছিল।

একান্ত অবজ্ঞাসহকারে বিশু নিজের হাতটি ছাড়াইয়া লইবে, এমন সময় অদূরবর্ত্তী ছেলের দল সহসা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সভয়বিস্ময়ে দেখিল, অকুস্থলে শিক্ষক মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত!

দুই প্রতিযোগীর কর্ণে শিক্ষক মহাশয় এমনি ঠিক মেঘগর্জ্জনের মতই শুনাইল,—কি হচ্ছে এখানে শুনি?

শোভা ইতিমধ্যে বিশুদার হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া গিয়াছিল এবং বিশু ও রহিম উভয়েই রণবেশ যতটুকু সম্ভব সংবরণ করিয়া লইতে-তৎপর। কিন্তু তাহাদের কৈফিয়ৎ দিবার পূর্ব্বেই রহিমের পক্ষেই ঝুঁকিয়া একজন ব্যাপারটার একটা মনগড়া আখ্যান শুনাইয়া দিল এবং প্রমাণ স্বরূপ প্রদর্শন করিল রক্তাক্ত দেহ হুটবিহারীকে। দোষটা যেন সমস্তই বিশুর, রহিমের উপর হিংসা করিয়া সে তাহাকে পথে মারধর করিতে যায়, হুটু বাধা দেওয়ায় গোঁয়ার বিশুটা ঘুসি মারিয়া তাহার নাক ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

শিক্ষক মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক আরক্ত দুই চক্ষু অস্বাভাবিকরূপে গাঢ়তর রাগরক্ত করিয়া বিশুর দিকে চাহিলেন, তাহার পর তর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—বিশু, এ স্বভাব তোমার কিছুতেই গেল না! গেল বছর তুমি ওর দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিলে, তার শাস্তি বোধ হয় ভুলে গেছ; আবার আজ এই ডাকাতে কাণ্ড বাধিয়েছ! কাল এর রীতিমত বিহিত হবে জেনো। আমি তোমাকে রাষ্টিকেট করব।

সকলেই স্তব্ধ, শিক্ষক মহাশয়ের মুখের উপর কথা কহিবার সাধ্য কোনো ছেলেরই ছিল না।

প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর বিশুর বলিবার আজ কিছু নাই। কিন্তু গোড়ার দিকে তাহার বিরুদ্ধে সনাতন নামে ছেলেটি যাহা যাহা বলিয়া গেল, তাহা যে হুবহু মিথ্যা, সে তাহা দৃঢ়তার সহিত বলিবার জন্য মুখটি তুলিয়াছে, এমন সময় সে অবাক হইয়া দেখিল, তাহারই পরম প্রতিদ্বন্দ্বী ছেলেটী শিক্ষক মহাশয়ের প্রায় সান্নিধ্যে গিয়া বেশ সপ্রতিভভাবেই বলিতেছে,—ও ছেলেটি বিশুর নামে মিথ্যে বলেছে, স্যর! আমার ওপর বিশু হিংসে করেছে কি না জানি না, কিন্তু তাই নিয়ে মারধর ত করে নি; দোষ ছিল গোড়াতে ঐ ছেলেটিরই—বিশু যার নাক ভেঙ্গে দিয়েছে।

রহিমের এই এজেহার ঘটনার সহিত বিচারপদ্ধতির গতি ফিরাইয়া দিল। সকলেই চমৎকৃত, কতকগুলি ছেলের মুখ অবশ্য শুকাইয়া গেল। শিক্ষক মহাশয়ের প্রশ্নে রহিম ঘটনাটির আগাগোড়া সমস্তই হুবহু বর্ণনা করিল, নিজের কথাও লুকাইল না।

শোভারও ডাক পড়িল এবং তেমাথার উপর বড় রাস্তায় যে সকল বালিকা এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদিগকেও সাক্ষ্য দিতে হইল। তাহাদের কথায় রহিমের এজেহার সত্য বলিয়া প্রকাশ পাইল। তথাপি নিষ্ঠুর প্রহারের জন্য বিশুকে শিক্ষক মহাশয় কঠোর তিরস্কার করিলেন।

আহত হুটবিহারীর নাকের রক্ত অগৌণে ধুইয়া একটা টোটকা ঔষধের ব্যবস্থা দিয়া তিনি জনতা ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং তৎসঙ্গে এই মর্ম্মে একটা নূতন ঘোষণাও জারি করিলেন যে, অতঃপর পথে যদি এ রকম ব্যাপার ঘটে, যে যে ছাত্র তাতে জড়িত থাকবে, তাদের রাষ্টিকেট করা হবে। কেউ কোনো দোষ যদি করে, সে কথা স্কুলে আমাকে জানাবে,

আমি বিচার করব। নিজেই যে অন্যের বিচার করতে যাবে, আমার স্কুলে তার ঢোকবার অধিকার থাকবে না।

এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের একটি উপরি পাওনার কাজ ছিল। সেটি বাহির-আনন্দপুরের ওস্তাগরদের দর্জ্জিশালার হিসাবের খাতা পত্র লেখা। প্রত্যহ এই সময়টিতে তিনি ঐ অঞ্চলে যাইতেন। কোনো একটি বিশিষ্ট ওস্তাগরের দলিজে তাঁহার দপ্তরখানা বসিত এবং পাড়ায় যাহাদের কারখানা আছে, তাহারা সেই স্থানে সমবেত হইয়া লেখাপড়া সংক্রান্ত কাযগুলি সম্পন্ন করাইয়া লইত।

কর্ম্মস্থানের উদ্দেশ্যেই শিক্ষক মহাশয় এই সময় এই রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাহাতেই অনিবার্য্য সংঘর্ষটির এমনভাবে সমাধান সম্ভবপর হইয়াছিল।

শাস্তির পর তিনি রহিম ও অন্যান্য ছেলেদের অগ্রবর্ত্তী করিয়া দিয়া তাহাদের অনুসরণ করিলেন।

শোভা রাস্তায় ছড়ানো বিচ্ছিন্ন বইগুলি এক এক খানি করিয়া গুছাইয়া দপ্তরে বাঁধিতেছিল। হাতের এই কাযটি শেষ হইতেই সে উঠিয়া বিশুর দিকে চাহিল। বিশু তখন নিক্ষিপ্ত জামাটা তুলিয়া লইয়া তাহার ধূলা ঝাড়িয়া গায়ে চড়াইবার উপক্রম করিতেছিল। শোভা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া মর্ম্মস্পর্শীস্বরে ডাকিল,—বিশুদা!

শোভার এই কোমল আহ্বান যে বিশুর মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে, তাহার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না; জামাটি গায়ে চড়াইয়া দুই হাতের ঝাপটায় তাহার ধুলাময়লা নিঃশেষ করিতেই সে তখন অখণ্ড মনঃ সংযোগ করিয়াছিল; অথচ, ইতিপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে এতটা ব্যগ্র হইতে শোভাও তাহাকে আর কোনও দিন দেখে নাই।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়াই সে বিশুর এই নিষ্প্রয়োজন প্রয়াস লক্ষ্য

করিল, তাহার পর সহসা একটু হাসিয়া কহিল,—ওতে ধূলো ত আর নেই বিশুদা, মিছিমিছি ওটাকে ঠ্যাঙ্গাচ্ছ যে।

মুখখানা গম্ভীর করিয়া বিশু শোভার দিকে চাহিল, কথাটা সে প্রসন্নভাবে গ্রহণ করে নাই; কিন্তু অতঃপর তাহাকে আর জামার উপর হাতের ঝাপটা দিতে দেখা গেল না, একখানা হাত পীঠের দিকে হেলাইয়া, অন্য হাতখানি শোভার দিকে তুলিয়া সে রুক্ষস্বরে কহিল,—আমার বই দে।

বিশুর বইগুলি শোভা পূর্ব্বেই গুছাইয়া রাখিয়াছিল, সেগুলি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রসারিত হাতখানির উপর তুলিয়া দিল। বইগুলি লইয়াই বিশু গোঁ-ভরে অগ্রসর হইল।

শোভা ছল-ছল চক্ষুতে বিশুর দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল, তাহার পর অভিমানের সুরে কহিল,—বেশ ত তুমি বিশুদা, আমাকে একলা ফেলে চললে!

বিশু ফিরিয়া চাহিল, বিকৃতকণ্ঠে কহিল,—আ—হা—কচি খুকি, পথ চেনেন না—

কথাটা শোভার বুকে বাজিল, আর্ত্তস্বরে কহিল,—তা বলবে বই কি! ইল্লীর ঝুমঝুমুনী বিল্লীর ঘাড়ে,—এ ত জানা কথা—

দুই চক্ষু পাকাইয়া বিশু কহিল,—কি বললি?

শোভা নির্ভয়ে কহিল,—কেন বুঝতে পারনি? সেই ছেলেটার ওপর যত কিছু রাগ এখন আমার ঘাড়েই চাপাচ্ছ, আমিই যেন যত নষ্টের গোড়া!

দৃঢ়স্বরে বিশু কহিল,—ঠিকই ত, তুই পোড়ারমুখী যদি ধিঙ্গীর মত ছুটে এসে কথা না বলতিস, তাহলে ফুটো ও কথা বলতে পারত?

শোভা বিস্ময়ের সুরে কহিল,—বা-রে, আমি ছুটির কথাটা

বলেছিলুম বলেই যত দোষ হল! মুটোর কথা শুনে তুমিই বা অমন করে ক্ষেপে উঠলে কেন? না হয় সে ঠাট্টাই করেছিল, কিন্তু সে ত সত্যি নয়; তুমি তার নাকটা ভেঙ্গে না দিলেই পারতে!

মুখখানা ভ্যাঙ্গাইয়া বিকৃত করিয়া বিশু কহিল,—ভেঙ্গে না দিলেই পারতে!—যেমন তোর বুদ্ধি আর বিদ্যে তেমনি বলবি ত; সে আমাকে ঠাট্টা করবে সবার সামনে, আর আমি তাই শুনে চুপ করে স'য়ে যাব;—আমি ঠিক করেছি—

শোভা কহিল,—তাহলে আমাকে কেন খোঁটা দিচ্ছ! আমি কি করেছি! আমার অতি দিব্যি রইল, আর যদি আমি কখনও তোমার কথায় থাকি—

শেষের কথাগুলি অশ্রুর আবর্ত্তে উচ্ছ্বসিয়া উঠিল। এতটা হইবে বিশু ভাবে নাই, শোভার কথার খোঁচা সে সহ্য করিলেও তাহার চক্ষুর অশ্রু তাহাকে কাতর ও চঞ্চল করিয়া তুলিত। তৎক্ষণাৎ সে তাহার কণ্ঠের স্বর সমবেদনায় গাঢ় করিয়া কহিল,—অমনি, মেয়ের কান্না আরম্ভ হল! কি এমন আমি তোকে বলেছি! আচ্ছা, আমি না হয় মাপ চাইছি, আর তোকে কখনও কিছু মন্দ কথা বলব না, চল ভাই, বাড়ী যাই, যেতে যেতে সব কথাই তোকে বলি।

বালিকা মনের ব্যথা ভুলিয়া গেল, বড় বড় দুইটি চক্ষুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি ছেলেটির মুখের উপর তুলিয়া কহিল,—দেখ দিখিনি, এবার কেমন লক্ষ্মী ছেলে হলে;—চলো।

পরক্ষণেই ইহারা দুটিতে পাশাপাশি আনন্দপুরের বড় রাস্তা ধরিয়া কথা কহিতে কহিতে বড়বাড়ীর অভিমুখে চলিল।

২

প্রেসিডেন্সী বিভাগের বিভিন্ন পরগণার অন্তর্গত বহুসংখ্যক গ্রামের অধিবাসিগণ আনন্দপুরের বড়বাড়ীর সহিত নানা সূত্রে পরিচিত। দীর্ঘকাল হইতেই এই পরিচয় অত্যাশ্চর্য্য বস্তুর ন্যায় এমনই প্রসিদ্ধি পাইয়াছে যে, বর্ষীয়ান দাদামহাশয় ও বর্ষীয়সী ঠাকুমা-দিদিমারা বালকবালিকাগণকে রূপকথা শুনাইবার সময় সাতমহল রাজপুরীর প্রসঙ্গ উঠিলে, আনন্দপুরের বড়বাড়ীর উপমা দিয়া থাকেন। এ উপমা যে এককালে কোনও অংশেই নিরর্থক ছিল না, বর্ত্তমানের বড়বাড়ীর জরাজীর্ণ অবস্থা হইতেও তাহার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। সাতখানা বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন সমন্বিত দুর্গতুল্য সুউচ্চ সুবিশাল অট্টালিকা, বাহির মহলের শ্রেণীবদ্ধ অতিকায় স্তম্ভযুক্ত সুদীর্ঘ পূজার দালান, প্রকাণ্ড অঙ্গন ও চকমিলান মনোরম হর্ম্ম্য, মর্ম্মরময় ভীতিপ্রদ দেউড়ী ও সম্মুখবর্ত্তী বহুদূরব্যাপী হাতা, সারি সারি গগনস্পর্শী শিবমন্দির সংলগ্ন সুগভীর দীর্ঘিকা, উদ্যানের পর উদ্যান এবং এই বিরাট বাস্তুর পরিবেষ্টনে সুপ্রসর পরিখা প্রভৃতি আনন্দপুর গ্রামখানির অর্দ্ধাংশ অধিকার করিয়া বড়বাড়ীর যে অনবদ্য প্রতিষ্ঠাকে স্থায়ী ও কালজয়ী করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস, কালের প্রখর প্রহারে তাহার বাহ্য সৌষ্ঠব অনেকটা শ্রীহীন হইলেও আভ্যন্তরীণ সুষমা এখনও সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া পড়ে নাই; অপূর্ব্ব অতুলনীয় শোভা সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্যের এই অবশেষটুকুই এখনও বঙ্গশ্রীর অতীত অসংখ্য গৌরবময় স্মৃতির প্রতীকরূপেই যেন তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করিতেছে।*

এ-হেন বড় বাড়ীর যিনি বা যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহাদের কথা ও কাহিনী এখন উপকথায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত বংশ-তরুর শাখা-প্রশাখা ও তাহাদের বিভিন্ন অংশে আলম্বিত বিবিধ লতিকা পল্লবিত [illegible] এমন দৃঢ়তার সহিত এই বাড়ীটির সর্ব্বাঙ্গ পরিবেষ্টন

করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইদানীং সর্ব্বধ্বংসী কালপুরুষের কঠোর হস্তের ঘন ঘন প্রহারও ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। এমন কি, প্রচণ্ড ভূমিকম্পে বড় বাড়ীর সংযুক্ত মহলের মধ্যবর্ত্তী খিলান ফাটিয়া যখন একটা ভয়াবহ ফাটলের সৃষ্টি করিল, তখন পল্লীর সকলেই ভাবিয়াছিল, এই দুইটি মহল্লার বাসীন্দাদের এবার বুঝি পথে দাঁড়াইতে হয়! কিন্তু সপ্তাহ মধ্যেই দেখা গেল, ফাটলগুলি রীতিমত দাগরাজি করিয়া পুনরায় বাসোপযোগী করা হইয়াছে; আর একটা ভূমিকম্পের আবর্ত্ত না আসা পর্য্যন্ত তাঁহারা এখন নিশ্চিন্ত।

আনন্দনাথ মুখোপাধ্যায় নামে এক শক্তিমান ভূস্বামী তাঁহার একান্ত অনুরক্ত তিন অনুজের সহযোগিতায় বর্গীবিপ্লবের সময় এই বড়বাড়ীর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারই নামানুসারে সমগ্র গ্রামখানি আনন্দপুর নামে অভিহিত হয়। আনন্দনাথ বাঘকে বশীভূত করিবার ও সাপের মুখে চুমা খাইবার দ্বিবিধ কৌশলই জানিতেন। বাঙ্গালার নবাব আলীবর্দ্দি খাঁর দরবারে গিয়া নবাবের পরম সহায়করূপে যেমন রাজকীয় সম্মান পাইতেন, পক্ষান্তরে নবাবের কালস্বরূপ বর্গী-সরদার ভাস্কর পণ্ডিতের ছাউনীতে দর্শন দিয়া সেই দুর্দ্দর্ষ মারাঠা-ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধাটুকুও আকর্ষণ করিতেন। ইহার ফলে আনন্দপুরের বড়বাড়ীর উপর কোনও দিন বর্গীর লুণ্ঠনস্পৃহা উদগ্র হইয়া উঠে নাই, বরং লুণ্ঠিত প্রচুর ধনরত্ন গচ্ছিতরূপে বড়বাড়ীর কোষাগারে রক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি যে কোনও দিন নির্গত হইবার পথ পাইয়াছিল, এমন কথা শুনা যায় নাই। এই সূত্রে এমন কিংবদন্তীও শুনা যায় যে, যদি নবাব আলিবর্দ্দী বুদ্ধি খাটাইয়া ভাস্কর পণ্ডিতকে তাঁহার দরবারে আমন্ত্রণ করিয়া সুকৌশলে কোতল না করিতেন, তাহা হইলে পণ্ডিত মহাশয়ই নবাবের শিরশ্ছেদ করিয়া শিরোপাস্বরূপ আনন্দনাথকেই বাঙ্গালার মসনদে বসাইয়া দিতেন। কিন্তু

বিচক্ষণ আনন্দনাথ অশ্যো কালনেমীর মত দুরাশার জাল রচনা করিতে ব্যস্ত ছিলেন না, গচ্ছিত বিপুল অর্থরাজির অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিতেই তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য, এরূপ বড়বাড়ীর প্রতিষ্ঠা করিয়াই সানুজ আনন্দনাথ নিশ্চিন্ত ছিলেন না, ইহার রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত বিপুল ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিতে এমন কৌশলে একই সঙ্গে মাথার যুক্তি ও বাহুর শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, বর্গী-বিপ্লবের বিভীষিকা তাহাতে কোনওরূপ আন্দোলন তুলিবার অবকাশ দেয় নাই।

নবাবী আমলের সেই বড়বাড়ী এবং সানুজ আনন্দনাথের বংশধরগণ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া নানারূপ স্বত্বের প্রভাবে অতীতের সহিত বর্ত্তমানের যোগসূত্র এখনও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে বলিয়াই এবাড়ীর উপর সর্ব্বধ্বংসী কালের পুনঃপুনঃ আঘাত ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশস্থলেই দেখা যায়, পুরাকালের গগনচুম্বী প্রাসাদোপম কত শত অট্টালিকা কালক্রমে পরিত্যক্ত হওয়ায় ভগ্ন-স্তূপে ও পশুর বাসায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আনন্দপুর স্বাস্থ্য-সম্পদে সমৃদ্ধ ও নদীমাতৃকা পল্লীরূপে প্রকৃষ্ট বলিয়া অথবা বড়বাড়ীর ঘরগুলি এখনও বাসোপযোগী ও তাহার অধিবাসীরূপে পরিচয় দেওয়াও গৌরবজনক বলিয়া এই সুবৃহৎ বাড়ীর কোনও কক্ষই আজ পর্য্যন্ত জনশূন্য অবস্থায় একটি দিনও পড়িয়া থাকে নাই বা নবাবী আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত এমন একটি সন্ধ্যা বড়-বাড়ীর কোনও কক্ষেই নীরবে প্রবেশ করিয়া তাহার অসীত ছায়া বিকাশ করিতে পারে নাই,—সঙ্গে সঙ্গেই প্রদীপের স্নিগ্ধ শিখা ও তৎসহ শতাধিক শঙ্খ ধ্বনিত হইয়া তাহার অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

বর্ত্তমানে এটি শতাধিক গৃহস্থই নানাসূত্রে এই বড়বাড়ী ও তাহার

অন্তর্গত বিপুল জমিদারীর মালিক। কিন্তু মালিকরা সকলেই যে বংশপতি সানুজ আনন্দনাথের গোত্রানুসারে মুখুটি, তাহা বলা চলে না; বংশপতি চারি ভ্রাতার পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাদি-ক্রমে যেমন বংশলতা পল্লবিত হইয়াছে, দৌহিত্র-প্রদৌহিত্রাদি অনুসারে শাখা-প্রশাখাও সেই পদ্ধতিতে বড়বাড়ী ও তৎসংশ্লিষ্ট ভূসম্পত্তির উপর অধিকার সাব্যস্ত করিয়াছে।

বিশু বা বিশ্বনাথ নামে যে ছেলেটির কথা আমরা এই উপন্যাসের প্রারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছি সে এই মুখুটি বংশেরই মূল বংশধর; বড়বাড়ী ও আনন্দপুর এষ্টেটের বর্ত্তমানে এই ছেলেটিই দু-আনির মালিক। সুতরাং বড় বাড়ীর অপেক্ষাকৃত বড় ও ভাল অংশটি উত্তরাধিকারীসূত্রে বিশুরাই অধিকার করিয়া আছে। ইহাদের মালিকানা স্বত্ব অধিক ও অবস্থা অধিকাংশ সরিকদের তুলনায় অনেক ভাল হইলেও পরিজন সংখ্যা অতি অল্পই। বিশু শৈশবেই পিতৃহীন, মা হেমাঙ্গিনী দেবীই সংসারের অভিভাবিকাও বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়িকা; বিশুর অগ্রজ বা অনুজ কেহ নাই, সে-ই বংশের একমাত্র সন্তান। শৈশবে বিধবা ও নিরাশ্রয়া মাতৃস্বসা দুর্গামণি, বিশুরই সমবয়স্ক পুত্র কিশোর ও কন্যা প্রভার সহিত ভগিনীর সংসারের অন্তর্ভুক্তা হইয়া তাহার কতকটা পুষ্টিবিধান করিয়াছেন।

শোভা নামে যে মেয়েটিকে আমরা বিশুর সংস্রবে দেখিয়াছি, সে বড়-বাড়ীর মূল মুখটিবংশের কন্যা নহে; শোভার পিতামহ এই বংশের সাত পাইয়ের মালিক, রঘুনাথ মুখুজ্যের ভাগিনেয় বংশীধর চক্রবর্ত্তী কলিকাতার অপর পারে শিবপুর নামক অঞ্চলে পৈতৃক জীর্ণ বাড়ীতে কায়ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; নিঃসন্তান মাতুলের আকস্মিক তিরোধানে তিনি শিবপুরের আস্তানা তুলিয়া সপরিবার আনন্দপুরের বড় বাড়ীতে মাতুলের স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া তাঁহার সাত পাই অংশের মালিক

হইয়া বসেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে পুত্র ধরণীধর সহধর্ম্মিণী সাবিত্রীদেবী ও কন্যা শোভার সহিত বড় বাড়ীতেই বসবাস করিতেছেন।

ধরণীধরের পিতা বংশীধর শিবপুরে অবস্থিতির সময়ে প্রচুর ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। মাতুলের সাত পাই সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইয়াই তিনি বসত বাটির ঘর কয়খানি রাখিয়া ভূসম্পত্তিটুকু বিক্রয় করিয়া ঋণমুক্ত হন। সেই সম্পত্তিটুকু যিনি ক্রয় করিয়াছিলেন, তিনিও মূল মুখুটি বংশের এক প্রবল সরিক, চার আনার মালিক এবং মালিকান ভূসম্পত্তির উপর একমাত্র নির্ভর না করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ও আইন পরীক্ষায় কৃতবিদ্য হইয়া ব্রহ্মদেশে সপরিবার ভাগ্য পরীক্ষায় বাহির হইয়া পড়েন। তাঁহার এখানকার সম্পত্তি পরিদর্শন ও বড়বাড়ী রক্ষণাবেক্ষণের ভার বর্ত্তমানে ধরণীধরের উপরেই ন্যস্ত আছে। উক্ত সম্পত্তির মালিক ও উকীল চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত ধরণীধরের একটিবার মাত্র চাক্ষুষ পরিচয় ঘটিয়াছিল; বর্ত্তমানে চিঠি পত্রেই নিয়মিত ভাবে সম্পত্তি সংক্রান্ত কাজকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং ন্যায়নিষ্ঠ ধরণীধর তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বেতন-টুকু ও সরঞ্জামী খাতের খরচ পত্র কাটিয়া লইয়া কিস্তী কিস্তী নিয়মিত মালগুজারি সরকারে দাখিল করেন ও উদ্বৃত্ত টাকা ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় মালিকের বরাবর ব্রহ্মদেশে সরবরাহ করিয়া হিসাব নিকাশ দুরস্ত রাখেন।

ইহা ভিন্ন এক আনা হইতে এক পাই পর্য্যন্ত অংশের যে সকল মালিক বড় বাড়ীর অংশ-বিশেষ অধিকার করিয়া এখনও রাজগী চালাইতে অভ্যস্ত, তাহারা গণনায় অসংখ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এবং এই অসংখ্য পরিবারের মধ্যে কলহ-বিবাদ, দ্বেষাদ্বেষী, দলাদলি ও সেই সূত্রে মামলামকদ্দমা লাগিয়াই আছে।

কিন্তু অন্যতম মালিক হেমাঙ্গিনী দেবী ও তৎপুত্র বিশু এবং অনু-পস্থিত মালিক চন্দ্রনাথের অছি ধরণীধর তাঁহার স্ত্রী সাবিত্রী দেবী ও

কন্যা শোভা,—এই দুই পরিবারের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বরাবরই ঘনিষ্ঠতর হইয়া আছে।

৩

শৈশব অবস্থা হইতেই বিশু ও শোভার ঘনিষ্ঠতা এই সম্প্রীতি দৃঢ়তর করিয়া তুলিয়াছে। এই দুইটি বালক বালিকার প্রীতিপূর্ণ আচরণ উপমাস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বড়বাড়ীতে সমবয়স্ক বালক বালিকার সংখ্যা পর্য্যাপ্ত এবং সুন্দরী বালিকা শোভার সহিত খেলিতে প্রত্যেকেই একান্ত আগ্রহশীল, কিন্তু শোভার লক্ষ্য একমাত্র বিশুদা, সকলকে এড়াইয়া সেই দিকেই তাহাকে ঝুঁকিতে দেখা যায়। বড় বাড়ীর পুরোবর্ত্তী বিশাল প্রাঙ্গনে অপরাহ্নে বালক বালিকারা যখন নানারূপ খেলায় ব্যস্ত, তখন একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইত, এই দুইটি বালক বালিকা খেলাধূলা ছাড়িয়া অদূরবর্ত্তী বকুল-দীঘির চাতালে বসিয়া বকুল ফুলের মালা গাঁথিতেছে,—দীঘির ঘাটের দুই ধারে দুইটি সুবৃহৎ বকুল গাছ, তাহাদের তলদেশ পরিবেষ্টন করিয়া সুপ্রশস্ত বাঁধানো চাতাল, দুই চাতালের মধ্যদেশ দিয়া বাঁধা ঘাটের সোপানশ্রেণী দীঘির কালো জলের ভিতরে গিয়া মিশিয়াছে!

বালক বিশু দীঘির পাড় হইতে বকুল ফুল কুড়াইয়া কোঁচড় পূর্ণ করিয়া চাতালে উপবিষ্টা বাল্যসখীর সম্মুখে ঢালিয়া দিতেছে, বালিকা শোভা হাসি মুখে গোলঞ্চের লতার সাহায্যে ক্ষিপ্রহস্তে মাল্য রচনা করিতেছে।

আবার এই স্থানে বসিয়া উভয়ের মধ্যে কত গল্প চলে, কত কথা কাটাকাটি হয়, কলহও যে বাধে না, এমন কথাও বলা চলে না।

তাড়াহুড়া করিয়া ঝটপট কাজ শেষ করা বিশুর একান্ত অভ্যাস।

অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রচুর ফুল শোভার সম্মুখে স্তূপীকৃত করিয়া দিলে, সে প্রসন্ন মনে হাসিয়া হয় ত বলিয়া বসে,—আর ফুল তোমাকে কুড়ুতে হবে না, বিশুদা। তুমি একটা গল্প বল, আমি মালা গাঁথতে গাঁথতে শুনি।

বিশুর অদ্ভুত স্মরণশক্তি ; যাহা একটিবার শুনে, তাহাই তাহার কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। তাহার মাসীমা ভাল গল্প বলিতে পারিতেন, রাত্রিকালে বিছানায় শুইয়া বিশুয়া তাঁহার গল্প শুনিত এবং যেমনটি শুনিত, ঠিক তেমনই করিয়াই সময় বিশেষে শোভাকে তাহা শুনাইয়া দিত।

সেদিন বিশু পূর্ব্ব রাত্রিতে মাসীমার মুখে শ্রুত একটা ভূতের গল্প শোভাকে শুনাইতে বসিল।

গোলঞ্চের সরু লতার মধ্যে একটি একটি করিয়া ফুল গাঁথিতে গাঁথিতে শোভা আতঙ্ক-বিস্ময়ে এই রোমাঞ্চকর গল্প শুনিতেছিল। গল্প যখন শেষ হইল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে দিগন্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে।

শোভার হাতের মালা ছড়াটিও তখন গাঁথা শেষ হইয়াছে, খোঁপায় সেটি জড়াইতে জড়াইতে সে কহিল,—ভাগ্যিস পরীটার পাখা ছিল, তাই উড়ে পালালো ; আচ্ছা বিশুদা, ভূতের বুঝি পাখা থাকে না?

বিশু বিজ্ঞের মত মুখভঙ্গী করিয়া কহিল,—আরে পাগলী, এ যে নিছক গল্প ; সত্যি কি আর ভূত বলে কিছু আছে যে পাখা থাকবে!

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিশুর দিকে চাহিয়া বালিকা প্রশ্ন তুলিল,—ভূত তাহলে নেই,—বলছ কি তুমি, বিশুদা?

দৃঢ়স্বরে বিশু জানাইল,—না, নেই।

তবে বাড়ীতে সকলে ভূতের কথা বলে কেন?

তা কি [illegible] ?

তাহলে পরীও নেই?

হয়ত নেই, চোখে ত দেখিনি; যা কোনোদিন দেখিনি, কি করে বলব আছে?

তাহলে তোমার গল্পটা নিছক মিথ্যে ত?

গল্প কি আর সত্যি হয়?

যদি হয় না, তবে তুমি মিছি মিছি মিথ্যে কথা বানিয়ে বল কেন? এদিকে ত আমাকে ঘটা করে শেখানো হয়—সদা সত্য কথা বলিবে, কদাচ মিথ্যা বলিবে না;—তবে?

এ ত আর একটা কিছু দোষ করে শাস্তি নেবার ভয়ে অমান্ত করার মত মিছে বলা নয়; এ হচ্ছে একটা মজার কথা শুনিয়ে দেওয়া, সবাই এমন দেয়।

সবাই দেয়?

দেয়। কথামালার গল্পগুলো তা হলে কি? সত্যি বলে মান্‌তে পারবি? দাঁড়কাক ময়ূরের পালক পরে, সিংহীর চামড়া প'রে গাধা সবাইকে ভয় দেখায়, পশুরা সকলে কথা কয়,—এ সব সত্যি নাকি? শুনিছিস্ কোনো দিন আমাদের রাঙ্গী গাইকে মানুষের মত কথা কইতে?

বিশুদার এবারকার কথাগুলি শুনিয়া বালিকা দমিয়া গেল; কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তাহার পর কহিল,—কিন্তু কথামালা যখন পড়ি, তখন ত মিথ্যে মনে হয় না, বিশুদা। মনে হয় যেন সত্যি, যেন তাদের চোখ দিয়ে দেখছি, কথাগুলোও সব শুনছি!

বিশু কহিল,—আমার গল্পটাও কি মিথ্যে মনে হয়েছিল?

বালিকা আগ্রহের সুরে কহিয়া উঠিল,—তা হয় নি। কিন্তু তুমি নিজেই ত বলছ মিথ্যে! আমার কি দোষ বল না?

শেষের কয়টি কথার সঙ্গে সঙ্গে বালিকার দুই চক্ষু অশ্রুভারে স্ফীত হইয়া উঠিল।

বালিকার শেষের আর্ত্তস্বর শুনিয়াই বিশু রুক্ষস্বরে কহিল,—অমনি মেয়ের চোখ ডবডবিয়ে উঠল! আমি কি তোকে বকেছি?

আমি কি তা বলেছি, আমার চোখে অমন জল আসে!

মুখখানি এবার বিকৃত করিয়া বিশু কহিল,—জল আসে; যেন কচি খুকি! একটু যদি কিছু হল, প্যানপেনিয়ে সারা হলেন; বে হলে তখন দেখবি মজা—

অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুটি মেলিয়া বালিকা এবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—আমার বয়ে গেছে বে করতে, কিছুতেই আমি তোমাকে বে করব না।

বিশু এবার কণ্ঠে রীতিমত জোর দিয়া উত্তর দিল,—তোর সঙ্গে আমি যদি আর কখ্‌খনো কথা কই—

বালিকার মুখখানি এ কথায় ছায়ের মত সহসা ফ্যাকাসে হইয়া গেল, কণ্ঠের স্বর মৃদু ও আর্দ্র করিয়া কহিল,—পড়া পর্য্যন্ত বলে দেবে না?

বিশু মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া কহিল,—না।

আমাকে নিয়ে আর খেলবে না? ফুল কুড়িয়ে দেবে না?

না—না—না—

বালিকা একথায় কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল,—সত্যই আড়ি তাহলে দিচ্ছ তুমি বিশুদা, বেশ; আমারও ঐ কথা,—আ—ড়ি!

বলিয়াই বালিকা অঙ্গুষ্ঠটি ভঙ্গী করিয়া চিবুকে স্পর্শ করিল।

বিশু সঙ্গে সঙ্গে চাতাল হইতে এক লম্ফে রাস্তার উপর লাফাইয়া পড়িয়া আপনমনে কহিল,—আচ্ছা, আমি এখন গাঙের ধারে বেড়াতে চললুম, আর ঐ বকুল গাছ থেকে সাঁকচুন্নী নাক বাড়িয়ে এক জনের খোঁপা থেকে গন্ধ ফুলের মালাটাও তুলে নিক্—

আর কোথায় থাকে বালিকার অভিমান; ক্ষিপ্র পদে চাতাল হইতে নামিয়া বিশুর দিকে ছুটিতে ছুটিতে কহিল,—দোহাই তোমার, বিশুদা! আমায় একলাটি ফেলে যেয়ো না, আর কথ্‌খনো আমি তোমার সঙ্গে আড়ি দেব না—

তাহলে ভাব?

সরোদনে বালিকা উত্তর দিল,—ভা—ব।

এই ভাবে এই দুইটি বালক বালিকার খেলা-ধূলা, আড়ি-ভাব ও মান-অভিমানের অভিনয় চলিত। পরিজনগণ পরমানন্দে ইহা উপভোগ করিতেন, ইহাদের উপাখ্যান লইয়া আলোচনাও চলিত; হিতৈষীদের অনেকেই এই বলিয়া উভয় পক্ষের অভিভাবকদিগের সমক্ষে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন,—এমন মিল কখনো দেখিনি, ভগবানই এদের যোট বেঁধে দিয়েছেন, এদের দুটি হাত এক সঙ্গে মিললে রাজযোটক হবে, তোমরা যেন শেষে অন্যমত ক'র না বাপু!

অভিভাবকরা হাসিতেন, বাড়ী ও পল্লীর বালক বালিকারা পরিহাস করিবার একটা উপলক্ষ পাইত। সুতরাং সেদিন ইস্কুলের পথে মুটবিহারী শোভাকে দেখিয়াই যখন পরিহাসের ভঙ্গীতে 'বিশুর বউ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল, তাহা একবারে ভিত্তিহীন ছিল না।

৪

যে সময়ের কথা লইয়া এই আখ্যায়িকার সূচনা, তখন ইয়োরোপের মহাযুদ্ধ রাষ্ট্র-জগতে যেমন চাঞ্চল্যের সাড়া তুলিয়াছে, কতকগুলি ব্যবসায়ে একটা অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়া তেমনই ব্যবসায়ী সমাজকেও চমৎকৃত করিয়া দিয়াছে।

যে সকল ব্যবসায়ী সরকারী পল্টনের পোষাক সরবরাহ করিয়া

আসিতেছিলেন, এইবার তাঁহাদের ব্যবসায়ে মাহেন্দ্রযোগ দেখা দিল। রহমান সাহেব চাঁদনী-অঞ্চলে যদিও খুব বড় রকমের কারবারী বলিয়া পরিচিত ছিলেন না, কিন্তু তিনি-যে সহরের বাহিরের দর্জ্জীদের দ্বারা সুবিধায় অর্ডারী মলে তৈয়ারী করাইয়া সরকারকে সরবরাহ করিতেন এবং এইটিই ছিল তাঁহার বড় কারবার, এ খবর তাঁহার সহ-ব্যবসায়ীরাও জানিতেন না। যখন জানিলেন, যুদ্ধ তখন জাঁকিয়া উঠিয়াছে এবং অধিকাংশ অর্ডারপত্রই চুক্তিবদ্ধভাবে রহমন সাহেবের হস্তগত হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই চাঁদনী মার্কেটে শত মুখে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারিত হইল যে,—রহমন মিঞা তলে তলে তালাও গুলিয়ে ফেলেছে, এবার লাল হয়ে যাবে।

একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও যে সকল স্বাবলম্বী মুসলমান স্বাধীনভাবে লাভজনক ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশেরই, অবলম্বিত-ব্যবসায়ে যে পরিমাণ দক্ষতা দেখা যাইত, উচ্চশিক্ষার দিক দিয়া ততটা অভাবও প্রকাশ হইয়া পড়িত। কিন্তু তথাকথিত ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে দুই এক জন ভাগ্যবান উচ্চশিক্ষার সংস্রবে আসিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন, ব্যবসায়ে অসামান্য সাফল্যের সহিত যেমন তাঁহারা প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রগামী হইতেন, তাঁহাদের অধ্যুষিত সমাজে শিক্ষার বর্ত্তিকা তুলিয়া ধরিয়া শিক্ষা-দীন স্বজাতিকে আদর্শের পথে আকর্ষণ করিতে কিছুমাত্র অবহেলা করিতেন না। উচ্চশিক্ষিত ব্যবসায়ী রহমন সাহেবও করেন নাই।

বাহির-আনন্দপুরের স্বজাতীয় শত শত দর্জ্জী অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে রহমন সাহেবের তহবিল স্ফীত করিয়া তুলিতেছিল; যদিও ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করিয়াই তিনি কার্য্য আদায় করিয়া লইতেছিলেন এবং

এক্ষেত্রে অতিরিক্ত করুণা প্রকাশের কোনও আবশ্যকই তাহার পক্ষে ছিল না, তথাপি তাঁহার স্বজাতীয় শ্রমিকদের শ্রমলব্ধ কার্য্যে লাভের অপ্রত্যাশিত প্রাচুর্য্য দেখিয়া তিনি এই শ্রমিক-গ্রামের সহস্রাধিক স্বজাতিকে মানুষ করিয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

মনের সঙ্কল্প ভবিষ্যতের জন্য ফেলিয়া রাখা রহমন সাহেবের স্বভাববিরুদ্ধ; সুতরাং সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল। মনে দৃঢ় ইচ্ছা এবং হাতে সুপ্রচুর পয়সা থাকিলে সংকার্য্য সম্পন্ন হইতে বিলম্ব হয় না। স্থানীয় জনৈক মাতব্বর ওস্তাগরের সহায়তায় জমি খরিদ করিয়া বাড়ীর পত্তন আরম্ভ হইয়া গেল। স্থির হইল, কলিকাতার বাসা তুলিয়া সপরিবার তিনি বাহির-আনন্দপুরে তাঁহার জাতি-ভ্রাতাদের মধ্যে বাস করিবেন। ইহাতে তাঁহার ব্যবসায়ের যেমন সুবিধা হইবে, তেমনই তাঁহার ব্যবসায়ের সহিত সংস্থষ্ট সহধর্ম্মীদের মধ্যে আবহমান কাল হইতে প্রচলিত কুসংস্কার এবং সেই সূত্রে সত্যকার যে সকল অভাব ও সমস্যা বর্ত্তমান, তাহাদের সংস্কার ও সমাধান হইয়া যাইবে।

কয়েক মাসের মধ্যেই মাঝারী রকমের একখানি পাকা বাড়ীর নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়া গেল। বাড়ীখানির কোনওরূপ বাহ্যাড়ম্বর না থাকিলেও দিব্য পরিষ্কার ও হাওয়াদার,—আবরু রক্ষা করিতে বায়ুর গতিপথ অবরুদ্ধ করিবার কোনও ব্যবস্থাই অতি সন্তর্পণে অবলম্বিত হয় নাই। বাহিরের দিকে পাকা দালান;—এখানেই পল্লীর ওস্তাগরদের চিরপরিচিত 'দলিজ' বা দর্জ্জিখানা। সুদীর্ঘ দালান যুড়িয়া লম্বা লম্বা মাদুর বিছানো, তাহার উপর সারি সারি সিলাইয়ের কল। দর-দালানের দুইদিকে দুইজন বিচক্ষণ ওস্তাগরের স্থান, তাঁহাদের নির্দ্দেশ অনুসারে নানা বয়সের বহু সংখ্যক দর্জ্জী সীবন-শিল্পের সাধনা করে।

বসতবাড়ী ও বাহিরের দর্জ্জীখানার কার্য্য সম্পূর্ণ হইতেই আনন্দপুর

ও বাহির আনন্দপুরের সংযোগস্থলে অপেক্ষাকৃত প্রকাশ্য রাস্তার ধারে সংগৃহীত ভূখণ্ডের উপর অতি তৎপরতার সহিত আর একখানি পাকাবাড়ীর নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছিল। কি অভিপ্রায়ে পল্লীর বাহিরে এই বাড়ীর পত্তন, ইহা জানিতে পল্লীবাসীদের আগ্রহ বর্দ্ধিত হইলেও রহমন সাহেব কিছুই প্রকাশ করেন নাই, শুধু বলিয়াছিলেন,—এই ইমারতের কাজটুকু শেষ হলেই আমিও এখানে কায়েমী হয়ে বসব,—তখনই আপনারা সবাই জানতে পারবেন, কি উদ্দেশ্যে এটা বানান হচ্ছে।

অগত্যা কৌতুহলী অধিবাসিগণকে ইমারতের কাযটুকু শেষ হইবার দিনটির দিকে তাকাইয়া আগ্রহ দমন করিতে হইয়াছে। বাসা এবং ব্যবসায় এখানে পাতিলেও রহমন সাহেব নিজে এখানে পাকা হইয়া বসিতে পারেন নাই,—কলিকাতাতেও তখন তাঁহার বহু কার্য্য, যদিও জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র আনোয়ার ও নজিরার সে কার্য্যে লিপ্ত থাকে, তথাপি মাথার উপর তিনি না থাকিলে চলে না। এদিকে পল্লীবক্ষে স্বজাতি দর্জীদের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে তাঁহার অবস্থিতি অপরিহার্য্য; অগত্যা দুই দিক বজায় রাখিতে কনিষ্ঠপুত্র রহিম, বালিকা কন্যা পরিবানু এবং পত্নী আমিনাকে পল্লীর নূতন বাটিতে পাঠাইলেন এবং ইহাদের অভিভাবকস্থানীয় হইয়া দেখা শুনার ভার দিলেন সম্পন্ন প্রতিবেশী প্রবীণ ওস্তাগর ওয়ারিশ আলীর উপর। ইনি বাহির-আনন্দপুরের মুসলমান-সমাজের মাথাওয়ালা মুরুব্বীবিশেষ এবং কাটা-কাপড়ের কারবার ও সকল প্রকার ক্ষমতার খ্যাতিও ইঁহার প্রচুর। এ অঞ্চলে রহমান সাহেবের প্রতিষ্ঠার সূচনা হইতেই ইনি ছিলেন প্রধান সহায়ক এবং সুশিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি রহমন সাহেব তাঁহারই সমবয়স্ক পল্লীবাসী এই বহুদর্শী ওস্তাগরটিকে নিরক্ষর জানিয়াও ইঁহার সরলতা, ঔদার্য্য, আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বকৃত উপার্জ্জনে

প্রচুর বিত্ত প্রতিষ্ঠার ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া সংযোগী বন্ধুর মর্য্যাদাই দিয়াছিলেন।

রহমন সাহেবের নূতন বাড়ীর বাহির-মহলে সুবৃহৎ দালানে দর্জ্জীদের কাজকর্ম্মের সম্পূর্ণ তদারক করেন ওস্তাগর ওয়ারিশ আলি এবং অন্দর মহলে নূতন-পাতা সংসারটির উপর লক্ষ্য রাখেন ওস্তাগর সাহেবের সহধর্ম্মিণী সাকিনা ও তাঁহার সুবৃহৎ পরিবারের অন্যান্য মেয়েরা। পাশাপাশি বাড়ী বলিয়া দুই পরিবারের মেয়েদের মিশিবার যেমন সুবিধা হইয়াছে, ঘনিষ্ঠতাও ইতিমধ্যেই নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে।

ওস্তাগর সাহেবের কন্যার নাম হাজী। যে বৎসর সাহেব মক্কাসরীফে 'হজ' করিতে গিয়াছিলেন, সেই বৎসরেই এই কন্যাটি ভূমিষ্ঠা হইয়াছিল, সেইজন্যই 'হজে'র স্মৃতিরক্ষা কল্পে কন্যার নামকরণ করেন—হাজী। মেয়েটির গায়ের রং যদিও খুব ফরসা নয়, কিন্তু অঙ্গসৌষ্ঠব ও মুখের গঠন মোটের উপর ভালই। তবে তাহার বয়সের সীমা প্রায় তেরোয় গিয়া পঁহুছাইলেও এ পর্য্যন্ত সে অবিবাহিতাই আছে এবং ইহাতে প্রতিবেশীদের মধ্যে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যও উঠিয়াছে। এ অঞ্চলে বাল্যবিবাহ প্রথা স্মরণাতীত কাল হইতেই প্রচলিত; পনেরো ষোলো বছরের অকৃতদার ছেলে এবং আটের উপরে অনূঢ়া মেয়ে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়, এবং যাহাদিগকে দেখা যায়, কোন বিশেষ প্রতিবন্ধকতাই তাহাদের দাম্পত্য-জীবনের মিলন-গ্রন্থী রচনা করিতে দেয় নাই।

মহাযুদ্ধের বাজারে পিতার অনবসর কার্য্যের চাপেই হাজীর অদৃষ্টে এ পর্য্যন্ত 'বিবি' হইবার সুযোগ আসে নাই। একটু সামলাইয়া লইয়া বেশ ঘটা করিয়াই মেয়ের 'সাদি' দিবেন, ইহাই ছিল ওয়ারিশ ওস্তাগরের বাসনা। কিন্তু এদিকে যখন একটু সামলাইলেন, রহমন সাহেবের বেগার তখন ঘাড়ে পড়িল, সেই সঙ্গে দুটি তৃপ্ত চক্ষুর উপর ভাসিয়া উঠিল—বন্ধু-

পুত্র রহিমের সুন্দর চেহারাখানি; মনে মনে ভাবিলেন,—বাঃ, খাসা ছেলে; হাজীর সঙ্গে দিব্যি মানাবে!

মনের কথা বন্ধুর কাণে উঠিতে বিলম্ব হইল না, তিনি হাসিয়া কহিলেন, —ভালই ত, এতে আর বাধা কি! তবে একটু কথা আছে।

কথাটাও তিনি তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট করিয়াই ব্যক্ত করিলেন; যথা,—তাঁহাকে এখন দুই নৌকায় দুইখানি পা রাখিয়া টাল সামলাইতে হইতেছে; কলিকাতার কারবারের একটা পাকা ব্যবস্থা করিয়াই তিনি যেমন এখানে স্থির হইয়া বসিবেন, তখনই সমারোহের সহিত এই কাজটুকই আগে সারিবেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত এ কাজ না হইতেছে, মেয়েটিকে একটু লেখাপড়া শিখাইবার ও সেই সঙ্গে চালাক-চতুর হইতে সুযোগ দিবার ব্যবস্থা করা চাই।

রীতিমত বিস্মিত হইবার কথাই বটে! যে অঞ্চলে এ পর্য্যন্ত বিদ্যার আলোক পড়ে নাই, ছেলেরাই সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; হাজী মেয়ে হইয়া সেই অজ্ঞাত পথে ছুটিবে,—বাবুপাড়ার মেয়েদের মত পাঠশালায় যাইয়া 'ল্যাকা-পড়ুই' করিবে! কি তাজ্জব!

কিন্তু রহমন সাহেব তাঁহার কন্যা পরিবানুকে ডাকিয়া তাহার বিদ্যার পরিচয়টুকু যখন দিলেন, তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া ওস্তাগর সাহেব ত একেবারে অবাক! তাঁহারই মেয়ের প্রায় সমবয়সী এই মেয়েটি বই লইয়া কেমন কেতাবের একটি গল্প পড়িয়া শুনাইল, কোরাণ-সরীফের বাঙ্গালা অনুবাদের কেতাব হইতে কি মধুর সুরেই কতিপয় পরিচিত বয়েদ আবৃত্তি করিল; কথাবার্ত্তায়ও কেমন আদপ ও কায়দা,—লেখাপড়া না শিখিলে ত এমন [illegible]র কথা নয়! চমৎকৃত হইয়া তিনি বাহোবা ত দিলেনই এবং রহমন সাহেবের সহিত একমত হইয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে পাঠশালার সহিত সংস্রব না রাখিয়া যে ক্ষতি তাঁহারা পুরুষানুক্রমে

কুড়াইয়াছেন, পয়সায় ও ক্ষমতায় তাহা পূরণ হইবার নহে। অতঃপর হাজীকে পাঠশালায় পাঠাইতে তাঁহার মনে আর দ্বিধা রহিল না; স্থির হইল, আপাততঃ রহিম যেমন আনন্দপুরের বিদ্যালয়ে পড়িবে, হাজীও তেমনই পরির সহিত ওখানকার মেয়ে স্কুলে লেখা-পড়া শিখিবে।

এই ব্যবস্থা অনুসারে রহিম আনন্দপুরের বিদ্যালয়ে গিয়া নাম লেখায় এবং প্রথম দিনেই তাহার বিদ্যার পরিচয় দিয়া ছাত্রসমাজে যে ভাবে চাঞ্চল্য তুলে ও সেই সূত্রে ছুটির পর পথে যে অপ্রীতিকর ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহা সূচনাতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৫

যদিও আনন্দপুর সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম এবং নবাবী আমোলের পুরাতন জমিদার বংশের সহিত আরও অনেকগুলি বিশিষ্ট বংশের অস্তিত্ব এখানে বর্ত্তমান, তথাপি তাঁহাদিগের সন্তানগণের উচ্চশিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা এ গ্রামে ছিল না! যে বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা গ্রামে দেখা যায়, পূর্ব্বে ইহা সাধারণ পাঠশালা বলিয়াই গণ্য হইত এবং ইহার অধিকার প্রাইমারী বা নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষা পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রায় বারো বৎসর হইল, বর্ত্তমানের প্রধান শিক্ষক ব্রজমোহন দত্ত এই বিদ্যালয়টির ভার লইবার জন্য আনন্দপুরে উপস্থিত হন। কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বকায় এই নবাগত মানুষটির স্বাভাবিক গম্ভীর মুখ এবং সেই মুখের গুরুগম্ভীর স্বর হইতে গ্রামের মাতব্বরগণ একবাক্যে স্বীকার করিলেন,—হ্যাঁ, সেকেলে গুরুমহাশয়ের মত চেহারা আর আওয়াজ বটে,—ছেলেগুলো এবার দুরস্ত হবে।

ছেলেরা অবশ্য তখনও চেহারার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে শিখে নাই, কিন্তু

নূতন শিক্ষকের স্বাভাবিক রক্তবর্ণ ঘূর্ণ্যমান দুইটি চক্ষুর সন্ধান পাইয়াই বুঝিয়াছিল, আর তাহাদের পরিত্রাণ নাই। এমন চক্ষুর যিনি মালিক, তাঁহার নিকট কোনও গলদই তাহাদের চাপা থাকিবে না।

নবাগত শিক্ষকমহাশয়ও তাঁহার ঘূর্ণিত নেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিয়াছিলেন, এইখানেই তিনি স্থায়ী ভাবে স্থিতি হইতে পারিবেন। কেন না, বিদ্যায় তিনি অতি বিচক্ষণ ও শিক্ষকতায় প্রচুর কৃতিত্ব অর্জ্জন করিলেও, শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তাদের নির্দ্ধারিত বাঁধা-ধরা ব্যবস্থা মানিয়া লইতে অভ্যস্ত ছিলেন না এবং এই অনভ্যস্ততার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সর্ব্বত্রই তাঁহার ঠোকাঠুকি হইয়াছে। কিন্তু এখানকার পাঠশালাটি যতই ছোট হউক, সরকারী সহায়তার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিত না, স্থানীয় জমিদার বংশের পূর্ব্বপুরুষদের ব্যবস্থায় এই শিক্ষালয়-টির পরিপোষণে কিছু ভূসম্পত্তি বরাদ্দ ছিল, তাহাতেই ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। নূতন শিক্ষক মহাশয় নানাদিক দেখিয়া বিদ্যালয়ের আয় কিঞ্চিত বাড়াইতে ও স্থানীয় ছাত্রদের অসুবিধা মোচন করিতে এক নূতন পরি-কল্পনা করিলেন। ছেলেরা নিম্ন প্রাথমিকের পাঠ সাঙ্গ করিলে এই গ্রাম হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ তফাতে মহেষখালীর হাই-ইস্কুলে ইংরাজী পড়িতে যাইত। ইনি ব্যবস্থা দিলেন যে, অভিনব ব্যবস্থায় এখানেই ছাত্রদিগকে এমন ভাবে তিনি শিক্ষা দিবেন—যাহাতে এখানকার পাঠ শেষ করিয়াই তাহারা হাই-স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে গৃহীত হইতে পারে!

গ্রামের মাতব্বর বা জমিদার বংশের বংশধরেরা এ পর্য্যন্ত পিতৃপুরুষ-গণের ব্যবস্থার যথেষ্ট মনে করিয়া এই গ্রাম্য পাঠশালাটির শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট ছিলেন এবং গ্রামের বয়স্ক ছেলেরা দল বাঁধিয়া যখন গ্রীষ্ম ও বর্ষার বিষম অসুবিধা মাথায় করিয়া গ্রামান্তরে বিদ্যার্জ্জন করিতে যাইত, সে দৃশ্য উপভোগ করিতেন! মনে তাঁহাদের এই যুক্তিই তখন দৃঢ় হইয়া উঠিত

যে, বাল্যে তাঁহারা যে কষ্টসহ্য করিয়া মানুষ হইয়াছেন, তাঁহাদের পরবর্ত্তীগণ ত সেই পথেই চলিয়াছে!

কিন্তু শিক্ষক মহাশয় তখন নানা যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দিলেন,—জগতের সকল দিকেই পরিবর্ত্তনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; পূর্ব্বে লোকে হাঁটিয়া ছয় মাসে কাশী গয়া বৃন্দাবনে তীর্থ করিতে যাইত, এখন চব্বিশ ঘণ্টায় যায়। দুই বেলায় তিন ক্রোশ হাঁটিয়া গ্রামান্তরে গিয়া বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা গ্রামে বসিয়া তাহা উপার্জ্জন করা সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। যুক্তি শুনিয়া গ্রাম্য মাতব্বরগণ শিক্ষকমহাশয়ের প্রস্তাবে সায় দেন এবং তাহাতেই নব পরিকল্পনায় এই বিদ্যালয়টি গঠিত ও উন্নত হইয়া উঠে।

তাহার পর সুদীর্ঘ বারোটি বৎসরে যে সকল ছাত্র এই বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া ইংরাজী হাইস্কুলে প্রবেশ করে, কোনও বিষয়েই তাহাদের খুঁৎ দেখা যায় নাই, সুতরাং আনন্দপুরের আদর্শ বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ এ পর্য্যন্ত ইংরেজী বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতেই সাদরে গৃহীত হইয়া আসিতেছে।

যাহারা এই বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়াই মা সরস্বতীর নিকট বিদায় লইয়াছে—উচ্চ শিক্ষালাভের আর সুযোগ ঘটে নাই, তাহাদের মধ্যেও মোটামুটি শিক্ষা ও সভ্যতার এমন পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাহাদিগকে অশিক্ষিত বলিয়া অবহেলা করা চলেনা, বরং তাহারা সভ্য সমাজে মিশিবার দাবী করিতে পারে। এই বিদ্যালয়ের অদ্ভুত শিক্ষকটির শিক্ষকতার ছিল ইহাই বিশেষত্ব।

তথাপি, একটি বিষয়ে এই কৃতী পুরুষটির অকৃতকার্য্যতাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বারো বৎসরের মধ্যে আনন্দপুরের কত ছেলেকেই তিনি মানুষ করিয়া দিয়াছেন, কত অচল বালক তাঁহার প্রদর্শিত শিক্ষার অপূর্ব্ব আলোক পাইয়া চলার পথে চলিতে শিখিয়াছে, কত গবেধাপ্রকৃতির

নির্ব্বোধ ছাত্র তাঁহার প্রসাদে সুবোধ ও বিদ্বান হইয়াছে, কত দুর্দ্ধর্ষ ডানপিটে ছেলেকে পিটিয়া তিনি সায়েস্তা করিয়া দিয়াছেন,—কিন্তু এই একটি যুগ যথাসাধ্য চেষ্টা এবং সাধ্য-সাধনা করিয়াও তিনি বাহির-আনন্দপুরের কোনও ওস্তাগর অথবা দর্জ্জীর কোনও ছেলের নাম এই বিদ্যালয়ের খাতায় লিখাইতে পারেন নাই।

কিন্তু বার বৎসরে বুড়ো শিক্ষক ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় যাহা সার্থক করিয়া তুলিতে পারেন নাই, রহমন সাহেব এখানে আসিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাতে সমর্থ হইয়াছিলেন! অর্থাৎ এই গ্রামের সংখ্যাধিক বাসীন্দার যিনি মাথা, তাঁহার মেয়েটিকেই পাঠশালায় পাঠাইতে পারিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, শিক্ষক মহাশয়ের আর একটি উপরি উপায় ছিল; সেটি—বাহির-আনন্দপুর গ্রামের দর্জ্জীদের হিসাবের খাতা পত্র লেখা ও চিঠি পত্র বা দলিল দস্তাবেজের মুসাবিদা করিয়া দেওয়া। এই সূত্রেই রহমন সাহেবের সহিত শিক্ষক মহাশয়ের পরিচয় হয়। একজন একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতধারী, আর একজন শিক্ষার প্রতি একান্ত অনুরাগী; এক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি স্বাভাবিক। শিক্ষক মহাশয়ের অক্ষমতা ও ব্যথার কথা শুনিয়া রহমন সাহেব হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—মাষ্টার মশাই, মুখের কথায় এখানে কিছু হবে না; বক্তৃতাই বলুন, আর উপদেশই বলুন, এরা বুঝবে না—মানবে না; কেননা, লেখা পড়া না শেখাটাকেই ওরা মস্ত বাহাদুরী বলেই বরাবর ভেবে এসেছে; কথায় এতদিনের ভুল ত এদের ভাঙ্গাতে পারবেন না; এখানে প্রয়োজন—দৃষ্টান্ত; এরা যাদের মানে, তাদের কারুর এগিয়ে গিয়ে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে যে, এরা ভুলের রাস্তা ধরেই চলেছে। আপনি ভাববেন না, সেই রাস্তা আমিই ওঁদের দেখাব; এর পর আপনিও দেখে নেবেন—আলোর সন্ধান

পেয়ে পোকাগুলো যেমন পাগল হয়ে সেদিকে ছোটে, এরাও তেমনই যেই বুঝবে অন্ধকারে পড়ে আছে, আলো সামনে—তখনই তার পরশ পেতে আকুল হয়ে উঠবে, আর সাধতে হবে না।

রহমন সাহেব ও শিক্ষক ব্রজমোহনের এই আলাপের পরেই দৃষ্টান্তেরও সমাবেশ ঘটে। রহিম সেদিন স্কুলে নাম লিখাইয়া ও সেদিনের পরীক্ষায় যোগ দিয়া ছেলেদের চমৎকৃত করিলেও শিক্ষক মহাশয়ের সহিত তাহার সংস্রব ও গুরুশিষ্য সম্বন্ধ যে তাহার পূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য।

সেদিন রহিম যখন ক্লাসে ঢুকিল, স্কুল বসিয়া গিয়াছে। শিক্ষক মহাশয়ের পরিকল্পনা অনুসারে তিনটি ক্লাস লইয়া এই স্কুলের কার্য্য চলে। তৃতীয় শ্রেণীতে বাঙ্গালা ও ইংরেজী বর্ণ পরিচয় হইতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা দেন একজন প্রবীণ শিক্ষক। দ্বিতীয় শ্রেণীতে মধ্যবয়সী এক বিচক্ষণ শিক্ষক পরবর্ত্তী পাঠ্য ও গণিতের বিষয় প্রধান শিক্ষকের নির্দ্দেশ মত শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের লইয়া প্রথম শ্রেণী গঠিত এবং প্রধান শিক্ষক স্বয়ং এই শ্রেণীর ছাত্রদিগকে বিভিন্ন বিষয়ে এমন ভাবে কৃতবিদ্য করিতে সচেষ্ট থাকেন—যাহাতে তাহারা ইংরেজী বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতে অবাধে প্রবেশ করিতে পারে।

প্রধান শিক্ষক মহাশয় তখন চেয়ারে বসিয়া খাতায় ছাত্রদের হাজীরা লিখিতেছিলেন। রহিম ধীরে ধীরে ক্লাসে আসিয়া প্রথমেই শিক্ষক মহাশয়কে অভিবাদন করিল। রহিমকে দেখিয়াই ছেলেদের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল, অনেকেই তাহাকে পার্শ্বের স্থানটুকু ছাড়িয়া দিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। বেঞ্চির প্রথম স্থানটুকু অধিকার করিয়া বসিয়াছিল বিশু, তাহার সুন্দর মুখখানি আজ অস্বাভাবিক গম্ভীর; রহিম ক্লাশে ঢুকিতেই চকিতে সে একবার বক্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়াছিল,

কিন্তু পরক্ষণে দুই চক্ষুর দৃষ্টি এমন ভাবে পুস্তকের পাতায় নিবদ্ধ করিল, যেন ইহা ভিন্ন অন্য কিছুই তাহার লক্ষ্যের বিষয় নহে। রহিমও শিক্ষক মহাশয়কে অভিবাদন করিয়াই ক্লাশে উপস্থিত সহপাঠীদিগের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়াছিল এবং সে সময় তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখের গাম্ভীর্য্য ও অনেকগুলি ছেলের তাহাকে চক্ষুর ইঙ্গিতে পার্শ্বে আহ্বানের ঔদার্য্য তাহার লক্ষ্য এড়ায় নাই, কিন্তু সে কোনও দিকেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সর্ব্বশেষের বেঞ্চটির প্রান্তদেশে উপবিষ্ট ছেলেটিকে একটু ঠেলিয়া তাহার পার্শ্বেই বসিয়া পড়িল।

ঠিক এই সময় শিক্ষক মহাশয়ও তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন,---রহিম আলী চৌধুরী ?

রহিম সসম্ভ্রমে উঠিয়া নম্রভাবে উত্তর দিল,—প্রেজেণ্ট, স্যর !

অতঃপর পাঠ আরম্ভ হইল। ক্লাসের ছেলেদের মনে এখন এই সমস্যাই বড় হইয়া উঠিতেছিল যে, প্রথম দিনের পরীক্ষাতেই যে ছেলেটি ক্লাসের সেরা ছেলে বিশুর প্রায় সমকক্ষ হইয়াছিল, এখন যদিও সে 'লাষ্ট' হইয়া বসিয়াছে এবং বিশু 'ফাষ্ট' হইয়াই আছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াইবে ? এই ছেলেগুলির মনোবৃত্তি এমনই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, বিশুকে অতিক্রম করিয়া তাহার আগে বসা ইহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য জানিয়া, অগত্যা রহিমকেই ইহারা অগতির গতি সাব্যস্ত করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে নাই ; যেন রহিম নিজের কৃতিত্বে বিশুকে হারাইয়া দিলেই ইহারা বর্ত্তাইয়া যায়।

কিন্তু এদিন শেষ পর্য্যন্তও রহিম বিশুকে কোনও বিষয়েই হারাইতে পারিল না ; বিশু যেন আজ হারিবে না পণ করিয়াই ক্লাসের প্রথম বেঞ্চিখানির প্রথমেই বসিয়াছিল,—যেমন সে প্রতিদিনই বসিয়া আসিতেছে। রহিম শেষ বেঞ্চির শেষে বসিলেও অধিকক্ষণ তাহাকে সেখানে

থাকিতে হয় নাই ; শিক্ষক মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে বিশুর বাধে নাই, কিন্তু অন্যান্য ছেলেরা যাহা পারে নাই, রহিম তাহার ঠিক উত্তর দিয়া উঠিতে উঠিতে একেবারে বিশুর ঠিক পার্শ্বে গিয়া বসিয়াছিল। ক্লাসের সকল ছেলের দৃষ্টিই তখন পাশাপাশি উপবিষ্ট এই দুইটি ছেলের দিকে ; বিশুকে যেমন প্রশ্ন করা হয়, রহিমও সেই সঙ্গে উদগ্র হইয়া উঠে, বিশু না পারিলেই সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়া তাহার উপরে গিয়া বসিবে, তাহার মুখে উত্তেজনার চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে ; কিন্তু বিশুও এ বিষয়ে এত সতর্ক ও তৎপর যে, তাহার পার্শ্ববর্তীকে তাহার অপেক্ষা পটুতা প্রকাশের অবসরমাত্র দেয় না। বিশু আজ ভাল রকমেই বুঝিয়াছে যে, তাহার এই নূতন প্রতিদ্বন্দ্বীটি যদি কোনও বিষয়ে আজ তাহাকে হারাইতে পারে, তাহা হইলে সহপাঠীদের নিকট সে একবারে হেয় হইয়া যাইবে, সুতরাং নিজের প্রতিষ্ঠাটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিতে তাহার মুখেও উদ্বেগ সুপরিস্ফুট! ছাত্র সমাজের চিত্তবৃত্তি-নির্ণয়ে চির-অভ্যস্ত সুদক্ষ শিক্ষক মহাশয় এই দুইটি সমবয়স্ক প্রতিযোগী বালকের মানসিক উদ্বেগ ও উত্তেজনা অনুভব করিয়া মনে মনে উৎফুল্ল হইতেছিলেন।

ছুটির পর কলকণ্ঠে উল্লাসধ্বনি তুলিয়া ছেলেরা বাড়ীর দিকে ছুটিল। সেদিন উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের বিশেষ পরীক্ষা থাকায় সেই শ্রেণীর ছেলে-দিগকেই রাস্তায় দেখা গিয়াছিল, আজ তিনটি শ্রেণীর ছেলে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বড় রাস্তার অভিমুখে অগ্রসর।

এদিনও রাস্তার সেই পরিচিত সংযোগস্থলে বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে দেখা গেল। অধিকাংশ বালিকাই আজ আর সেখানে না দাঁড়াইয়া বাড়ীর দিকেই চলিয়াছিল, কেবল তিনটি বালিকা তে-মাথার মোড়টির উপর দাঁড়াইয়া দূরাগত ছাত্রদের প্রতীক্ষা করিতেছিল। ছাত্রদল লক্ষ্য করিল, এই তিনটি মেয়ের মধ্যে একটি তাহাদের চিরপরিচিতা

শোভা, সে তাহাদের দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহার সঙ্গিনী দুইটিকে যেন কি বলিতেছে, কিন্তু সেই দুইটি বালিকা তাহাদের সম্পূর্ণ অপরিচিতা।

এই সময় বিশু সহসা তাহার অগ্রবর্ত্তী বালকদিগকে ক্ষিপ্রপদে অতিক্রম করিয়া মোড়ের দিকে অগ্রসর হইল; সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই শোভার এই নির্দ্দেশ; এক্ষেত্রে হেতু জানিতে উৎসুক হইয়া উঠা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক।

নিকটে আসিতেই শোভারই সমবয়স্কা দিব্য ফুটফুটে মেয়েটি তাহার সুর্ম্মামাখা টানা টানা দুটি কালো চক্ষুর দৃষ্টি বিশুর ঈষৎ উত্তেজিত মুখখানির উপর তুলিয়া সকৌতুকে প্রশ্ন করিল,—তোমার নাম বিশু, তুমিই কাল এইখানে আমার দাদার সঙ্গে দাঙ্গা বাধিয়েছিলে?

বিশু ত অবাক! জানা নাই, শুনা নাই, হঠাৎ তাহাকে দেখিয়াই মেয়েটি গায়ে পড়িয়া প্রশ্ন করিয়া বসিল! আচ্ছা মেয়ে ত! অতি বিস্ময়েই সে মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল।

বিশুকে নিরুত্তর দেখিয়া পরি অধিকতর উৎসাহের সহিত দুই চক্ষু পাকাইয়া কহিল,—তুমি ত তাহলে ভারি দুষ্টু ছেলে!

শোভা পরির কথায় খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বিশুর মনের রাগটুকু এবার শোভার উপরে গিয়া পড়িল; তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া শাসনের ভঙ্গীতে কহিল,—তুমি বাড়ী চল আগে!

শোভার মুখের হাসিটুকু তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া গেল, কিন্তু পরি তাহা লক্ষ্য করিয়া সঙ্গে সঙ্গে কহিল, কি করবে বাড়ীতে গেলে শুনি? কাল ত আমার দাদাকে মারবার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছিলে, আজ আমার বোনটিকে খুন করবে নাকি?

বিশু এবার বিব্রত হইয়া উঠিল। সাধারণতঃই সে অল্পভাষী, শোভা

ভিন্ন আর কাহারও নিকট সে মনের দুয়ারটি সহজে খুলিয়া দেয় না, অপরিচিতের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে বা যাচিয়া ভাব করিতে বরাবরই সে নারাজ; এই নূতন মেয়েটির কথার কি উত্তর সে দিবে, সহসা স্থির করিতে পারিল না, অথচ মেয়েটি ত তাহাকে ছাড়িয়া কথা কহিতেছে না! বার বার দাদার কথা তুলিয়া খোঁটা দিতেছে, তবে কি এ রহিমের বোন? যে তাহার অতি বড় শত্রু হইয়া এই বিদ্যালয়ে আসিয়াছে!

হঠাৎ সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে বিশুর চমক ভাঙ্গিয়া গেল,—তোরা এখানে দাঁড়িয়ে যে!

বিশু ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল, ক্লাসের কতকগুলি ছেলের সহিত রহিম তাহাদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন এবং এই প্রশ্নের জবাব লইতে দুই চক্ষুর দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ করিয়া মেয়েটির দিকে সে চাহিয়া আছে।

অকুণ্ঠিতভাবেই মেয়েটি উত্তর দিল,—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের ঝগড়ার জায়গাটা দেখছি।

কণ্ঠে জোর দিয়া অনুযোগের সুরে রহিম কহিল—জ্যাঠামো করবার জায়গা এটা নয়,—খুব কথা শিখেছিস।

পরি সপ্রতিভ ভাবে কহিল,—কিন্তু তোমাদের মত ঝগড়া করতে শিখিনি।

রুক্ষস্বরে রহিম কহিল,—কি বললি?

পরি চঞ্চল দৃষ্টিতে ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে কহিল,—যেটা এতক্ষণ বলি-বলি করছিলুম, সেইটিই তাহলে বলি শোন,—তুমি ইস্কুলে এসেই এই ছেলেটির সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছ, আর আমরা দুই বোনে আজ ভর্ত্তী হতে এসেই এই মেয়েটির সঙ্গে ভাব করে ফেলিছি।—

কথাটা শেষ করিয়াই সে অপরূপ ভঙ্গিতে পার্শ্ববর্ত্তিনী শোভার হাতখানি ধরিয়া টানিল। শোভাও হাসিয়া উঠিল।

হাজী এতক্ষণ অবাক হইয়া ইহাদের কাণ্ড দেখিতেছিল; রাস্তায় দাঁড়াইয়া মেয়ে-ছেলের এভাবে বাকবিতণ্ডা তাহার পক্ষে নূতন। সে এই সময় পরির কাণের কাছে মুখখানি তুলিয়া কহিল,—মোর খালি খালি সরম লাগছে বহীন, ঘরকে চল্।

কথাটা আস্তে বলিলেও, রহিমের কাণে তাহা তীক্ষ্ণ হইয়াই বাজিল; বিশুও এই মেয়েটির বাঁকা কথা শুনিয়া সকৌতুকে তাহার দিকে চাহিল। অন্যান্য ছেলেরাও তখন অকুস্থলে আসিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে

পরি তৎক্ষণাৎ বিশুকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—এ মেয়েটিকে বুঝি চেন না? ওরারিশ সাহেবের মেয়ে, এর নাম হাজী; আর,—আমার দাদার সঙ্গে এর হবে শীগ্‌গীর সাদী।

এমন মুখরোচক খবর বিশুর গম্ভীর মুখে হাসির লহর তুলিতে পারিল পারিল না বটে, কিন্তু দলের অন্যান্য ছেলেরা কলকণ্ঠে নানারূপ উল্লাসের ধ্বনি তুলিতে লাগিল।

রহিম এবার রীতিমত রুষ্ট হইয়া কহিল,—চুপ কর, পোড়ারমুখী।

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া পরি পুনরায় বিশুর উদ্দেশ্যে কহিল,—দেখলে ত আমার দাদার মেজাজ কত ঠাণ্ডা! সে দিন একটা ছেলে তোমাকে এমনি কি বলেছিল ব'লে, তুমি তার নাকটাই ভেঙ্গে দিয়েছিলে; আর আমার দাদা শুধু মুখ-খিঁচিয়ে আমাকে বললে, পোড়ারমুখী! যাক্, এখন তোমরা দুটিতে ভাব কর দেখি।

বিশুর সর্ব্বাঙ্গে এবার কে-যেন জল-বিছুটির ঝাপটা দিল, সহসা অতিমাত্র অধৈর্য্য হইয়াই সে পরির দিকে চাহিয়া বিকৃত মুখে কহিল,—ডেঁপো মেয়ে কোথাকার!

নবসঙ্গিনীর প্রতি বিশুদার এই সম্ভাষনে শোভা নিজেকেই অপরাধিনী ভাবিয়া অপ্রতিভ-কণ্ঠে প্রতিবাদের সুরে ডাকিল,—বিশুদা!

কণ্ঠে ঝঙ্কার তুলিয়া বিশু কহিল,—থাক্, ঢের হয়েছে; নতুন বন্ধু যখন যুটেছে, আমাকে কি দরকার?

কথাটা এক নিশ্বাসে শেষ করিয়াই সে অগ্রবর্ত্তিনী তিনটি বালিকার পাশ কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। শোভার মুখখানি মুহূর্ত্তে যেন শুকাইয়া গেল, রহিম ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল, আর পরির মনে হইল—বিশুর কথাগুলি মারবেলের গুলীর মত তাহার বুকটির উপর সজোরে আসিয়া আঘাত দিল।

৬

ছেলেরা ভাবিয়াছিল, আজও একটা গণ্ডগোল বাধিবে এবং সেদিন যাহা অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে, আজ তাহার চরম নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে। কিন্তু গোল বাধাইবার যে গুরু, তাহাকেই সর্ব্বাগ্রে অকুস্থল ত্যাগ করিতে দেখিয়া ছেলেদের উৎসাহ নিস্তেজ হইয়া গেল।

শোভার দৃষ্টি পড়িয়াছিল রাস্তার দিকে—যে পথটি ধরিয়া বিশু গোঁ-ভরে বাড়ীর দিকে চলিয়াছিল। সহসা দৃষ্টি পরির দিকে ফিরাইয়া সে কহিল,—পরি ভাই, আমি বাড়ি যাই।

বিশুর কথায় পরি মনে মনে যে ব্যথাটুকু পাইয়াছিল, তাহা যেন উপেক্ষা করিয়াই হাসিমুখে কহিল,—আর, আমরা বুঝি এখানেই থাকব?

রহিম অনুজ্ঞার সুরে কহিল,—বাড়ী চল্ পরি।

পরি ভ্রাতার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল,—চলো না বাপু,

আমি ত পা বাড়িয়েছি ; কি ব'লব বল, ছেলেটা পালালো, নইলে তোমার সঙ্গে ঠিক মিল করিয়ে দিতুম আজ।

রহিম চক্ষু পাকাইয়া কহিল,—ও মিছে বলে নি, তুই ভারি ডেঁপো হয়েছিস্।

দুই চক্ষুর দৃষ্টি উজ্জল করিয়া ভ্রাতার দিকে চাহিয়া পরি কহিল,—কথাটা তাহলে তোমার ভাল লেগেছে বল! তবে আর মিল হতে বাকি কি রইল?

রহিম কোন উত্তর দিল না ; অগ্রবর্ত্তিনী তিনটি মেয়ের পিছু পিছু সে ও তাহার সঙ্গীদল ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। রহিম এই সপরা বোনটিকে ভালরকমই চিনে, কথায় বাড়ীর কেহই এই মেয়েটিকে আঁটিয়া উঠে না ; অথচ এজন্য তাহাকে অনুযোগ করিবারও উপায় নাই ; কেননা, রহমন সাহেব কন্যার এই বাকপটুতার বিশেষ সমর্থন করেন, উৎসাহ দেন ; বলেন—কথায় ও কাযে মেয়েদের এমনই চটপটে হওয়াই ত চাই।

বড় বাড়ীর সম্মুখ দিয়াই বাহির-আনন্দপুর যাইবার রাস্তা। শোভা বাড়ীর বিশাল দেউড়ীর নিকটে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইতেই পরি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—এইটিই বুঝি তোমাদের বাড়ী?

শোভা মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল,—ঠিক আমাদের নয়—আরও অনেকেরই, তবে আমরা এই বাড়ীতেই থাকি ; আর ঐ বিশুদাও যে এই বাড়ীর একদিকে থাকে তা বুঝি জান না?

পরি হাসিমুখে কহিল,—এই ত জানলুম, তুমি বললে—তাই। বাড়ীটা কিন্তু খুব মস্ত ত! আচ্ছা ভাই, তাহলে তুমি যাও।

শোভা অনুরোধের ভঙ্গীতে কহিল, তোমরাও এসো না ; এখনো ত

ঢের বেলা রয়েছে ; মস্ত বাড়ীটার ভেতর-মহলগুলো সব তোমাদের দেখাবো—

দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া এবং মুখে দুষ্টুমীর হাসিটুকু আনিয়া পরি কহিল,—তবেই হয়েছে ! আমরা তোমাদের বাড়ীতে যাই, আর তোমার বিশুদার সঙ্গে আমার দাদাটির আবার লড়াই বাধুক—

শোভা কহিল,—তা কেন, একদিন ঝগড়া বেধেছিল বলে রোজই বাধবে ? আর, বিশুদা সে ধরণের ছেলে নয়, যদিও সে একটুতেই রেগে ওঠে, কিন্তু রাগ থামলে একেবারে মাটির মানুষ ! অমন ছেলে এ তল্লাটে

পরি মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—বটে ! আচ্ছা ভাই, আজ আর নয় ; আর একদিন যাব আমরা ; শুধু আমি আর হাজী। তুমি তাহলে বাড়ী যাও।

শোভা মুখখানি তুলিয়া সঙ্গিনীদের দিকে একবার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

হাজী বরাবর পরির পাশেপাশেই ছিল ও চলিতে চলিতে তাহার অপটু পা-দুইটি বারবার জড়াইয়া যাইতেছিল। বড়বাড়ীর সম্মুখে শোভা থামিতে ইহারাও দাঁড়াইয়াছিল ; রহিম খানিকটা অগ্রসর হইলেও পুনরায় বিরক্তভাবে একান্ত অনিচ্ছায় তাহাকে ইহাদের প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল।

প্রথম চলার পথে হাজী আজ ইহাদের সাথী হইয়াছে। কিন্তু পথ চলিতে সে যেমন অনভ্যস্ত, গুছাইয়া কথা কহিতেও তেমনই অপটু ; যদি বা সাহস করিয়া দুই একটি কথা বলে, কিন্তু তাহা সকলেরই কৌতুক উদ্রিক্ত করিয়া তুলে। বিদ্যালয়ে মেয়েরা হাজীর কথা শুনিয়া হাসি চাপিতে পারে নাই, আবার পরির মুখের পাকা পাকা কথা তাহাদিগকে অবাক

করিয়া দিয়াছিল। কথা শুনিয়া তাহারা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই—এইটুকু বয়সে এত কথা সে কেমন করিয়া শিখিল! হাজী মনে মনে স্থির করিয়াছিল, সে সকলের কথা শুনিয়া যাইবে, নিজে মুখ ফুটিয়া কোনও কথা বলিবে না। কিন্তু পরি যখন শোভার অনুরোধের উত্তরে এই বলিয়া বিদায় দিল যে, হাজীকে লইয়া সে একদিন তাহাদের বাড়ীতে যাইবে; হাজীর কাণে কথাটা প্রবেশ করিতেই সে এই পরিচিত কথাটার উত্তর না দিয়া পারিল না, তখনই আহ্লাদে অপূর্ব্ব মুখভঙ্গী করিয়া জানাইয়া দিল,—মুই বাজীর সাথে এহানে কতদিন এসেছি, তখন মোর ছাবাল বয়েস ছ্যালো।

পরি হাসিয়া কহিল,—আর এখনই বুঝি তোর যোয়ান বয়েস হয়েছে?

হাজী লজ্জাবিকৃত মুখে কহিল,—হ্যাঁ!

হাজীর কথাগুলি রহিমের কাণেও বাজিয়াছিল; তাহার পক্ষে তখন সান্ত্বনার বিষয় এইটুকু ছিল যে, সহপাঠীদের কেহই সঙ্গে ছিল না, যে যাহার বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে; সে শুধু একাই এই দুইটি মেয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল। হাজীর মুখের কথাগুলি শুনিয়া পরি যেমন কৌতুক অনুভব করিত, তেমনই তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া এখনকার ধারা অনুসারে কথাগুলি শুধরাইয়া দিবারও তেমনই চেষ্টা পাইত; কিন্তু হাজীর কথা কিছুতেই রহিম বরদাস্ত করিতে পারিত না; যাহাদের নাম ডাক আছে, টাকা পয়সা যথেষ্ট, এত বড় কারবার চালায়, তাহারা ভাল করিয়া কথা কহিতে শিখে নাই, হইলই বা পাড়াগাঁয়ে ঘরবসত! পরির কথা না-হয় ছাড়িয়া দেওয়াই গেল,—যেহেতু সে কলিকাতায় থাকিয়া এত বড়টি হইয়াছে, কিন্তু শোভা নামে ঐ মেয়েটি, সেও ত এই পাড়াগাঁয়ে জন্মিয়াছে, এখানেই থাকে, কিন্তু সহরের মেয়েদের মতই ত কথা বলে, শুনিয়া হাসি পায় না, লজ্জা হয় না। অথচ, পাশাপাশি দুইটি

পল্লীজাত এই দুইটি মেয়ের প্রকৃতিগত এই পার্থক্যের কি কারণ, তাহা সে স্থির করিতে পারে না।

হাজীর কথার সঙ্গে সঙ্গে রহিম অসহিষ্ণুভাবে তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল,—আমি চললুম বাড়ী, তোরা পড়ে থাক্—

পরি কহিল,—আমরাও পথ চিনি, কিন্তু তুমি মিছে রাগ করছ দাদা; হাজীর ত সবে হাতে খড়ি হয়েছে, এরই মধ্যে কি মনে কর ওর কথা সব শুধরে যাবে?

রহিম উষ্ণ ভাবেই কহিল,—তুই তো মেয়েগুলোকে একটা সঙ্ দেখাবি বলে ওটাকে এনেছিস্।

দুইপাটি দন্তে জিহ্বাটি চাপিয়া পরি কহিল,—আরে ছি! কি তুমি বলছ, দাদা! আমার কি ইজ্জতের ভয় নেই? হাজী আমার চাচার মেয়ে, আমি তাকে খাটো করব দশজনের কাছে!

কিন্তু যাহাকে লইয়া এই সব আলোচনা চলিয়াছিল, সে ইহাতে মোটেই মনোযোগ দেয় নাই; তাহার উৎসুক দৃষ্টি পূর্ব্ব হইতেই ঊর্দ্ধ আকাশে যেখানে দুই বর্ণের দুইখানি যুধ্যমান ঘুঁড়ি বিজিগীষু হইয়া পরস্পর আস্ফালন করিতেছিল—সেই দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল।

পরি সহসা হাজীর পৃষ্ঠে ঠেলা দিয়া কহিল,—কি দেখছিস্ হাঁ করে—চল্।

হাজী কহিল,—ঘুড্ডীর লড়াই, দেখ না—হোই যাঃ, ভো কাটা—

হরিদ্রাবর্ণের ঘুড়িখানার সূতা কাটা যাওয়াতেই সেটি মাতালের মত টলিতে টলিতে মাটির দিকে পড়িতেছিল। হাজীর ইচ্ছা, বেওয়ারিশ ঘুড়িখানা ধরিবার জন্য তাহার উদ্দেশে ছুটিয়া যায়; পরি তাহার মুখ ও চক্ষুর ভঙ্গীতে তাহা বুঝিতে পারিয়া সহসা তাড়া দিয়া কহিল,—তা বলে

ওর পেছনে এখন ছোটা হবে না, বাড়ী চল্‌; দেখছিস্‌ না—দাদা কি রকম রেগে উঠেছে।

দুই চক্ষু মেলিয়া রহিমের দিকে চাহিয়া হাজী কহিল,—মোর তাতে কি! আর, মুই কি ঘুড়ি লুঠতে ছুটছি?

অভিমান ভরে এবার সে নিজেই বাড়ীর পথে অগ্রবর্ত্তিনী হইল।

পরি কহিল,—বেশত, তুই-ই আমাদের পথ দেখিয়ে বাড়ী নিয়ে চল্‌—

হাজীর উৎসাহ তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে চলার গতিও থামিল; পথের এক প্রান্তে আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া কহিল,—ধোৎ।

রহিম কহিল,—তুই ত গোল বাধালি পরি, তার চেয়ে ওকে বল্‌, ও 'ভো-কাট্টা' ব'লতে ব'লতে ঘুড়িখানার পেছনে পেছনে ছুটুক, আমরাও ওর পায়ের জোর দেখে বাহবা দিই।

হাজী এবার রীতিমত চটিয়া গেল এবং মুখখানা বাঁকাইয়া বিকৃত কণ্ঠে কহিল,—আল্লার কিরে, মুই না বিলকুল বাজীরে কই।

রহিম হাসিয়া উঠিল; পরি মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল,—তোর বাজী আমার চাচা, আমারও বাপের মতন, কি তাঁকে কইবি শুনি?

হাজী সরোদনে কহিল,—মোরে নিয়ে আকসার মস্করা কর তোমরা।

রহিম কহিল,—শুনলি, পরি?

পরি রহিমের কথায় কাণ না দিয়া হাজীর হাতখানি ধরিয়া স্নেহের সুরে কহিল,—দাদা ঠাট্টা ক'রে একটা কথা বলেছে বলে তুই একবারে কেঁদে ফেললি, হাজী? ছি! বেশ ত' তুইও ঠাট্টা কর না ওকে, বেশ ক'রে দু-কথা শুনিয়ে দে না—

হাজী ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কহিল,—মুই কি অত কথা জানি তোমাদের মত—যে পাণ্টা তকরার করব?

পরি কহিল,—এই ত, কথা তোর মুখে দিন দিন কত স্পষ্ট হয়ে

ফুটছে, এর পর আরও ফুটবে; তখন দাদাও পেরে উঠবে না তোর সঙ্গে দেখিস! অবশ্য, যদি আমার কথা শুনিস আর আমার কথামত চলিস।

হাজীর মুখে আর কথা নাই, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া পরির মুখখানির দিকে তাকাইয়া রহিল।

৭

রহিমের কথায় হাজীর মনে যে ব্যথা জাগিয়াছিল, পরির সময়োচিত সান্ত্বনায় তাহাদের মধ্যে মনোবাদ আর স্থায়ী হইতে পারে নাই। কিন্তু বিশু শোভাকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে যে কয়টি কথা বলিয়া কোনও উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই চলিয়া গিয়াছিল, সেগুলি শোভার বুকে বিঁধিয়া কাঁটার মতই খচ্ খচ্ করিতেছিল। এই কাঁটাগুলি সে নিজেও তুলিতে পারিল না, বিশুও তুলিয়া দিতে আসিল না, সুতরাং এবারের অসদ্ভাবের উপর সহজে সৌখ্যের প্রভাব পড়িতেও দেখা গেল না।

বিশু আর শোভাকে ডাকে না এবং শোভাও তাহার অনুপম কুন্তল-গুচ্ছ দুলাইয়া বিশুদার কাছে পড়িতে আসে না। সহসা সামনাসামনি হইলে উভয়েই মুখ ফিরাইয়া গৌরবে পাশ কাটাইতে চেষ্টা করে।

বড় বাড়ীর অনেকেই সকৌতুকে প্রশ্ন করেন,—হ্যাঁরে এ কদিন তোদের হয়েছে কি? কথাবার্ত্তা নেই, খেলাধূলো নেই, দুজনেই মনমরা হয়ে আছিস, ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

কিন্তু কোনও পক্ষ হইতেই ইহার উত্তর পাওয়া যায় না এবং যাঁহারা প্রশ্ন করেন, প্রশ্নের উত্তর না পাইয়াও মনে মনে হাসিতে থাকেন। কেন না, ইঁহারা সকলেই জানেন, যেমন ইহাদের সদ্ভাব, আবার তেমনই মনো-বাদও দেখা যায়, কিন্তু তাহা ঠিক শরতের আকাশে মেঘের মতই ক্ষণস্থায়ী,

একটু ঝড় বা এক পশলা বৃষ্টির পরই আকাশ আবার নির্ম্মল হইয়া হাসিয়া উঠে।

শোভা ভাবিত, আমার কি দোষ! না হয় আমি পরির সঙ্গে ভাবই করেছি, সেটা অন্যায় হবে কেন? থামকা আমাকে সকলের সামনে অমন ক'রে খোঁটা দিলে, সেটা ওঁর দোষ হ'ল না—যত দোষ আমার? বা—রে!

বিশুও মনে মনে হিসাব করিত,—ঠিক কথাই ত আমি বলেছি,—ডেঁপো মেয়েটা আমাকে শাসিয়ে যা তা বলতে লাগলো, আর উনি তার হাত ধরে মুখ টিপে হাসতে লাগলেন! আবার এমনি তেজ হয়েছে ওঁর, সেধে কথা কইবেন না আমায় সঙ্গে, আমি গিয়ে আগে সাধব—ভেবে রেখেছেন; বোয়ে গেছে আমার! নিজেই দোষ করেছেন, আবার টস দেখাচ্ছেন! আচ্ছা, আমারও নাম বিশু, নীচু আমি কিছুতেই হব না।

বিশুর মনের যখন এইরূপ অবস্থা, সেই সময় কুসুম আসিয়া আব্দারের সুরে বিশুকে অনুরোধ করিল,—আর ত চাঁপা ফুল পাড় না বিশুদা, আমাকে দেবে গোটাকতক পেড়ে? লক্ষ্মীটি!

এই মেয়েটিও সম্প্রতি এই বাড়ীর বৃহৎ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কুসুমের পিতা পতিতপাবন কলিকাতার কোনও থিয়েটারে চাকুরী করিতেন; যদিও তাঁহার বিদ্যার দৌড়টুকু পরিচয় দিবার মতই ছিল, কিন্তু তাহাকে অতিক্রম করিয়াছিল তাঁহার সুকণ্ঠ ও সুশ্রী সুন্দর চেহারা এবং ইহারাই কালে তাঁহার কাল হইয়া দাঁড়ায়। পতিতপাবন যখন কলেজে পড়েন, তখন হইতেই সখের অভিনয়ে গীতি-বহুল ভূমিকায় দক্ষতা দেখাইয়া তিনি প্রশংসিত হন। এম-এ পাশ করিয়া তিনি সরকারী আফিসে ভাল চাকুরীও পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা রাখিতে পারে নাই। রঙ্গালয়ে অভিনয়ের মোহ তাঁহাকে একদা বাস্তবের বৃতিবদ্ধ গৃহ হইতে টানিয়া

অবাস্তবের নর্ম্মদ নিকেতনে দাঁড় করাইয়া দিল। পতিতপাবনের বিদ্যা ছিল, সঙ্গীতেও ছিল শিক্ষালব্ধ অধিকার, আর ছিল সহজাত সুকণ্ঠ; সুতরাং নাম বাজিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু এই জাতীয় নামের সার্থকতা কোথায়? যত দিন জনসাধারণের সহিত আনন্দদানের যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ থাকে, ততদিনই এই নামের মর্য্যাদা; তাহার পর? 'দেহ-পট সঙ্গে নট সকলই হারায়!'

পতিতপাবন আর সবই পাইয়াছিলেন, পান নাই কেবল সংযম ও চরিত্রগত নিষ্ঠা। সুতরাং ইহা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, সব পাইয়াও এই দুইটি বস্তুর অভাবে তিনি সবই হারাইয়াছিলেন। অতিরিক্ত মদ্যপান ও নানা অনাচারে যখন তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইল, কণ্ঠে ক্ষত দেখা দিল, তখন রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে অনাবশ্যক মনে করিয়া আবর্জ্জনার মত অনায়াসে বর্জ্জন করিলেন।

আহিরিটোলায় পতিতপাবনের পৈতৃক বাটী; বাড়ীর সদরে ছোট একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া পতিতপাবনের পিতামহ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। সেইজন্যই দেবোত্তরের অভেদ্য বর্ম্ম আঁটিয়া বাড়ীখানি পরবর্ত্তী তিন সরীকের অধিকারে থাকিয়াও এ পর্য্যন্ত ক্ষতবিক্ষত বা হস্তান্তরিত হইতে পারে নাই। এই অকর্ম্মণ্য অবস্থায় পতিতপাবন তাহার অংশটুকু ভাড়া দিয়া স্ত্রী নবতারা ও কন্যা কুসুমকে লইয়া বৃদ্ধ শ্বশুরের আগ্রহে তাঁহারই আলয়ে আশ্রয় লইয়াছেন। বড় বাড়ীর সাত পাইয়ের সরীক রমানাথ বাবু পতিতপাবনের শ্বশুর এবং নবতারা তাঁহার একমাত্র কন্যা। রমানাথ বাবুর আর কোনও সন্তান সন্ততি ছিল না।

নবতারা এই বাড়ীরই মেয়ে, দীর্ঘকাল সহরে কাটাইয়া আসিলেও এখানকার সকল ধারাই তাহার পরিচিত; কাজেই বড় বাড়ীর বৃহৎ

গোষ্ঠীরই সে সামিল হইয়া গেল। কিন্তু তাহার মেয়েকে লইয়াই গোল বাধিল। সমবয়স্ক মেয়েরা প্রথমটা কুসুমের চেহারা ও কাপড়চোপড় পরার কায়দা দেখিয়া চমকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরেই এই সহুরে মেয়েটির চাল-চলন, চোখ-মুখের ভঙ্গী, অশোভন রকমের বাচালতা ও নির্লজ্জ বেহায়াপনা দেখিয়া প্রত্যেকেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, কেহ কেহ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছিল,—মাগো, মা! সহরে থাকলেই বুঝি এমনই হতে হয়? সমীহ নেই, লজ্জাসরম নেই, লঘুগুরু জ্ঞান নেই; দূর, দূর!

কুসুম আহিরিটোলার মেয়ে; ইস্কুলে পড়িয়াছে, এই বয়সে বটতলার অনেকগুলি বই পড়িয়াও শেষ করিয়াছে। কলিকাতার রঙ্গালয়সমূহে তাহার বাবার দ্বার অবারিত সুতরাং তাহাদেরও প্রবেশ অনায়াসসাধ্য ছিল। নবতারা যদিও কোনও দিন স্বামীর যশোমন্দিরে তাহার যশ যাচাই করিতে যায় নাই, কিন্তু এ বিষয়ে মেয়ের ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না। প্রায় প্রতি অভিনয় রজনীতেই সে বাপের সহিত রঙ্গালয়ে যাইত, ক্রমে ক্রমে কৌতূহল তাহার এতই নিবিড় হইয়া দেখা দিত যে, যখন তখন সাজঘরেও তাহাকে দেখা যাইত। সেখানে থিয়েটারের যে সব মেয়ে প্রসাধন করিত—তাহারই সমবয়স্ক যে মেয়েগুলি সখী সাজিয়া নাচিয়া গাহিয়া সকলকে অবাক করিয়া দিত,—তাহাদেরই সহিত মিশিবার ও আলাপ করিবার এমন সুযোগ পাইয়া কুসুম যেন বর্ত্তাইয়া যাইত। পিতার এইরূপ আস্কারা এবং মাতারও এতটা ঔদাস্য বা অবহেলার ভিতর দিয়া যাহার বাল্যজীবন উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার অসংযত ব্যবহার পল্লীঅঞ্চলের কোমলমতি বালিকাদের নির্ম্মল মনগুলির সহিত ঠিক মত খাপ খাইতে পারে না। কাযেই একটি মাস এ বাড়ীতে বাস করিয়াও কুসুম কাহারও মন পায় নাই। সকলেই যেন তাহাকে এড়াইয়া যাইতে চাহিত।

বিশু যে এ বাড়ীর সেরা ছেলে, সকলেই তাহাকে ভালবাসে, তাহার সুখ্যাতি সবার মুখে, ইহা সন্ধান পাইতে কুসুমের বিলম্ব হয় নাই। সেও এই ছেলেটিকে প্রথম দিনেই সুনজরে দেখিয়াছিল এবং মেয়েদের ছাড়িয়া এই স্বাস্থ্যপুষ্ট সুদর্শন ছেলেটির সহিত ভাব করিতে তাহার বিশেষ আগ্রহও দেখা গিয়াছিল। এ অবস্থায় সমবয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যে আলাপ সহজেই জমিয়া উঠিবার কথা; কিন্তু তাহাতে বাধা দিল শোভা। কুসুমকে বিশুদার সহিত ভাব করিতে দেখিয়াই সে সহসা ছুটিয়া আসিয়া তাহার কাণে কাণে বলিয়া দিল,—ওর সঙ্গে মিশো না, বিশুদা, ও খারাপ মেয়ে।

কথাটা বিশুর কাণে কাণে বলিলেও কুসুম উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিয়াছিল এবং তৎক্ষণাৎ শোভার আঁচোলটা টানিয়া কৈফিয়ৎ চাহিল,—কিসে আমি খারাপ মেয়ে তোকে বলতে হবে!

শোভা প্রথমটা থতমত হইয়াছিল, পরক্ষণেই সামলাইয়া কহিল,—সবাই ত বলে।

কুসুম কহিল,—যে যা বলুক, তুই কেন বললি—তাই বল?

শোভার কাছেই তাহার বিশুদা বিদ্যমান, সহরের এই মেয়েটিকে তাহারা মনে মনে একটু ভয়ও করিত, কিন্তু বিশুদার ভরসায় সেও ভরসা করিয়া কহিল,—বলবই ত, তুই খারাপ কথা বলিস, তাই তুই খারাপ মেয়ে।

কুসুম এবার দুইচক্ষু পাকাইয়া কহিল,—মিথ্যাবাদী কোথাকার! ঠাস করে গালে এক থাপড়া বসিয়ে বদনখানি বিগড়ে দেব এখুনি—

কিন্তু শোভা আঁচল ছাড়িয়া থাপড়া তুলিতে না তুলিতেই বিশু খপ করিয়া কুসুমের হাতখানা ধরিয়া কহিল,—ছি! তা বলে তুমি একে মারবে না কি?

কুসুম জোর করিয়া হাতখানা ছাড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া কহিল,—

কেন মারব না? তোমার নামে কেউ মিছি মিছি কিছু বললে তুমি চুপ করে থাকতে পার? হাত ছেড়ে দাও বিশুদা!

কুসুমের মুখে এই প্রথম বিশুদা সম্বোধন! বিশু তাহার হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া কহিল,—তা যেন ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু তুমি ওকে মারতে পারবে না তা বলে রাখছি। তার চেয়ে দুজনে ভাব ক'রে ফেল, এস, তিনজনে মিলে খেলি।

কুসুম বিশুর সহিত খেলিবে বলিয়াই ভাব করিতে আসিয়াছিল, বিশুর মুখে এ প্রস্তাব শুনিয়া সে আর হাত তুলিল না, বরং প্রসন্নমুখেই কহিল,—আচ্ছা, আমি রাজী।

শোভার মুখে কিন্তু প্রসন্নতার কোনও চিহ্নই ফুটিয়া উঠিল না. সে গম্ভীর ভাবেই মুখখানা ফিরাইয়া লইল।

কুসুম কহিল,—দেখ ত, বিশুদা, শোভা এখনো মুখখানা ভার করে রয়েছে, ও তাহলে খেলবে না; চল, আমরা দুজনেই খেলি।

কিন্তু কুসুম জানিত না যে, খেলায় শোভা যোগ না দিলে বিশু মনোযোগ দিয়া খেলিতে পারিত না এবং খেলাও জমিত না। শোভার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিশু তাহাকে খেলায় আজ নামাইল বটে, কিন্তু খেলিতে খেলিতে সে স্পষ্ট লক্ষ্য করিল যে, শোভার উৎসাহ মোটেই নাই, সে যেন মনমরা হইয়া খেলিতেছে। এদিকে কুসুম এমনই দৌড়ঝাঁপ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল যে, বিশুকে পর্য্যন্ত বলিতে হইল,—আচ্ছা মেয়ে ত!

বিশু বুঝিয়াছিল, শোভা কুসুমকে পছন্দ করে না; সুতরাং কুসুম তাহাদের খেলায় যোগ দিলে শোভা কিছুতেই খেলিবে না। অগত্যা কুসুমকে ছাড়িয়াই সে পরদিন খেলার ব্যবস্থা করিল; খেলার সময় কুসুম হাসিমুখে আসিয়া যুটিলেই সে পড়ার প্রসঙ্গ তুলিয়া খেলা ভাঙ্গিয়া দিল। এইভাবে দুই চারিদিন লুকোচুরি চলিল।

ইহার পরেই উভয়ের মধ্যে মনোবাদ দেখা দিল। কুসুম দেখিল, দুইজনে কথাবার্ত্তা নাই, মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ। এই অবস্থায় কুসুম আসিয়া বিশুকে ধরিল চাঁপাফুল পাড়িয়া দিবার জন্য।

এই ফুল পাড়াটাও ছিল ইহাদের খেলার একটা অঙ্গ। বড় বাড়ীর সন্নিহিত সুবৃহৎ দীঘির পাড়ে যে অতিকায় গাছটির শাখায় শাখায় চাঁপার গুচ্ছ প্রস্ফুটিত হইয়া সুগন্ধ বিতরণ করিত, বিশু অনায়াসে সেখানে উঠিয়া ফুলগুলি চয়ন করিত, আর গাছটির গোড়ায় দাঁড়াইয়া শোভা আঁচল বিছাইয়া সেগুলি সংগ্রহ করিত। কয়েকদিন শোভার অনুপস্থিতিতে ফুলপাড়া হয় নাই এবং কুসুমেরও আজ একান্ত আগ্রহ হইয়াছে,—বিশুদা গাছে উঠিয়া ফুল পাড়ে, আর তলায় থাকিয়া সে ফুলগুলি তাহার আঁচল পাতিয়া ধরে, তাই এই প্রস্তাব।

অন্য দিন হইলে বিশু কি করিত বলা যায় না, কিন্তু আজ কুসুমের মুখে এই অনুরোধ শুনিবামাত্রই সে সায় দিয়া কহিল,—বেশ ত, চল যাই।

গাছে উঠিয়া বিশু একটি একটি করিয়া ফুল ছিঁড়িয়া নিম্নে কুসুমের প্রসারিত অঞ্চলের উদ্দেশ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছিল সত্য, কিন্তু তাহার মুখে কি তখন অন্যান্য দিনের মত পরিতৃপ্তির স্নিগ্ধ হাসিটুকু দেখা গিয়াছিল?

মাথার খোঁপাটির চারিধারে চাঁপার চক্রব্যূহ রচিয়া হাসিমুখে কুসুম যখন শোভাদের বাড়ীতে গেল, শোভার মা সে সময় তাহার চুল বাঁধিয়া দিতেছিলেন।

কুসুম তাহার পাশটিতে দাঁড়াইয়া মুখের হাসিটুকু চাপিবার চেষ্টা করিয়া কহিল,—এই দ্যাখ শুভি, বিশুদা গাছ মুড়িয়ে সব ফুল আমাকে পেড়ে দিয়েছে, তুই ত গেলিনি, আমি তোর জন্যেও গোটাকতক এনেছি, এই নে।

কথাটা শেষ করিয়াই সে আঁচল হইতে গোটাকতক ফুল শোভার

কোলের উপর ফেলিয়া দিল। এক হাত জ্বলন্ত অঙ্গার যেন শোভার গায়ে আসিয়া পড়িল,—সে তৎক্ষণাৎ ফুল কয়টা উপেক্ষায় তুলিয়া দুই হাতে ছিঁড়িয়া ডলিয়া কুসুমের মুখের উপর ছুড়িয়া ফেলিল।

কুসুমের মুখখানা সেই মুহূর্ত্তে কালো হইয়া গেল,—পরক্ষণেই তাহা কঠিন করিয়া কহিল,—ভারি তেজ হয়েছে মেয়ের; এতটা কিন্তু ভাল নয়।

শোভার মা হাসিয়া কহিলেন,—কি হল তোদের? বিশুর সঙ্গে ঝগড়া বুঝি এখনো মেটেনি?

শোভার তখন চুল বাঁধা শেষ হইয়াছিল, মায়ের কথায় কোনও উত্তর না দিয়া দুম দুম করিয়া পা ফেলিয়া ঘরের মধ্যে দ্রুত বেগে চলিয়া গেল। কুসুমও তৎক্ষণাৎ বিশুর সন্ধানে ছুটিল—এখনকার সংবাদটুকু যে বিশু-দাকে না শুনাইলেই নয়।

৮

বিশুর সন্ধানে গিয়া কুসুম শুনিল, এই মাত্র সে মামার বাড়ী গিয়াছে; একদিন পরে ফিরিবে।

শোভাকে তীক্ষ্ণভাবে বিঁধিবার জন্য কুসুম মনে মনে যে তীরগুলি বাছিতে বাছিতে আসিতেছিল, এ খবরে সে সমস্তই গুলাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিশুর উপর তাহার মনে অভিমানও নিবিড় হইয়া উঠিল। ফুল পাড়িবার সময় বিশু তাহাকে বলিয়াছিল বটে, কাল স্কুলের ছুটি। কিন্তু সে যে আজই মামার বাড়ী যাইবে এবং ছুটির দিনটি সেইখানেই কাটাইবে, সে কথা ত তাহাকে বলে নাই! যদি বলিত, কুসুম কিছুতেই তাহাকে যাইতে দিত না; কেন না, ছুটির দিনটির জন্য সে একটি নূতন ধরণের খেলার পরিকল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল; শোভার

আজিকার উদ্ধত আচরণের কথাটা সর্ব্বাগ্রে বিশুকে শুনাইয়া তাহার পরই খেলার কথাটা পাড়িবে, ইহাই ছিল কুসুমের উদ্দেশ্য। কিন্তু বিশুর অনুপস্থিতিতে সমস্তই পণ্ড হইয়া গেল।

ছুটির দিনটি মাতুলালয়ে কাটাইয়া এবং তাহার পরদিন সেখান হইতেই স্কুলের পাঠ সারিয়া বিশু যথাসময়েই বাড়ী ফিরিল। কুসুম জানিত, বিশু স্কুল কামাই করিবার ছেলে নহে, পড়িবার বইগুলি সে যে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে, সে খবরও তাহার অবিদিত ছিল না; সুতরাং অপরাহ্নে সে সাজিয়া গুজিয়া প্রস্তুত হইয়াই বিশুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। শোভার সম্বন্ধে সে-দিনের সংবাদ ত মলতুবী আছেই, তাহা ভিন্ন এই দুইটি দিনে আরও যে-সব খবর তাহার মনের ভাণ্ডারে জড়ো হইয়াছে, তাহাদের গুরুত্বও কম নহে; সমস্ত শুনিলে বিশু আর কখনই শোভার সহিত মিশিতে চাহিবে না—বরাবরের মত উহাদের মধ্যে আড়ি থাকিয়া যাইবে, ভাব আর হইবে না।

বিশুকে দেখিয়াই কুসুম গম্ভীর মুখে কহিল,—বইটই রেখে জামা কাপড় ছেড়ে শীগ্‌গীর এসো বিশুদা, অনেক কথা আছে।

কুসুমকে দেখিয়া বিশুর মুখখানা যে খুব প্রসন্ন হইয়াছে—তাহা মনে হইল না, অথবা অনেক কথা শুনিবার লোভেও তাহার শ্রান্ত মুখে কোনও তীব্র আগ্রহের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতে দেখা গেল না; শুধু সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কুসুমের মুখের দিকে চাহিয়া উপেক্ষার সুরে কহিল,—তোর না আর কারুর?

কুসুম কহিল,—শুনলে টের পাবে কার।

বিশু কহিল,—আচ্ছা দাঁড়া, আমি এখুনি আসছি।

কথাটা বলিয়াই সে বাড়ীর দিকে চলিল, কয়েক পা গিয়াই পুনরায় ফিরিয়া কহিল,—আজকেও ত ফুল তোর চাই?

মুখ টিপিয়া হাসিয়া কুসুম কহিল,—চাই'না? আগে ত এসো, ফুলের কথা সব শোনো, তারপর যা করবার হয় ক'রো।

বিশু আর কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেল, কুসুম উঠানে তাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। বিশুর ফিরিতে বেশী বিলম্ব হইল না। কুসুম তাহার হাতখানি ধরিয়া চাঁপা গাছের উদ্দেশে চলিল এবং যাইতে যাইতে শোভার সে দিনের রূঢ় ব্যবহারের বিষয় বাড়াইয়া সাজাইয়া বিশুকে শুনাইয়া দিল।

কিন্তু কুসুমের অদৃষ্টক্রমে বিশু শোভার উপেক্ষায় উষ্ণ না হইয়া কুসুমের আচরণেই চটিয়া গেল, রুক্ষকণ্ঠে কহিল,—তুই পোড়ারমুখী কেন তাকে সেধে ফুল দিতে গিয়েছিলি? আমি তোকে যেতে বলেছিলুম?

কুসুম মুখখানা আশ্চর্য্য ভাবে ঘুরাইয়া কহিল,—তুমি কেন বলতে যাবে? আমিই মরতে গিয়েছিলুম ভাল ভেবে। ফুল সে ভারী ভালবাসে, তুমি রোজ তাকে যোগান দিতে; অতগুলো ফুল পেয়ে মন কেমন ক'রে উঠল তার জন্যে, তাই না গিয়েছিলুম! ও মা, তাকে যা তা ব'লে গালি আমাকে একেবারে থ করে দিলে, যা নয় তাই মুখে আনলে; মাগো-মা! আমি একেবারে কাঁটা! আর কি খোঁটাটা তোমাকে দিলে! তারপর ফুলগুলোকে নিয়ে দুটো পা দিয়ে মাড়িয়ে থেঁতলে দুম দুম করে চলে গেলো,—এত তেজ মেয়ের!

বিশু নিবিষ্ট মনে কথাগুলি শুনিল, কিন্তু আর কোনও প্রতিবাদ তুলিল না, উত্তরও দিল না। কুসুমের মনটি তখন হাসিতে ভরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু মুখে তাহার চিহ্নও সে প্রকাশ পাইতে দেয় নাই।

বিশু নিরুত্তরে মালকোঁচা বাঁধিয়াই অবলীলাক্রমে প্রাচীন গাছটির সুদীর্ঘ কাণ্ডদেশ বাহিয়া উর্দ্ধতম অংশে উঠিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই তাহাকে কতিপয় শাখাপ্রশাখার সংযোগ স্থলে স্থির হইয়া বসিতে দেখিয়া

কুসুম কহিল,—আর শুনেছ বিশুদা, শুভি এখন খেলার নতুন সাথী পেয়েছে ?

গভীর জলে লোষ্ট্র পড়িলে পরক্ষণেই যেমন বুদ্‌বুদ উঠে, কুসুমের এ কথায় বিশুর গম্ভীর মুখেও ঠিক সেইভাবে প্রশ্ন উঠিল,—কে ?

কুসুম কহিল,—তুমি ত এখানে ছিলে না, জানবে কি করে বল! কাল দুপুরের গাড়ীতে ওরা সব এসেছে,—ঐ যে গো, শুভির বাবা যাদের চাকরী করে, খুব নাকি বড় লোক, রেঙ্গুনে থাকতো—

বিশু উৎসুক হইয়াই কুসুমের কথা শুনিতেছিল, সে এইখানে হঠাৎ থামিতে বিশু কহিল,—চন্দর কাকার কথা বলছিস ?

কুসুম এবার উৎসাহের সুরে কহিল,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নামটা ভুলে গিয়েছিলুম। তা তোমার চন্দর কাকা ঠিক যেন চন্দুরে বোড়া; বুড়ো হাবড়া হলে কি হবে, গায়ের রং এখনো ধব ধব করছে,—যাকে বলে, দুধটুকু মরে ক্ষীরটুকু আর কি !

বিশু অসহিষ্ণুভাবে কহিল,—তুই ভারি বাজে বকিস্, যেটা বলবি, খপ করে বলে ফেল্ না—

কুসুম সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল,—তাই ত বলছি, তুমি না হয় একটু সবুর করেই শুনলে! হ্যাঁ, যা বলছিলুম, তোমার চন্দর কাকা গুষ্টিশুদ্ধ এখানে এসেছেন জমিদারী দেখতে। গুষ্টির মধ্যে ত বুড়ো বুড়ী আর একটি মাত্র ছেলে; তবে সঙ্গে এসেছে এক পাল লোক,—ঝি, চাকর, দরোয়ান, রাঁধুনি, খানসামা; বাবা! তিনটি লোকের পেছনে পাঁচ পাঁচটা প্রাণী!

বিশু বিরক্তির সুরে কহিল,—কেন হবে না, চন্দ্র কাকা যে সে লোক নাকি? মস্ত উকীল, কত নাম, কত টাকা উপায় করে তা জানিস ?

কুসুম বিজ্ঞের মত মুখের ভঙ্গী করিয়া কহিল,—তা আর জানি না, সবই ত শুনিছি। কলকেতায় তিন চারখানা বাড়ী করেছে, গাড়ী ঘোড়া আছে; বেশ লোক! কিন্তু ওর ছেলেটা ভারি হ্যাংলামো; বড় লোকের ছেলে আর দেখতে খুব সুন্দর বলে মাটীতে অহঙ্কারে আর পা যেন পড়ে না।

বিশু উৎসুক দৃষ্টি গাছের উপর হইতে নিম্নে কুসুমের দিকে নিক্ষেপ করিয়া কহিল,—তোর সঙ্গে বুঝি ঐ ছেলেটার ঝগড়া হয়েছে?

মুখখানা ভার করিয়া কুসুম কহিল,—ঝগড়া কেন হবে, শোন না বলি,—আমি যেই গেছি, শুভি মুখপুড়ী অমনি কি তাকে চুপি চুপি বললে; দুটিতে মুখোমুখী বসে ছবি দেখা হচ্ছিল; আমাকে দেখেই শুভি বইখানা তখুনি মুড়ে ফেললে; ছেলেটা একবার আড়চোখে আমার পানে তাকিয়ে বলে উঠলো—চল্ শোভা, আমরা তেতালার ঘরে যাই। শুভি অমনি ঢ়ুগ্‌রে হেসে উঠে তার কথায় সায় দিয়ে বললে—সেই ভালো, অখিল দা, চলো—

বিশু শুষ্ক কণ্ঠে কহিল,—চন্দ্র কাকার ছেলের নাম অখিলই বটে; নামটাই শোনা আছে, দেখা ত আর হয় নি। ভাল কথা, কত বড় ছেলেটা রে, কুসী?

কুসুম জানাইল,—এই মাথায় ঠিক তোমারই মতন, কিন্তু তোমার চেয়ে তার গায়ের রং ঢের ফরসা, ঠিক যেন দুধে আলতায় গোলা; রেঙ্গুণে থাকে কি না—

বিশু পূর্ব্ববৎ শুষ্ক কণ্ঠে মন্তব্য প্রকাশ করিল,—ভালই ত!

শুভি কি ঠিক করেছে জান, বিশুদা?

কি?

তোমার সঙ্গে আর সে ভাব করবে না, মিশবে না, খেলাও করবে না;

অখিল ছেলেটা এখানেই নাকি থাকবে, খেলবেও তার সঙ্গেই—আসতে না আসতেই ত গলাগলি ভাব হয়ে গেছে।

বিশু এবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল,—তুই থাম।

মুখখানি বিকৃত করিয়া কুসুম কহিল,—থামব কেন—আমি কি মিছে কথা বলেছি? এসোনা দেখবে, দুজনে বসে ছবি দেখবার কি ঘটা! আহ্লাদে মেয়ের স্কুলে পর্য্যন্ত যাওয়া হয় নি! বড় লোকের ছেলের সঙ্গে ভাব হয়েছে, তিনি কত রং বেরংয়ের ছবি এনেছেন, মেয়ে অমনি তাইতে আমাকে ফেটে মরছেন আর কি! কাউকে দৃকপাত নেই—বুঝলে?

হঠাৎ গাছের একটা ডাল দুলিয়া উঠিল,—পরক্ষণে ধুপ করিয়া একটা শব্দ হইল। কুসুম দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া দেখিল, ফুল পাড়ার আগ্রহ ত্যাগ করিয়া এবং গাছের দীর্ঘ কাণ্ডটী বাহিয়া নামিবার মত ধৈর্য্যটুকু হারাইয়া তাহাদের বিশুদা একলাফে নিম্নে উপস্থিত!

বিস্ময়ের স্বরে কুসুম কহিল,—মাগো! এ কি তোমার কাণ্ড বিশুদা, এমন করে লাফাতে হয়? যদি হাত পা ভাঙ্গত?

রুক্ষ কণ্ঠে বিশু কহিল,—আমারই লাগতো, তাতে কার কি হত! না হয় আমিই মরতুম—

মুখখানি ম্লান করিয়া কুসুম কহিল,—বালাই! ও কথা বলতে আছে নাকি?

বিশু বিকৃত মুখে কহিল,—থাম্, তোকে আর অমন করে ঢং দেখাতে হবে না।

তুমি যেন কি! তা, নেমে এলে যে বড়? ফুল আর পাড়বে না?

না।

কেন, কি হল তোমার?

হবে আবার কি—পাড়ব না ; আমার খুসী।

দুই চক্ষুর দৃষ্টি ছল ছল করিয়া কুসুম আব্দারের ভঙ্গীতে কহিল—আমি খোঁপায় পরব না ? লক্ষ্মীটি ! অন্ততঃ গোটাকতক পেড়ে দাও, আমি যে ভেবেছিলুম এক ছড়া মালা গেঁথে গলায় পরে শুভিকে দেখিয়ে বলব—বিশুদা দিয়েছে !

এ অনুরোধও বিশুর মর্ম্মস্পর্শ করিল না, সে মুখখানা কঠিন করিয়াই কহিল,—বয়ে গেছে আমার ! আমি আর ফুলও পাড়বো না, তোদের সঙ্গে খেলবও না, আমি ছেলে, ছেলেদের সঙ্গেই খেলব !

কথা কয়টি শেষ করিয়াই বিশু অদূরবর্ত্তী মাঠের দিকে ছুটিল যেখানে বড় বাড়ীর ও পল্লীর নানা বয়সের ছেলেরা খেলায় মাতিয়াছিল ! যে মেয়েটি এতক্ষণ তাহার কাছে ছিল, যাহার তুষ্টিবিধানে সে শাখালাক্রমে গাছের উচ্চ ডালে ফুল আহরণ করিতে উঠিয়াছিল, তাহার দিকে সে আর ফিরিয়াও চাহিল না, সমস্ত বন্ধনই যেন সেই মুহূর্ত্তে উপেক্ষায় ছিন্ন করিয়া গেল।

কুসুম ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না, বিশুর হঠাৎ এ ভাবান্তর হইল কেন ? যে উৎসাহটুকু লইয়া সে তাহাকে ফুল পাড়িয়া দিতে গাছের উপর উঠিয়াছিল, সহসা কেন তাহা ভাঙ্গিয়া গেল এবং মেয়েদের সহিত আর খেলিবে না বলিয়া কেনই বা এরূপ অভিমান করিয়া সে মাঠে ছুটিল ?

৯

দীর্ঘকাল পরে বড় বাড়ীর ধনাঢ্য সরিক চন্দ্রনাথ বাবুর পরিবার আবির্ভাবে শোভার পিতা ধরণীধর যেমন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন বাড়ীর ও পল্লীর সকলেই নবাগতদের কায়দাকানুন দেখিয়া তেমন চমৎকৃত

হইয়াছিলেন। ইঁহাদের চাল্‌চলন, আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, পোষাক পরিচ্ছদ, খাওয়া দাওয়ার ধারা প্রত্যেকটি কেমন যেন বৈচিত্র্যময়, পল্লী-সমাজের সহিত খাপ খাইবার উপযোগী নয়। তথাপি কৃতজ্ঞ ধরণীধর একান্ত অনুগতের মতই সপরিবার প্রতিপালক স্থানীয় অভ্যাগতদের পরিচর্য্যায় তৎপর হইলেন; কোনও বিষয়ে যাহাতে এই সম্মানভাজন ব্যক্তিদের অসুবিধা না ঘটে, সে সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিলেন। ধরণীধরের পত্নী সাবিত্রী দেবী এই ক্ষুদ্র সংসারটি মাথায় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার সুব্যবস্থায় ও আদর আপ্যায়নে চন্দ্রনাথ বাবুর সহধর্ম্মিণী মহামায়া দেবী মুগ্ধই হইয়াছিলেন; ইঁহারা যে কর্ম্মসূত্রে তাঁহাদেরই অনুগ্রহভাজন, এরূপ ধারণাকে মনে স্থান দেন নাই, সুতরাং ইঁহাদের মেলামেশায় অবস্থাগত পার্থক্য কোনরূপ ব্যবধান উপস্থিত করিতে পারে নাই।

শোভা সে দিন স্কুল হইতে ফিরিয়া বিস্ময়ানন্দে দেখিল, বাড়ীতে কতকগুলি নূতন লোক আসিয়াছে এবং যে ঘরগুলি প্রায়ই বন্ধ থাকিত, সেগুলি কেমন সুসজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে! সবচেয়ে বেশী বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল, ইঁহাদের আশ্চর্য্য রকমের সুন্দর ছেলেটি; একান্ত অপরিচিত হইয়াও শোভাকে দেখিয়াই কেমন হাসিমুখে তাহার কাছটিতে ছুটিয়া আসিল।

মহামায়া দেবী শোভাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া হাসিমুখে কহিলেন,—খাসা মেয়ে ত আপনার, পাড়াগাঁয়ে এমন রূপ যে থাকে, তা ত জানতুম না। পড়াচ্ছেন বুঝি, বেশ করেছেন। কন্যার রূপের প্রশংসায় সাবিত্রী দেবীর মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—গাঢ় স্বরে কহিলেন,—পড়ার দিকে ভারি ঝোঁক দিদি. আর শুনেছি, পড়াশুনাতেও নাকি ভালো।

মহামায়া কহিলেন,—আমার খোকাও পড়ার নামে পাগল, বয়েস ত দেখছেন এই; কিন্তু পড়াশুনায় এগিয়েছে অনেক খানি।

খোকা অর্থাৎ অখিল নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল এবং চাহিয়া চাহিয়া স্কুল ফেরৎ এই মেয়েটিকে বিশেষ করিয়াই দেখিতেছিল। শোভাও দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রখর করিয়া পড়াশুনায় অনেকখানি অগ্রসর এই খোকাটির দিকে চাহিয়াছিল, কিন্তু চোখো চোখি হইতেই সে লজ্জারক্ত মুখখানি নত করিল।

মহামায়া কহিলেন,—লজ্জা কিসের মা, এখুনি যে ভাব হয়ে যাবে, ছুটিতে খেলবে, পড়বে, গল্প করবে, আমরা যে আপনার জন তোমাদের।

পরক্ষণে অখিলের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—খোকা, তোমার ছবির য়্যালব্যমগুলো সব এনেছ ত?

খোকা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—আনিয়াছে।

মা কহিলেন,—খুকী আগে কাপড় চোপড় ছাড়ুক, জলটল খাক, তারপর একে নিয়ে গিয়ে দেখাবে, পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসাবাদ করবে, বুঝলে?

অখিল উৎসাহিত হইয়া শোভার দিকে চাহিয়া কহিল,—আমি তাহলে ছবির বইগুলো নিয়ে আসি।

শোভা নিরুত্তরে ঘাড়টি ঈষৎ হেলাইয়া সম্মতি জানাইল।

দেশবিদেশের নানাবিধ সুরঞ্জিত ছবি অনতিবিলম্বেই এই দুইটি অপরিচিত অপরিচিতার চিত্তে আনন্দ ও বিস্ময়ের মধ্য দিয়া একটা প্রীতিপূর্ণ ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি করিয়া দিল।

শোভার মা শোভাকে বলিয়া দিয়াছিলেন,—অখিল তোর দাদা হয়, দাদা বলে ডাকবি।

মায়ের কথায় ঘাড়টি নাড়িয়া সম্মতি দিয়া শোভা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—বিশুদা যে রকম দাদা, নয় মা?

ছবির বইগুলি লইয়া অখিল সেখানে উপস্থিত ছিল, এই নূতন

মেয়েটির মুখে সে এই প্রথম বিশুর নামটি শুনিল। কিন্তু ছবি দেখাইতে বসিয়া শীঘ্রই যখন শোভার সহিত তাহার ভাব হইয়া গেল এবং শোভা তাহার আড়ষ্টভাবটুকু কাটাইয়া ছবিগুলির আলোচনায় যোগ দিবার মত সাহস পাইল, তখন তাহার মুখে কতবারই সে 'বিশুদা' নামক ছেলেটির কথা শুনিল!

একখানা ছবিতে বালক নেপোলিয়ন স্কুলের ছেলেদের সহিত বরফ লইয়া যুদ্ধক্রীড়া করিতেছে এরূপ অঙ্কিত ছিল। নেপোলিয়নকে দেখিয়াই শোভা হর্ষোৎফুল্ল মুখে কহিয়া উঠিল,—ঠিক যেন আমার বিশুদা! খেলবার সময় সেও ঠিক এমনি করে খেলে, আর সকলকে হারিয়ে দেয়।

শোভার কথায় অখিলের উৎসাহ বাধা পাইল, আড় নয়নে বালিকার উৎসাহদীপ্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া, সে নূতন ছবি বাহির করিল। কিন্তু যে ছবিতেও কোনও ছেলের হৃষ্টপুষ্ট চেহারা বা বিক্রম প্রকাশের দ্যোতনা যখনই দেখা যাইত, তৎক্ষণাৎ সে উল্লাসে করতালি দিয়া তাহার উদ্দেশে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মত প্রকাশ করিত,—এও বিশুদা, হুবহু!

আর একখানি বিলাতী ছবিতে দেখা গেল, স্কুলের ছেলেদের মধ্যে খেলার সূত্রে বিষম ঘুষোঘুসি বাধিয়া গিয়াছে; কিন্তু একটি বলবান বালক একাই সকলকে হঠাইয়া দিতেছে। ছবির এই বিজয়ী ছেলেটিকে দেখিয়াই শোভার মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, দৃপ্তকণ্ঠে কহিল,—সেবার বিশুদাও ঠিক এমনই করে স্কুলের এক পাল ছেলেকে একবারে পাট বিছিয়ে দিয়েছিল!

পরক্ষণে দুই চক্ষু তুলিয়া অখিলের দিকে চাহিয়া কহিল,—তুমি দেখ না ভাল করে, তোমারও মনে হবে—ঠিক বিশুদা!

মুখখানা কঠিন করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে অখিল কহিল,—কে তোমার বিশুদা, আমি কি তাকে দেখিছি যে চেহারা মেলাব!

শোভা এবার নিজের ভুল বুঝিতে পারিল, অপ্রতিভের মত লজ্জা-জড়িতকণ্ঠে কহিল,—বিশুদার সঙ্গে তোমার যে এখনো দেখা হয় নি, আমি সে কথা ভুলেই গিয়েছিলুম। সে মামার বাড়ী গেছে, তাদের ইস্কুলের আজ ছুটি কিনা, নইলে এখুনি—

কথাটা আর শেষ হইল না, হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, বিশুদার সহিত এখনও তাহার ভাব হয় নাই, আড়ি রহিয়াছে ; তবে ! কিন্তু বিশু যে মামার বাড়ী গিয়াছে, এ সংবাদ শোভার অজ্ঞাত ছিল না।

এমন আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ছবি দেখার মধ্যেও এই মেয়েটিকে এক এক-বার অন্যমনস্ক দেখিয়া এবং ছবি-বিশেষের প্রশংসায় বারবার সে বিশুর প্রসঙ্গ তুলিতে থাকায় অখিল ক্রমশঃই অধীর ও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছিল। ছবিতে ভাল ছেলে দেখিলেই তাহার এই নূতন সঙ্গিনীটি কত আনন্দেই বিশুদার নাম করে, তাহার দুই কস দিয়া যেন লালা ঝরিতে থাকে ;—কেরে বাপু তোর বিশুদা ! মনের এই বিক্ষুব্ধ ভাবটুকু চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া একবার সে শুষ্ককণ্ঠে কহিয়া ফেলিল,—তুমি ত বেশ মেয়ে দেখছি ! ছবির সকলেই যেন তোমার বিশুদা—এত ছবি ত দেখলে, কিন্তু কোনো-টাকেই ত বললে না—তাকে দেখতে ঠিক আমার মতন ! তোমার বিশুদা কি আমার চেয়েও ভাল ছেলে ? আমার চেয়েও সুন্দর ? এমন সব দামী দামী ছবির বই তার আছে ?

নিমিষে শোভার মুখের ঔজ্জ্বল্য যেন নিবিয়া গেল, নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে অখিলের দিকে চাহিয়া সে কহিল,—বিশুদা যে শুধু পড়ার বই পড়ে, এ রকম ছবির বই ত তার নেই, কোথায় পাবে বল না ? কিন্তু তার গায়ে খুব জোর, তুমি তাকে দেখনি ভাই—

সে তোমার কে হয় ?

দাদা। তুমি যেমন দাদা হয়েছ, সেও তাই।

কোথায় সে থাকে ?

কেন, এই বড় বাড়ীতেই ; ওরাও যে একটা সরিক, তা বুঝি জান না ?

সে বুঝি অনেক বড় ?

তা কেন, ঠিক তোমারই বয়সী ; তবে তোমার মতন এমন ছিপ ছিপে রোগা নয়, এত সুন্দরও নয়। ছবির কথা বলছিলে না ? যে ছেলেগুলো দস্যিপনা করছে আর ঠ্যাঙ্গাচ্ছে তারা যে ঠিক বিশুদার মত, আর যারা মার খেয়ে পালাচ্ছে তারা—

আমার মতন বুঝি ?

ছবিতে তাদের রোগারোগা চেহারা নয় ?

রোগা চেহারা কি খারাপ্!

আমি ত ওকথা বলিনি, হলেই বা রোগা, নাই বা মারামারি করলে, বেশত, তুমি ভালছেলে হয়েই থাক না।

আমি মারামারি মোটেই পছন্দ করি না। তোমার বিশুদা বুঝি এসব খুব ভালবাসে ?

দুই চক্ষু সহসা দীপ্ত করিয়া শোভা কহিল,—বিশুদা ? তার কথা আর বল কেন ! কেউ যদি একটা কিছু অন্যায় করলে, আর রক্ষে নেই ; ছেলে অমনি মালকোঁচা না বেঁধে তখনি রণমুখী !—এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটুকু শেষ করিয়া পরক্ষণেই সে বিশুদার রণরঙ্গের কাহিনীগুলি একটি একটি করিয়া তাহার সঙ্গীকে শুনাইয়া দিল ;—কবে কোথায় কি ভাবে কি সূত্রে বিশু মুটবিহারীর দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, সাঁতারে সব ছেলেকে হারাইয়া কি প্রকারে মেডেল পাইয়াছিল, স্কুলের ছেলেরা এক জোট হইয়া তাহাকে ঘেরাও করিলেও সে একাই কি ভাবে সকলকে কাবু করিয়াছিল এবং সেদিনও স্কুলের পথে কি কাণ্ড সে বাধাইয়াছিল—

কিন্তু বাদ দিল না, এবং এ কথাও লুকাইল না যে, বিশুদার এই সব কাণ্ড সে অকুস্থলে উপস্থিত থাকিয়া অবাক হইয়াই দেখিয়াছে।

অখিল অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার এই নূতন সঙ্গিনীটির মুখে উক্ত গুণ্ডা প্রকৃতির ছেলেটির রোমাঞ্চকর কাহিনী আগাগোড়াই শুনিল ও শুনিয়া মনে মনে বেশ অস্বস্তি বোধ করিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা গম্ভীর মুখে সে কহিল,—তবুও এই ছেলেটার সঙ্গে তুমি মেশ? তোমার লজ্জা করে না? মনে ঘেন্না হয় না?

শোভার মুখে কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল, চঞ্চল দুইটি চক্ষুতেও তাহার ছায়া পড়িল; সপ্রতিভ কণ্ঠে সে উত্তর দিল,—বা-রে! ঘেন্না কেন হবে, লজ্জাই বা করব কেন? বিশুদার কাছে দুটি বেলা যখন পড়তে যেতে হয়—

অখিল কণ্ঠের স্বরে কিঞ্চিৎ শ্লেষ দিয়া কহিল,—এই ছেলেটার কাছেই আবার পড়া হয়? খালি খালি যে মারামারি করে বেড়ায়, পড়ার সে কি ধার ধারে শুনি?

শোভা বিজ্ঞের মত মুখ ভঙ্গী করিয়া কহিল,—তা বুঝি জান না, পড়া শোনায় বিশুদা খুব ভাল; পড়াতেও কেউ ওকে হারাতে পারে না।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া অখিল প্রশ্ন করিল,—এখনও ওর কাছেই তা হলে পড়া হয়?

এ প্রশ্ন শোভার সুন্দর মুখখানির উপর যেন একটি বিবর্ণ আবরণ পড়িল; একটি নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদু কণ্ঠে সে উত্তর দিল,—এ হপ্তায় একটি দিনও হয় নি! বিশুদা ডাকে না, আমিও যাই না—

কেন?

ঝগড়া হয়েছে তা বুঝি জান না? আচ্ছা অখিল দা, তুমিই বল ত, দোষটি কার!—অতঃপর কি সূত্রে তাহাদের এই কলহ, উভয়ের মধ্যে

কথাবার্ত্তা যে এই কয়দিন বন্ধ এবং দুষ্টু মেয়ে কুসীর সঙ্গে দোস্তি করিয়া, সোহাগ করিয়া তাহাকে ফুল পাড়িয়া দিয়া ও গোটাকতক ফুল তাহার হাত দিয়া পাঠাইয়া কি ভাবে বিশুদা তাহার অপমান করিয়াছে, প্রত্যুত্তরে ফুলগুলির পিণ্ডি চটকাইয়া সেও কেমন জবাব দিয়াছে—এ সকল কাহিনীও আর্ত্তকণ্ঠে শোভা তাহার সঙ্গীকে শুনাইতে দ্বিধা করিল না।

এই সময় কুসুম সেইখানে আসিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—বড় মানুষের ছেলেটিকে একলাই গিলে খাসনি শুভি, আমরাও না হয় ভাব করলুম!

কুসুমের আবির্ভাব ও তাহার মত বয়সের মেয়ের পক্ষে অনুচিত এইরূপ বিশ্রী কথায় শোভা অতিমাত্র সচেতন হইয়া তাহার সঙ্গীকে চুপি চুপি শুনাইয়া দিল,—এই দুষ্টু মেয়েটার কথাই এই মাত্র আমি তোমাকে বলছিলুম, এরই নাম কুসী, বেহায়ার এক শেষ, ভারি লাগানে মেয়ে, এর সঙ্গে কথা বলো না তুমি, অখিল দা!

ইতিমধ্যে কুসুম তাহাদের পার্শ্বেই আসিয়াছিল এবং খোলা অবস্থায় ছবির বইখানি দেখিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ একান্ত আগ্রহে তুলিয়া লইতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে নাই।

ছবির কেতাবখানি এভাবে হস্তান্তরিত হইতে দেখিয়াই শোভা ক্ষিপ্তের মত সেখানি সবলে কুসুমের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া কহিল,—তুমি এ বইয়ে হাত দিয়োনা বলছি!

কুসুম ভাবে নাই যে, শোভা এই নূতন ছেলেটির সমক্ষেই এভাবে তাহাকে অপ্রস্তুত করিয়া দিবে। ক্ষণকালের জন্য সে যেন হতভম্ব হইয়া গেল, কিন্তু এই ক্ষণকালের মধ্যেই শোভা অখিলের একখানি হাত ধরিয়া তাহাতে সজোরে টান দিয়া কহিল,—চল অখিল-দা, আমরা তেতালার ঘরে যাই।

যখন প্রকৃতিস্থ হইল, তখন তাহারা উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া সোপান ভাঙ্গিয়া তেতালার ঘরের উদ্দেশে উঠিতেছিল।

১০

পর দিন অখিলের পীড়াপীড়িতে শোভা স্কুল কামাই করিয়াই বসিল। অখিলের একান্ত ইচ্ছা দেখিয়া শোভার বাবা মা আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। এ দিন অখিল যে সকল গল্পের বই ও নানাবিধ নূতন ধরণের খেলার উপাদান শোভাকে দেখাইল, তাহাতে স্কুলের পড়া অপেক্ষা সেগুলির উপরে শোভার উৎসুক চিত্তটি বিশেষভাবেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তাহারা লুডো খেলিল, জীব জন্তু ও রাক্ষস-খোক্কসের গল্পের বইগুলি দুজনে কাড়াকাড়ি করিয়া পড়িল। কিন্তু এই খেলা ও পড়ার ভিতরে কত প্রসঙ্গেই বিশুদার কথা তুলিয়া শোভা আমোদ প্রমোদের রস ভঙ্গ করিয়া দিল এবং এই সূত্রে কত বারই অখিলের মুখে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট করিয়া তুলিল!

অপরাহ্নের দিকে খেলিতে খেলিতে হঠাৎ হাতখানি গুটাইয়া শোভা কহিল,—আর ভাল লাগছে না অখিলদা, কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে; বিশুদা কিন্তু থাকলে বেশ হ'ত, তিনজনে তাহলে খেলতুম!

শোভা মেয়েটিকে অখিলের ভারি ভাল লাগিয়াছিল; এখানে আসিয়াই সে যে এমন একটি মনের মত খেলার সঙ্গিনী পাইবে, তাহা বুঝি কল্পনাও করে নাই। যতই সে ইহার সহিত মিশিতেছিল, তাহার মনের মধ্যে একটা প্রীতির ভাব ততই যেন নিবিড় হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তথাপি এই প্রীতিটুকু অখিলের চিত্তাকাশে নিরবচ্ছিন্ন হইতে পারিতেছিল না, মধ্যে মধ্যে বিরক্তির মেঘ তুলিতেছিল বিশু নামক দুর্দান্ত

প্রকৃতি ছেলেটির প্রসঙ্গ ; সুতরাং হাতের ঘুঁটি ফেলিয়া খোকা এই খেলায় বিশুদার যোগদানের সম্ভাবনা তুলিতেই অখিল এবার অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল।

সত্যই, যে ধারায় এই গর্ব্বিত ছেলেটির মনোবৃত্তি গঠিত হইবার অবসর পাইয়াছে, তাহাতে কোনও আকাঙ্ক্ষাই এ পর্য্যন্ত তাহার অপূর্ণ থাকে নাই বা বাধা পায় নাই। এক মাত্র বংশধর, বিপুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী, আদরের দুলাল এই বালক,—পিতা মাতাও পুত্রের সকল আব্দার রক্ষা করিতে সদা সচেতন। এখানে আসিয়া যে মেয়েটিকে সে তাহার খেলার সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছে, সে যে তাহাদেরই এক অনুগ্রহ-ভাজনের কন্যা ও এই কন্যার পিতা মাতা ইহাদের পরিচর্য্যায় বিশেষ আগ্রহান্বিত, সেটুকু উপলব্ধি করিবার মত বুদ্ধি এই ছেলেটির ছিল এবং বুদ্ধিটুকু খেলাইয়া সহজেই সাব্যস্ত করিতে পারিয়াছিল যে, এই মেয়েটির উপরও তাহার অধিকার আছে ও তাহারই ইচ্ছার তালে তালে সে পা ফেলিয়া চলিবে। কিন্তু খেলার সম্বন্ধে শোভা নিজের স্বাধীন ইচ্ছাটুকু এ ভাবে প্রকাশ করায় অখিলের সহিষ্ণুতা ক্ষুণ্ণ হইবারই কথা। কাযেই অপ্রসন্ন মুখে সে আপত্তি তুলিল,—তুমি বললেই ত আর হয় না, আমি যদি তাকে নিয়ে না খেলি!

নূতন সঙ্গীর এই অদ্ভুত আপত্তি শোভার নির্ম্মল মনটির উপর কঠিন আঘাত দিল, হাসির যে ক্ষীণ আভাটুকু তাহার মুখখানির উপর পড়িয়াছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল, দুইটি আয়ত চক্ষুর দৃষ্টিতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সে প্রশ্ন করিল,—বিশুদার মতন ভাল ছেলের সঙ্গেও তুমি খেলবে না?

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অখিল উত্তর দিল,—না; ওকে বুঝি ভাল ছেলে বলে? পাজী—দুষ্টু—ডানপিটে—

চাঁপার কলির মত সুন্দর অঙ্গুলিটি তুলিয়া গম্ভীর মুখে শোভা কহিল,—চুপ! বিশুদা যদি এ কথা শোনে, রক্ষে রাখবে না কিন্তু!

অখিল রীতিমত রুখিয়া কহিল,—কি করবে সে আমার শুনি? আমি তাকে 'কেয়ার' করি না—

শোভা কণ্ঠস্বর অতিশয় স্নিগ্ধ ও কোমল করিয়া কহিল,—তুমি ত এখনো বিশুদাকে দেখ নি, তবে কেন তার ওপর মিছিমিছি রাগ করছ, অখিল দা? সত্যি, সে কারুর সঙ্গে ওপরপড়া হয়ে ঝগড়া করে না, ইট্‌টি কেউ ছুঁড়লে, তবে সে পাটকেলটি ছুঁড়ে মারে; আমি তোমাকে কিছুতেই ইট ছুঁড়তে দেব না—

অখিল উষ্ণ হইয়া কহিল,—আমার দায় পড়েছে ইট ছোঁড়বার! ময়লার ওপর তাগ করে ইট ফেললেই গায়ে ছিটকে লাগে, সে আমি জানি। কিন্তু ঐ ছেলেটার সঙ্গে খেলা হবে না—এ আমি বলে রাখছি।

শোভা মুখখানির এক অভিনব ভঙ্গী করিয়া কহিল,—বিশুদাকে ছেটে ফেলে খেলা বুঝি হয়?

অখিল কহিল,—কেন হবে না? আমরা দুজনে খেলব, না হয় আরও ভাল ভাল সঙ্গী বেছে নেব; আর ঐ ছেলেটার সঙ্গে ত তোমার আড়ি হয়ে আছে বললে,—তবে?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শোভা উত্তর দিল,—ও অমন হয়! কতবার এমন আড়ি হয়েছে, এক এক দিনের ঝগড়ার কথা শোনো ত অবাক হয়ে যাবে, কিন্তু তার পরেই 'ভাব' বলে আবার গলায় গলায় ভাব!

কথার সঙ্গে সঙ্গেই বালিকার মুখখানি পুনরায় হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অখিল এতক্ষণ তাহার দিকেই চাহিয়াছিল, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া এইবার কহিল,—তাহলে এবারও ভাব হবে?

শোভার মুখে চিন্তার ছায়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠের স্বরও গাঢ় হইয়া

হইয়া আসিল; পরক্ষণে অখিলের দিকে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল,—তা কি করে এখন বলি? তবে একথা ঠিক, আমি এবার কিছুতেই সেধে ভাব করছি না। বেশ ত, তুমিই তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ' না—আমার সঙ্গে আড়ি দিয়েছ কেন?

বিস্ময়ের সুরে অখিল কহিল,—আমি!

বিস্মিত অখিলের রিষ্ট-ওয়াচ বাঁধা সুন্দর হাতখানি সজোরে টানিয়া শোভা উৎসাহের সুরে কহিল,—চল না বাইরে যাই,—কুণো বেড়ালের মত অষ্টপ্রহর ঘরের কোণে বসে থাকে না—চল না এখানকার খেলার মাঠে তোমাকে নিয়ে যাই, তোমাকে দেখে সবাই অবাক হয়ে যাক, ভাবুক—কোথা থেকে এল—এ কোন্ রাজপুত্তুর!

শোভার শেষের দিকের কথাটা অখিলের খুবই প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল, সুতরাং শোভার এই অনুরোধটুকু রক্ষা করিতে সে কোনও আপত্তিই আর তুলিল না।

১১

বড় বাড়ীর সম্মুখে সুবিস্তীর্ণ হাতায় ছেলেদের হাডু-ডু খেলাটি তখন চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। বিশু যে দলে খেলিতেছিল, সে দলের আর সকলেই 'মোর' হইয়া পরাজয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে, একা বিশুই অবশিষ্ট, কিন্তু সে যেন মরিয়া হইয়াই পণ করিয়াছে—কিছুতেই 'মোর' হইবে না; অথচ এই দুর্দ্ধর্ষ ছেলেটিকে সদলবলে ধরিয়া 'মোর' করিয়া দিয়া জয়টিকা পরিবার জন্য অপর পক্ষের ছেলেদেরও উৎসাহের অন্ত ছিল না।

শোভা যখন অখিলকে লইয়া খেলার সীমানার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, ঠিক সেই সময় বিশু প্রতিপক্ষের যে কোনও একজনকে 'মোর'

করিয়া দিয়া বিনিময়ে নিজপক্ষের কাহাকেও বাঁচাইয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে 'চড়াই' ছাড়াইয়া অপর পক্ষের কোটের ভিতরে ঢুকিয়া খেলা দিতেছিল। কিন্তু সতর্ক প্রতিপক্ষ হঠিবার ছলনা করিয়া সহসা ঘুরিয়া একযোগে সকলেই বিশুর উপরে গিয়া পড়িল। এই অতর্কিত আক্রমণে বিশুও প্রাণপণে দম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আক্রমণকারীদের প্রভাব মুক্ত হইবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করিতেছিল। বিশুকে এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় দেখিয়াই শোভা সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল, যেন অতি অপ্রত্যাশিত কোনও সাংঘাতিক সঙ্কট মুখব্যাদান করিয়া তাহার একান্ত সম্মুখে উপস্থিত; নিদারুণ উত্তেজনায় মুখ ও দুই চক্ষু রাঙ্গা করিয়া স্পন্দিত বক্ষে কম্পিতকণ্ঠে সে তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল,—আর একটু বিশুদা, আর একটু, চড়াই পেছনে, দম যেন ছেড়ো না—

বিশুর 'দম' তখন প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল, এতগুলি প্রতি-যোগীর প্রভাব কাটাইয়া আর সে সীমানার দিকে ফিরিতে পারিতেছিল না; কিন্তু এই সঙ্কট সময় শোভার মুখের এই উৎসাহ পূর্ণ কয়টি কথা যেন কোন্ দুর্লভ সঞ্জীবনী মন্ত্রের মত তাহার মনে অমৃত সেচন করিয়া দিল, শিথিল ইন্দ্রিয়গুলির ভিতর দিয়া যেন দুর্ব্বার শক্তির একটা তীব্র প্রবাহ সবেগে নিঃসৃত হইল, তাহারই প্রভাবে একটা প্রচণ্ড ঝটকায় আততায়ী-দের বাহু পাশ ছিন্ন করিয়া সে শেষ দমটুকু লইয়া নিজের কোর্টে ফিরিয়া গেল। বিশুর দলের যাহারা 'মোর' হইয়া বসিয়াছিল, তাহারা সকলেই সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল; শোভাও উল্লাসে করতালি দিয়া কহিল, —বাহোবা, বিশুদা বাহোবা!

উৎসাহের উদ্দীপনায় এতক্ষণ এই মেয়েটি সবই ভুলিয়াছিল, শুধুই তাহার চক্ষুর উপর ভাসিতেছিল—বিশুদার সঙ্কটাপন্ন মূর্ত্তি! সঙ্কটের অবসান হইলে সহসা তাহার মনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল—পিছনের কথা;

বিশুদার সহিত তাহার ভাবের অভাব, অখিল দা'ও মুখখানা ভার করিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। এ অবস্থায় দুই পা পিছাইয়া অখিলের একান্ত কাছে গিয়া মৃদুকণ্ঠে সে কহিল,—দেখলে ত, বিশুদার গায়ে কি রকম জোর! একলা সবাইকে হারিয়ে দিলে কেমন!

অখিল বদ্ধ দৃষ্টিতে এতক্ষণ বিশুকেই দেখিতেছিল। শোভার কথা তাহার কাণে বাজিল বটে, কিন্তু কোনও উত্তর দিল না।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার পর এদিনের মত খেলা ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু খেলা ভাঙ্গিলেও শোভার এই নূতন সঙ্গীটিকে লইয়া ছেলেদের মধ্যে কাণাঘুষা আরম্ভ হইয়া গেল। এই আগন্তুকটির কথা সকলে শুনিলেও দেখিবার সুযোগ তাহাদের এই প্রথম ঘটিল; দামী জামা কাপড় পরা এই সুন্দর ছেলেটির সহিত ভাব করিতে অনেক ছেলেই আগ্রহান্বিত হইল।

বিশু এই সময় মালকোঁচা খুলিয়া হাত পায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে আড় নয়নে পাশাপাশি দণ্ডায়মান শোভা ও অখিলের দিকে একবার তাকাইল, পরক্ষণেই মুখখানা অস্বাভাবিক রকম ভার করিয়া তাহাদের পাশ কাটাইয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

অন্যান্য ছেলেরা তখন অখিলের সহিত আলাপ করিতে ব্যস্ত, শোভার সমস্ত মনটুকুই তখন বিশুর দিকে ঝুঁকিয়াছে, খেলায় এমনভাবে জিতিয়াও সে যে মুখখানি অন্ধকার করিয়া চলিয়াছে, এ দৃশ্য তাহার পক্ষে অসহ্য, বিশুর প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে যেন তাহার ছোট বুকখানির উপর হাতুড়ির ঘা পড়িতেছিল; সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, মনের সমস্ত অভিমান সবলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দ্রুতপদে বিশুর কাছটিতে ছুটিয়া গেল, পিছন হইতে তাহার হাতখানি ধরিয়া ঈষৎ অনুযোগের সুরে কহিল, তুমি ত বেশ ছেলে বিশুদা, আমরা তোমার সঙ্গে ভাব করতে এলুম, আর তুমি অমনি পালাচ্ছ? এসো—

কথা শেষ করিয়াই শোভা বিশুর হাতখানি একটু জোর দিয়াই টানিল। কিন্তু বিশুর মনে তখন কুসুমের কথাগুলি কাঁটার মতই বিঁধিয়া খচ খচ করিতেছিল, শোভার কোমল হাতের পরশ পাইয়াও তাহা প্রশমিত হইল না, বরং তাহার স্বভাবসিদ্ধ হঠকারিতা এমনই উগ্র হইয়া উঠিল যে, কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়াই সহসা ধৃত হাতখানি সবলে টানিয়া লইল এবং এই আকর্ষণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া শোভা মুখ থুবড়াইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। হঠাৎ যে এমন হইবে বিশু তাহা ভাবে নাই, সে স্তব্ধ হইয়া গেল, ছেলেরা সকলেই অবাক হইয়া চাহিল, কেবল অখিল ঘুসী পাকাইয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তর্জ্জন তুলিল,—ইতর, জানোয়ার, রাস্কেল কোথাকার—

কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার এই তর্জ্জন, সে তখন ক্ষিপ্রহস্তে শোভাকে তুলিয়াছে ও শোভার কপালের দুর্দ্দশা দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে! পতনকালে একখণ্ড খোলায় বিঁধিয়া শোভার কপালের একস্থান কাটিয়া যায়, আহত স্থান হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিয়াছে, সেই রক্ত গড়াইয়া মুখখানা ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে!

শোভার অবস্থা দেখিয়া ছেলেরা বিভিন্ন সুরেই তাহাদের তৎকালীন মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, অখিলের ইংরেজী বাঙ্গালা ও হিন্দী মিশ্রিত নানারূপ তর্জ্জনও চলিয়াছিল। কিন্তু বিশু কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজের কোঁচার খুঁটটি দিয়া শোভার মুখের রক্তধারা মুছিয়া দিল; কপালের রক্তে শোভার সুন্দর মুখখানি রঞ্জিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে চক্ষুর অশ্রু মিশিয়াছে, এরূপ কোনও নিদর্শন পাওয়া গেল না; শুধু একটিবার দুই চক্ষু মেলিয়া বিশুর দিকে চাহিয়া সে কহিল,—ছেড়ে দাও!

অখিলও এই সময় ব্যগ্রভাবে শোভার একখানি হাত ধরিয়া উগ্রকণ্ঠে

কহিল,—বাড়ী চল শোভা,. আমি বাবাকে বলে এখুনি এর বিহিত করছি।

এই ছেলেটির যে রূঢ় কথাগুলি এতক্ষণ বিশু গ্রাহ্য করে নাই, এখন সেগুলি পর্য্যন্ত ইহার সঙ্গে একত্র যোগ দিয়া যেন তাহার পীঠে চাবুকের আঘাত দিল! একেই তাহার মন বিষাইয়াছিল, এবার তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল অখিলের হুমকি; শোভাকে ছাড়িয়া সে বাঘের মত অখিলের সম্মুখে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল এবং ক্ষিপ্রহস্তে তাহার রিষ্টওয়াচ বাঁধা হাতের কব্জিটি চাপিয়া ধরিয়া কর্কশ কণ্ঠে কহিল,—কি বিহিত করবি, এখনি কর্—

হাত ছাড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া কম্পিত কণ্ঠে অখিল কহিল,—হাত ছেড়েদে বলছি পাড়াগেঁয়ে ভূত, নইলে এখুনি গুর্খা দিয়ে জুতিয়ে দেব—

ইহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ যে কাণ্ড বিশু বাধাইয়া বসিল, তাহা শুধু তাহার পক্ষেই সম্ভব; কিন্তু ফল হইল তাহার অতি সাংঘাতিক!

বিশুর একখানি হাতের কঠিন চাপে অখিলের হাতের দামী ঘড়িটির কাচখানি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল এবং অপর হাতের উপর্য্যুপরি মুষ্টির প্রহারে তাহার ওষ্ঠ কাটিয়া রক্ত ছুটিল।

শোভা বাকশক্তি হারাইয়া ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল, আর অখিল পিছু হঠিয়া তাহাদের অনুচর কয়টির নাম ধরিয়া তারস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিল।

চন্দ্রনাথ বাবু এই সময় পল্লীভ্রমণের উদ্দেশে বাহিরে আসিতেছিলেন, দরোয়ান মহাবীর সিং পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রভুর অনুসরণ করিতেছিল, তাহার মাথায় গুর্খাই টুপী, কোমরে কুকরী; খোকাবাবুর আর্ত্তনাদ ও আক্রান্ত অবস্থা প্রভু ভৃত্য উভয়কেই স্তম্ভিত করিয়া দিল। কর্ত্তা হুকুম দিলেন,—উস্কো পাকড়ো।

মহাবীর দ্রুতবেগে মাঠে ছুটিল, কর্ত্তাও পুত্রের দিকে অগ্রসর হইলেন। মহাবীর কাছে আসিয়াই বিশুর একখানা হাত ধরিল, কিন্তু বিশু তৎক্ষণাৎ অপর হাতখানি বাড়াইয়া মহাবীরের কোমরে বাঁধা চামড়ার খাপ হইতে খপ করিয়া কুকুরীখানি টানিয়া লইল। হাতিয়ার অপরের হস্তগত হইয়াছে দেখিয়া মহাবীরের বীরত্ব দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে বিশুর হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার গণ্ডদেশে সজোরে এক চপেটাঘাত করিল। সে বোধ হয় ভাবিয়াছিল, তাহার হাতের একটি থাপ্পর এই বাঙ্গালী ছেলেটির গালে পড়িলেই কুকরী তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িবে। কিন্তু গুর্খা প্রহরীর হিসাবে ভুল হইল, বিশু থাপ্পর খাইয়াই আততায়ীর উদ্যত হাতটি লক্ষ্য করিয়া তাহার হাতের কুকুরী চালাইয়া দিল, আঘাত অব্যর্থ হইয়া মহাবীরের হাতের কব্জী কাটিয়া হাড় পর্য্যন্ত স্পর্শ করিল। পরক্ষণেই সে অপর হাতে আহত হাতখানি চাপিয়া একটা তীব্র আর্ত্তনাদের সহিত মাটীর উপর বসিয়া পড়িল।

চন্দ্রনাথ বাবু এ দৃশ্যে ধৈর্য্য হারাইয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন—খুনে ছেলে, খুন করেছে; ধরো ওকে—ধরো!

১২

রাস্তার ধারেই রহিমদের বাড়ী। বাড়ীর বাহিরে দর্জ্জিখানার সম্মুখে একখণ্ড খোলা জমি; তাহাতে তরি-তরকারী ও মরশুমী ফুলের গাছ; চারিধারে বাঁশ ও বাঁখারীর বেড়া বাঁধিয়া স্থানটাকে সুরক্ষিত করা হইয়াছে। ইহারই মধ্যাংশে ছেঁচা বাঁশের মজবুত আগড় দ্বারের অভাব মোচন করিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে এখানটায় ছিল কদর্য্য জঙ্গল, এখন মনোহর উদ্যান গড়িয়া উঠিতেছে। পুরাতন অকর্ম্মণ্য গাছ বা আগাছা-

গুলির চিহ্নও নাই, কেবল একটা সুবৃহৎ জামরুল গাছ একাংশ অধিকার করিয়া অতীতের সাক্ষীর মত এখনও দাঁড়াইয়া আছে।

শুধুই যে দাঁড়াইয়া আছে, ইহা বলা চলে না। পারিপার্শ্বিক আগাছা-গুলির আবেষ্টন মুক্ত হইয়া এবার ইহার শাখা-প্রশাখাগুলি সুপ্রচুর ফলে ভরিয়া গিয়াছে, সুতরাং শোভা ও সৌন্দর্য্যের একটা দীপ্তি অস্তমিত সূর্য্যের শেষ আভাটুকুর সহিত মিশিয়া ফলকর গাছটিকে যেন কতই মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

রহিম গাছে উঠিয়া জামরুল পাড়িতেছিল, তলায় থাকিয়া পরি ও হাজি সেগুলি কুড়াইবার জন্য কাড়াকাড়ি কাণ্ড বাধাইয়াছিল। এ ব্যাপারে হাজির তৎপরতাই যে অধিক, তাহার কোঁচড়ের পূরন্ত অবস্থা সে-পরিচয় দিতেছিল। সুপক্ক ফলগুলি বাছিয়া বাছিয়া রহিম যেমন নীচে ফেলিতেছিল, হাজি তৎক্ষণাৎ বায়ুর গতিতে পরিকে অতিক্রম করিয়া অধিকাংশ ফলই নিজের কোঁচড়ে তুলিয়া সাফল্যের উল্লাসে পুনঃ পুনঃ কহিতেছিল,—খোদার কিরে, মোর হক।

ক্রমে পরির স্বাভাবিক হাসিমাখা মুখখানিতেও বিরক্তির ছায়া পড়িল, হাজির কথার পীঠে তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল,—অমন করে চেঁচিয়ে মরছিস্ কেন!

হাজির আজ উৎসাহ অসীম, কিছুমাত্র না দমিয়াই উত্তর দিল,—মোর খুসী।

পরি মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিল,—'আমার' বলতে কি হয়েছে? ফের যদি কথায় কথায় 'মোর' 'মুই' 'মোকে'এ সব বলবি, তোর সঙ্গে আমরা কথা বন্ধ করে দেব।

হাজির উৎসাহ পলকে নিবিয়া গেল। ইতিমধ্যেই অনেকগুলি লোভনীয় ফল নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে দেখিয়াও সেগুলি সংগ্রহ

করিবার আগ্রহ তাহার আর দেখা গেল না। মুখখানা ভার করিয়া সে কহিল,—খালি খালি তুই মোকে দিক্ করিস্, পরি!

পরি কহিল,—খালি খালি কি মিছে বলি? তোর কথা শুনে বাবু পাড়ার মেয়েরা হাসাহাসি করে, তবু তোর আক্কেল হবে না?

হাজি মনে মনে কি ভাবিয়া কহিল,—আমি যে ভুলে যাই।

পরি উৎসাহের সুরে কহিল—এই ত কেমন বললি—আমি! 'মুই' বলতেও যতক্ষণ সময় লাগে, 'আমি' বলতেও তো তাই, তবে? কথা বলবার সময় একটু হুঁস্ থাকলে, এ ভুল দুদিনেই শুধরে যাবে।

এই সময় একটি পরিপক্ব ফল হাজির ঠিক মাথাটির উপর আসিয়া পড়িল। হাজি তৎক্ষণাৎ আর্ত্তনাদ তুলিল,—মাগো!

পরি হাসিয়া কহিল,—কি হল?

হাজি গাছের দিকে কোপকটাক্ষে চাহিয়া কহিল,—মারলে, দেখলে না?

গাছের উপর হইতে রহিম কহিল,—মারব কেন? তুই এখ্খুনি 'আমি' বললি কিনা, তাই তোকে গাছের সব চেয়ে সেরা জামরুলটা বখ্শিস্ করলুম।

রহিমের কথা শুনিয়াই পরি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পরির মুখের হাসি হাজিকে খুসী করিল, অথবা রাগাইয়া দিল, বুঝিতে পারা গেল না। সে তখন দুই চক্ষু দৃপ্ত করিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়াছিল এবং বেড়ার কিনারা ঘেঁসিয়া যে-ছেলেটি হন্ হন্ করিয়া রাস্তার উপর দিয়া ছুটিয়াছিল, পরির উচ্ছ্বসিত হাসি সহসা তাহাকে চমকিত করিয়া দিয়াছে দেখিয়া, সকৌতুকে সেইদিকে একটি অঙ্গুলি হেলাইয়া দিল।

হাজির নির্দ্দেশ ব্যর্থ হইল না, পরি রাস্তার দিকে চাহিবামাত্রই বিস্ময়া-তঙ্কে দেখিল,—সে দিনের পরিচিত ছেলেটি তাহাদেরই বাগানের বেড়ার

পাশ দিয়া চলিয়াছে ; আজ 'আর তাহার সে চেহারা নাই, খালি গা, ধূলায় মলিন, মাথার চুলগুলি এলো মেলো, আধময়লা যে কাপড়খানা পরিয়াছে, তাহার দুই তিন স্থানে তাজা রক্তের দাগ, হাত দুখানাও তাহার নিদর্শন স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। বোধ হয় সে ছুটিতে ছুটিতে পরির সরব হাসিতে আকৃষ্ট হইয়া বাগানের ধারটিতে মুহূর্ত্তের জন্য আসিয়াছিল, কিন্তু ইহাদিগকে দেখিয়াই আবার ছুট দিয়াছে।

পরি শিহরিয়া উঠিল, ছেলেটি যে কোনও বিপদ বাধাইয়া বসিয়াছে, ইহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। পরক্ষণেই সে উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকিল;—দাদা! তোমাদের ইস্কুলের সেই বিশু ছেলেটা—

তাহাকে আর বলিতে হইল না, গাছের ডালে বসিয়া রহিম তাহাকে প্রথমেই লক্ষ্য করিয়াছিল এবং ক্ষিপ্রগতিতে নীচে নামিতেছিল। নিকটে আসিয়া রহিম কহিল,—দেখতে পেয়েই নেমে এসেছি, জানতে হচ্ছে—ব্যাপার কি!

কথার সঙ্গে সঙ্গেই রহিম আগড় ঠেলিয়া ছুটিয়া পথে আসিয়া পড়িল, হাত তুলিয়া উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল—বিশু!

বোধ হয় বিশুকে রহিমের এই প্রথম আহ্বান, সমবেদনার সুরে এই সর্ব্বপ্রথম সম্বোধন।

বিশু থামিল; চাহিয়া দেখিল, তাহার পরম প্রতিদ্বন্দ্বী তফাতে থাকিয়া হাতের সঙ্কেতে তাহাকে ফিরিতে আহ্বান করিতেছে। তাহার পিছনে সেদিনের সেই ফাজিল মেয়েটিকেও দেখা যাইতেছে,—যে এই মাত্র তাহাকে দেখিয়াই খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল!

কিন্তু তথাপি বিশুকে দাঁড়াইতে হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই মনে মনে সে ভাবিয়া লইল, এ পর্য্যন্ত বরাবরই সে অবাধে এত দূর ছুটিয়া আসিয়াছে, কেহ তাহাকে লক্ষ্য করে নাই। বাধাও কাহারও নিকট সে পায় নাই।

কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে যাহাদের সম্মুখে তাঁহাকে পড়িতে হইয়াছে, তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেও তাহার নিস্কৃতি নাই, ইহারা সমস্তই প্রকাশ করিয়া দিবে। ইহা অপেক্ষা আহ্বান শুনাই ভাল, বিশেষতঃ যখন গায়ে পড়িয়াই এই ছেলেটা তাহাকে এ ভাবে ডাকিতেছে।

রহিম কাছে আসিয়া অতিশয় কোমলকণ্ঠে সহানুভূতির ভঙ্গীতে প্রশ্ন করিল,—একি কাণ্ড! কি হয়েছে, ভাই?

বিশু স্তব্ধ! সে ভাবিয়াছিল, তাহার প্রতি অতি বিদ্বেষী এই ছেলেটি তাহাদের বাড়ীর কাছে তাহাকে পাইয়া হয়ত কত কড়া কথা বলিবে, কিংবা অপমান করিবে। কিন্তু তাহার মুখে হঠাৎ এরূপ প্রশ্ন শুনিয়া বিশুর দুই চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল, কণ্ঠ গাঢ় হইয়া আসিল, ব্যাকুলভাবে সে কহিল—দেখতেই তো পাচ্ছ, একটা রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে ফেলেছি, আমাকে ধরতে লোক ছুটেছে, আমি পালাচ্ছি।

বিশু ভাবিয়াছিল, রহিম এ কথা শুনিয়াই ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িবে এবং তাহার সংস্রব এড়াইতে চাহিবে। কিন্তু রহিম মনের সংশয় ও বিস্ময় সবলে দমন করিয়াই কহিল,—তুমি ভাই যে রকম হাঁপাচ্ছ, তাতে তো বেশী দূর যেতে পারবে না, তার চেয়ে আমাদের বাড়ীতেই কেন চল না, কেউ তোমাকে ধরতে পারবে না।

বিশু ক্ষণকাল চুপ করিয়া কি ভাবিল, তাহার পর কহিল,—আমার সঙ্গে তোমার ঝগড়াই চলে আসছে বরাবর, তোমাকে দেখেই আমার কি মনে হয়েছিল জান? বুঝি এবার ধরা পড়লুম! কিন্তু তুমি কিছু না শুনেই, শুধু আমি বিপদে পড়েছি জেনেই, তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাইছ! তোমার কথা শুনে আমার গলা দিয়ে কান্না যেন ঠেলে আসছে।

পিছন হইতে পরি সহসা কহিয়া উঠিল,—কিন্তু পথের মাঝে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে কাঁদাটা কি ভাল? তাতে লোকে হাসবে। ঐ ত আমাদের বাড়ী, দেরী করছ কেন, চল না।

বিশু দুই চক্ষু মেলিয়া মেয়েটির দিকে চাহিল, এ অবস্থাতেও সে দিনের কথা তাহার স্মৃতিপথে বিদ্যুতের মত একটা তীক্ষ্ণ ঝিলিক দিয়া গেল। একটু পূর্ব্বের সরব হাসির উচ্ছ্বাসটিও সহসা ভাসিয়া আসিয়া তাহার বুকে বাজিল। দৃষ্টি রহিমের দিকে ফিরাইয়া সে কহিল,—আমি কি করেছি তাত জান না; একটা লোকের হাতের কব্জিখানা এক রকম কেটে ফেলেছি; আমার পেছনে তারা পুলিস লিলিয়ে দিয়েছে; এখন যদি তোমাদের বাড়ীতে লুকুই, তাতে তোমরা পর্য্যন্ত বিপদে পড়বে। তার চেয়ে আমাকে পালাতে দাও, আমি যাই—যে দিকে দুচক্ষু যায়।

পরি কহিল,—তা কি হয়? আমাদের চোখে যখন পড়ে গেছ, আমরাই বা ছাড়ব কেন? বাবা যদি এসে একথা শোনেন, তিন দিন আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, জান?

রহিম কহিল,—সত্যি ভাই, আমার বাবার এদিকে ভারি দপদপা; তিনি বলেন, অতি বড় দুষমণও যদি বিপদে প'ড়ে তোমার বাড়ীর ধারে আসে, প্রাণ দিয়েও তাকে রক্ষা করবে। বেশ ত, তুমি আমাদের বাড়ীর অন্দরে যেতে না চাও, বাইরে দর্জ্জীখানাতেই চলো; জানত, আজ হাটবার, দলিজ বন্ধ; কেউ সেখানে নেই। চল,—সেখানে বসে জিরিয়ে সব কথা বলবে, তার পর কি করা যায় ভাবা যাবে।

অতি পরিচিত অন্তরঙ্গের মতই এই পরম প্রতিদ্বন্দ্বী ছেলেটির হাতখানি ধরিয়া রহিম অকৃত্রিম স্নেহের প্রেরণায় যে টান দিল, বিশু তাহারই আবর্ত্তে আত্মসমর্পণ না করিয়া পারিল না।

১৩

বাহিরে দালানের প্রত্যন্ত অংশে প্রধান ওস্তাগরের নিভৃত কামরাখানির ভিতর বিশুকে অতি সন্তর্পণে আনিয়া পরি ও হাজির সহায়তায় রহিম তাহার হাত মুখ ধুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিল এবং সদ্যোক্রীত ধোয়া-সূতার একখানা ধুতি আনিয়া অনুরোধ করিল,—ও কাপড়খানা ভাই, ছেড়ে ফেলো।

পরের বাড়ীতে এ ভাবে আসিয়া ও তাহাদের ছেলেমেয়েদের নিকট এরূপ অপ্রত্যাশিত পরিচর্য্যা পাইয়া বিশুর কুণ্ঠা ক্রমশঃই বাড়িতেছিল। প্রথমেই তাহার জন্য ঘরের কোলে ছোট রোয়াকটির উপর জলপূর্ণ বালতি ও একটি বদনা আসিয়াছিল। তাহার পরে, আসিল একখানা তাজা কাপড় এবং সেই সঙ্গে তাহা পরিবার জন্য অনুরোধ। বিশু কহিল, জল এনেছ, তাই যথেষ্ট, আমি হাতখানা ধুয়ে ফেলছি এখুনি। কিন্তু কাপড় ছাড়বার তো কোনো দরকার নেই।

আপত্তির সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা গম্ভীর করিয়া পরি যুক্তি দিল,—দরকার আছে বই কি, নইলে কি মিছে এনেছি? হাতের রক্ত জলে ধুলে যেন সাফ হয়ে গেল, কিন্তু কাপড়ের রক্ত কি এত সহজে উঠবে ভেবেছ? হাত মুখ ধুয়েই কাপড়খানা ছেড়ে ফেল, আমরা ওখানা লুকিয়ে ফেলি, তাহলে আর কোন চিহ্নই থাকবে না।

রহিম হাসিমুখে কহিল,—পরি লুকিয়ে লুকিয়ে কেবলই দারোগার দপ্তর পড়ে, তাই ও-সব ব্যাপারে ওর মাথা এত সাফ। যাক্, তুমি ভাই আর দেরী ক'র না, ওঠ—

বিশুকে অগত্যা উঠিতে হইল। রহিমের নির্দ্দেশ মত দ্বারের প্রান্তদেশে বাঁধানো, স্থানটিতে হাত মুখ ধুইতে গেল। রহিম বদনা ভরিয়া জল বিশুর হাতে ঢালিয়া দিতে লাগিল। ইতিমধ্যেই পরি একখানি নূতন

তোয়ালে সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছিল। রহিমের সহায়তায় হাতের রক্তের দাগটকু সমস্ত উঠিয়া গেলে, পরি তোয়ালেখানি বিশুর হাঁতে দিল। হাত মুখ মুছিয়া অতঃপর তাহাকে বস্ত্র-পরিবর্ত্তনের কাযটুকুও শেষ করিতে হইল। কাপড় ছাড়া হইবামাত্রই বাড়ীর ভিতর হইতে ইহাদের বালক ভৃত্যটি সহসা উপস্থিত হইয়া সেখানা তুলিয়া দলা পাকাইয়া অন্দরের পথে পুকুরের দিকে ছুটিল।

পরি বিশুর দিকে চাহিয়া আশ্বাসের সুরে কহিল,—ভাবনা এবার কেটে গেলো, পুকুরের পাঁকে কাপড়খানা পুতে ফেলতে বলেছি।

ঘরের প্রান্তভাগে একখানা তক্তপোষ, তাহার উপর সতরঞ্চি বিছানো। বিশু সে দিকে অগ্রসর হইয়াই দেখিল, তাহারই পাশে একখানা টুল ধুইয়া মুছিয়া কলাপাতা বিছাইয়া রাখা হইয়াছে কতকগুলি সুপক্ক জামরুল, কালো জাম, লিচু ও কয়েকটি আম; আর একখানি টুলের উপর রহিয়াছে দুইটি ডাব, পাশে একখানি কাটারী।

বিশু সবিস্ময়ে কহিল,—এ সব আবার কি?

পরি কহিল,—সবের মধ্যে তো গোটা কতক ফল-ফুলুরি, আমাদের ঘরের খাবার তো তুমি খাবে না; কিন্তু যখন এসেছ এখানে, কিছু মুখে দিতেই হবে।

বিপন্নের মত মুখভঙ্গী করিয়া বিশু কহিল,—কিন্তু আমার তো এখন খাবার ইচ্ছে মোটেই নেই, আজ এ সব থাক্, আর একদিন এসে খেয়ে যাবো।

রহিম কহিল,—সে কি হয়, আজ যখন এসে পড়েছ, এগুলো খেতেই হবে, নইলে আমরা মনে করবো, তুমি এখনো আমাদের বিশ্বাস করতে পারো নি।

পরি কহিল,—আর তুমিও ত মনে মনে বুঝতে পারছো, আমরা

তোমার ঐ কাটাকুটির কাণ্ডটি শোনবার জন্যে কি রকম উসখুস্ করছি; কিন্তু তুমি কিছু খেয়ে ঠাণ্ডা না হলে, কি করে স্থির হয়ে সে সব শুনবো বল? না, আর দেরী ক'র না ব'স—

রহিম কহিল,—তুমি ত দেখলে ঐ যে ছেলেটা তোমার কাপড় নিয়ে গেলো, ও হিন্দু; আমাদের কাছে কায করে, চাসবাস দেখে; ফলটলগুলো ওকে দিয়েই ধুয়ে ছাড়িয়ে রাখা হয়েছে, খেলে তোমার কোনও দোষ হবে না।

বিশু কহিল,—তোমার সঙ্গে আজ যখন ভাব হয়ে গেল, তোমার দেওয়া ফল খাব তাতে আবার দোষ কি? তুমি নিজের হাতে দিলেই বা কি হয়েছে? কিন্তু আমার মনের অবস্থা তো বুঝছ?

রহিম কহিল,—কতকটা অবশ্য বুঝছি, কিন্তু সব না শুনলে ঠিক বুঝতে পারবো কেন? এখন তুমি তাড়াতাড়ি এগুলো খেয়ে ফেলো, তারপর সব শুনবো।

পরি সঙ্গে সঙ্গে কহিল,—কিন্তু তুমি এ সব না খেলে তোমার কথাও শুনবো না, আর তোমার সঙ্গে কথাও বলবো না, তা মনে রেখো।

আর কোনও প্রতিবাদ বা আপত্তি না তুলিয়া বিশু তক্তপোষটীর কিনারায় বসিয়া ফলগুলির সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল।

বালক ভৃত্যটিও যথাসময় আসিয়া ডাব কাটিয়া দিল, হাত ধুইবার জল আনিল; গুটিকতক ছোট ও বড় এলাচিও মুখ-শুদ্ধির জন্য উপস্থিত করিল।

অতঃপর বিশু খেলার মাঠের অপ্রীতিকর ব্যাপারটি আগাগোড়া বিশু ও পরিকে শুনাইয়া দিল। বর্ণনার শেষের দিকে তাহার মুখে উত্তেজনার চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল; আরক্তমুখে কম্পিত কণ্ঠে সে কহিল, —উনি আমার যখন কাকা, বাপের মত, আমিও ওঁর ছেলের সামিল!

ওঁর উচিত ছিল, জিজ্ঞাসা করা—কি হয়েছে, দোষটা কার? কিন্তু তিনি সে দিক দিয়ে না গিয়ে দরোয়ান লিলিয়ে দিলেন—সে ছুটে এসে আমার হাত ধরলো, গালে চড় মারলো—আমিও ত মানুষ, রক্ত-মাংসের শরীর আমার, সইব কেন, হাতে হাতে শোধ দিলুম—

রহিম উৎসাহের সুরে কহিল,—আমি তোমাকে প্রথম দিনেই চিনেছিলুম। আমার বাবা বলেন,—প্রত্যেক মানুষের উচিত, নিজের ইজ্জত বাঁচিয়ে চলা, ইজ্জতে ঘা পড়লে যে রুখে দাঁড়ায়, সেই তো মানুষ। কিন্তু হাজারের ভেতর এমন মানুষ দু একটির বেশী নজরে পড়ে না। তুমি ভাই, এই মানুষ। তুমি ইজ্জতের জন্যে যা করেছ, ঠিক করেছ।

রহিমের এই সমর্থনসূচক কথায় বিশুর দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কণ্ঠের স্বরেও আবেগের আভাস পাওয়া গেল। সে বলিতে লাগিল,—আমার হাতখানা জোর করে আগে চেপে ধরেছিল বলেই আমি তার খাপ থেকে কুকরীখানা টেনে নিয়েছিলুম, কিন্তু সে যদি আমার গায়ে হাত না তুলতো, আমি তার হাতে কখনই তারই হাতের কুকুরী চালিয়ে দিতুম না। তারপর, সে যেই বসে পড়লো, আমার কাকাবাবু তখনই আমাকে ধরবার জন্যে হাঁক-ডাক জুড়ে দিলেন। কিন্তু এখনো আমি ভেবে ঠিক করতে পারছি না, সঙ্গে সঙ্গে এক পাল পুলিসের লোক কি করে তখনই এসে পড়লো?

রহিম প্রশ্ন করিল,—তুমি বুঝি পুলিস দেখেই ছুট দিলে?

বিশু কহিল,—আমি তখন কুকরীখানা বাগিয়ে ধরে মরিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, কাকা যতই বলেন ওকে ধরো, কেউ কাছে এগোয় না; ঠিক সেই সময় পাড়ার ছেলেরা হল্লা করে উঠলো—পুলিস আসছে, পুলিস! প্রথমে আমি ভেবেছিলুম আমাকে ভয় দেখাচ্ছে; কিন্তু রাস্তার দিকে চাইতেই দেখলুম, লাল পাগড়ী মাথায় পরা লম্বা লাঠি

কাঁধে এক পাল পাহারাওয়ালা, তাদের সঙ্গে সাহেবের মতও যেন দু'এক জন রয়েছে। কাকাও তখুনি ইংরাজী বুলি ধ'রে তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে এগুলেন, আমিও কুকরি হাতে করে দে ছুট !

রহিম কহিল,—কুকরিখানা কি করলে ?

বিশু কহিল,—তোমাদের পাড়ায় ঢুকেই সেই বোদা পুকুরটার ভেতর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

পরি উৎফুল্ল হইয়া কহিল,—বেশ করেছ, আপদ তো তা হলে চুকেই গেছে।

বিশু কহিল,—সবাই পুলিস দেখতে ছুটলো, কিন্তু আসামী যে ভাগলো, সেটা ভাবে নি ! তবে কাকার যে রকম রাগ আর রোক, তিনি আমাকে না ধরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন না। পুলিস নিয়ে এখনো যে এদিকে ধাওয়া করেন নি কেন, তাই ভাবছি।

পরি প্রশ্ন তুলিল,—পথে কেউ তোমাকে দেখেছে ?

বিশু উত্তর দিল,—ঈশ্বর ঐখানেই আমাকে রক্ষা করেছেন, কারুর সঙ্গে দেখা হয় নি পথে।

রহিম কহিল,—আজ যে হাটবার, সবাই হাটে গেছে, সন্ধ্যার আগে কেউ ফিরবে না। আর, ওরা তোমার সন্ধানে যদি আসে, হাটের দিকেই যাবে ; এ পথে আসবে কেন ?

বিশু কহিল,—মোড়ের কাছে এসেই আমি ভাবলুম কোন্ পথ ধরি ? ঐখান থেকেই হাটের হট্টগোল শুনে মনটা দমে গেল, হাটের রাস্তা ছেড়ে এই রাস্তাই ধরলুম।

পরি পরিহাসের সুরে কহিল,—ঠিক রাস্তাই ধরেছিলে, আমরাও তিনজনে ঠিক সময়টিতে জামরুল পাড়া সুরু করেছিলুম। এখন তাহলে তোমাকে বলি, আমার হাসি শুনেই তুমি থমকে দাঁড়িয়েছিলে, মনে মনে

হয়ত ভেবেছিলে—যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যে হয়! কিন্তু খোদার দোহাই, তোমাকে সেইভাবে দেখে আমি হাসিনি, হেসেছিলুম দাদার কথায়।

বিশু কহিল,—সত্যিই, প্রথমটা আমি খুব দমেই গিয়েছিলুম, কিন্তু এখন ভাবছি, তোমরা আর জন্মে নিশ্চয়ই আমার আপনার জন ছিলে।

ছোট ঘরখানির দ্বার রুদ্ধ ও অর্গল বদ্ধ করিয়াই তিনটি বালক-বালিকা এই সব আলোচনা করিতেছিল। ভিতরের দিকের দ্বারটি খোলাই ছিল এবং এই পথে বালক ভৃত্য মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেছিল। হাজি বিশুর মুখে আখ্যানটি শুনিয়া ইতিমধ্যেই বাড়ীতে ছুটিয়াছিল, এমন মুখরোচক কথাগুলি অধিকক্ষণ চাপিয়া রাখা তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

সহসা বাহিরের দিকে দ্বারে আঘাত পড়িল। তিনটি প্রাণীই এক সঙ্গে চমকিত হইয়া উঠিল। পরি বয়সে সকলের ছোট হইলেও তাহার উপস্থিত বুদ্ধি অসীম। দ্বার না খুলিয়া সে তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্র গতিতে জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর আস্তে আস্তে তাহার ফিরকিটি খুলিয়া কপাটের ছোট পাটিখানি কিঞ্চিৎ ফাঁক করিয়া বাহিরের অবস্থাটা দেখিয়া লইল। পরক্ষণে ম্লান মুখখানা উজ্জ্বল করিয়া কহিল,—ভয় নেই, কাকু।

বিশু চক্ষুতে প্রশ্ন ভরিয়া রহিমের দিকে চাহিতেই রহিম হাসিয়া কহিল,—হাজির বাবা আমার বাবার বন্ধু, এখানে উনি আমাদের অভিভাবক। সম্পর্কে উনি হন আমাদের চাচা—

পরি কণ্ঠে দ্বার খুলিতে খুলিতে কহিল,—কিন্তু আমরা ওঁকে 'কাকু' বলে ডাকি। তোমরা যেমন কাকাবাবু বল!

ওয়ারিস আলী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেই সে হাসিয়া কহিল,—দেখুন কাকু, আমাদের বাড়ীতে কে এসেছে !

ওয়ারিস আলি প্রসন্ন ভাবে কহিলেন,—হাজির মুখে সব শুনেছি মা, যেমন তোমার বাপ, তেমনি তুমি তার বেটি। তাঁর মুখ রেখেছ, এ গেরামের ইজ্জতও বজায় করেছ।

বিশুর খাওয়া তখন শেষ হইয়াছিল, হাত মুখ মুছিয়া একটা এলাচি মুখে দিয়া সে মনে মনে একটা অনাস্বাদিত তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল। দীর্ঘদেহ শ্মশ্রুমান প্রসন্নমূর্ত্তি এই প্রবীন ওস্তাগর সাহেবকে সে অনেকবার দেখিয়াছে, কথাও কহিয়াছে। কিন্তু এভাবে তাঁহার সংস্পর্শে কোন দিন আসে নাই। আজ সে তাঁহাকে কক্ষমধ্যে দেখিয়াই সসম্ভ্রমে উঠিয়া সেলাম করিল।

অয়ারিস আলিও সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলিয়া কহিলেন—খোদা তোমার মুস্কিল আসান করুন, এই ভিক্ষা তাঁর কাছে চাইছি, বাবাজী ! ব্যাপারটা ভারি বেয়াড়া হয়ে পড়েছে ! এ সব হচ্ছে নশীবের ফের, কখন যে কি হয়—ঠাহর পাওয়া যায় না।

রহিম কহিল,—আপনি সব শুনেছেন তাহলে, কাকু ?

ওয়ারিস আলি জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—তোমাদের আগেই হাটে সব শুনে এসেছি। চন্দর বাবু হালফিল এখানে এসেই কাযটা ভাল করেন নি, একথা সবাই বলাবলি করছে। তিনি এই বলে এত্তেলা দিয়েছেন, বাবাজী কুসঙ্গে পড়ে বিগড়ে গেছেন, বয়েস কাঁচা হলে কি হবে, গুণ্ডোমীতে একবারে পাকা, নইলে তাঁর গুর্খা সেপায়ের হাত থেকে হাতিয়ার ছিনিয়ে নিয়ে তাকে চোট লাগায় ! হাটময় এই কথা ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিসের লোক হাট তোলপাড় করে এনার তল্লাস করতে থাকে, কিন্তু পাবে কি করে ? খোদা বাবাজীকে

দিব্যি সরিয়ে এনেছেন এখানে। বাড়ীতে ফিরে হাজির মুখে ব্যাওরা সব শুনে মোর তো আক্কেল গুড়ুম হবার যো! তাই না হন্তদন্ত হয়ে এসেছি।

পরি ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল,—তা হলে কি হবে, কাকু?

ওয়ারিস আলি কহিলেন—খোদার যা মর্জ্জী তাই হবে, বেটি। কিন্তু ওর কি খেলাটা দেখ! আনন্দপুরের গঞ্জে নবীন পোদ্দারের গদীতে তল্লাসী পরোয়ানা নিয়ে কলকেতার পুলিস এসেছিল, এখানকার পুলিসও সঙ্গে ছিল। সেখানে নাকি বহুৎ টাকার জেবর-জহরৎ চুরি হয় আর চোরাই মাল নবীন পোদ্দার কিনেছে এই কথাই নাকি গোয়েন্দারা লাগিয়েছিল। তাই এখানকার আর কোলকেতার পুলিস মিলে গঞ্জে যায়, পুলিস সাহেবও সাথে ছিল। ওখানকার কায সেরে তারাই যখন ফিরছিল, সেই সময়েই এই হাঙ্গামা বাধে। চন্দর বাবুর তখন পোয়া বারো আর কি! তাঁরই বংশের ভাতিজাকে জব্দ করতে দিলেন তখনি পুলিশ লেলি...। চোদ্দো-বছরের একটা ছাবাল জঙ্গী গুর্খার হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে কোপ লাগিয়েছে, এ কথা শুনে আর সামনেই তার নজীর দেখে পুলিস সাহেব অমনি নেচে উঠলো! তুমি কিন্তু বাহাদুর ছেলে, তাই সরে পড়েছিলে।

রহিম প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা কাকু, হাটে বিশুকে না পেয়ে পুলিস কি করলে? চলে গেছে নিশ্চয়ই?

জিহ্বার সাহায্যে মুখের একটা বিচিত্র শব্দের ঝঙ্কার তুলিয়া ওয়ারিস আলি কহিলেন,—সেই পাত্রই ওরা বটে! একে বাঙ্গালীর ছেলে, তাতে আবার ইস্কুলে পড়ে, সে হাতিয়ার চালিয়েছে—রীতিমত জখমও করেছে, সাহেব নিজের চোখে চোট-খাওয়া চাকরটাকে দেখেছে; কাযেই তার মাথায়ও রোখ্ চেপে বসেছে, ছেলেটাকে গেরেফতার করতেই হবে। চন্দর

বাবু মস্ত লোক, সাহেবকে খাতির করে থাকবার জন্যে নেমন্তন্ন করেছেন; ইস্কুলের বাড়ীতে সাহেব লোকজন নিয়ে উঠেছেন। যারা তল্লাসে বেরিয়েছিল, দারোগার সঙ্গে তারাও খুব সম্ভব সেখানে আড্ডা নিয়েছে।

এ কথায় সকলেরই মুখ ম্লান হইয়া গেল। কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কোনও কথা নাই। এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিশুই প্রথমে কহিল,—দেখুন ওস্তাগর সাহেব, এ অবস্থায় আমার কিছুতেই এখানে থাকা উচিত নয়।

কথাটা প্রত্যেকের মনে আঘাত দিল। ওয়ারিস ওস্তাগর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিশুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—কেন?

বিশু কহিল,—জানেন ত, বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, ওরা আমাকে ধরবেই! সন্ধান আমার পাবেই। তাতে আপনারা পর্য্যন্ত হয় তো বিপদে পড়বেন। তার চেয়ে আমি ইস্কুলে গিয়ে সাহেবকে ধরা দিই।

ওস্তাগর সাহেবের মুখের উপর কে যেন একটা তীব্র আলোকরশ্মি নিক্ষেপ করিল,—সমগ্র মুখখানায় অপূর্ব্ব দৃঢ়তার আভা ফুটাইয়া তিনি দৃঢ়স্বরে কহিলেন,—তা হয় না, বাবাজী। ওয়ারিস ওস্তাগরকে তোমার বাবা চিনেছিল, তুমি ছেলেমানুষ, চিনতে পারনি, তাই একথা বলছ। বিপদ যে এসেছে একথা মিছে নয়, কিন্তু এ বিপদ এখন আর শুধু তোমার নয়, মোদের সবারই। তুমি যেতে পাবে না, থাক এইখানে; দেখি কে তোমাকে ধরে।

কাকুর কথায় রহিম ও পরির দুইখানি মুখই যুগপৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহারা বুঝিল, এই তো ঠিক মানুষের মত কথা, তাহাদের বাবা এখানে থাকিলে, তিনিও ঠিক এই কথাই বলিতেন।

বিশুর মুখেও দৃঢ়তা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, সে অবিচলিত কণ্ঠে কহিল,—আমার জন্যে আপনারাও কষ্ট পান, এ আমি চাই না। আপ-

নারা যা করেছেন, তার ঋণ আমি কোনো দিন শুধতে পারবো না, এখন আমাকে দয়া করে যেতে দিন।

ওয়ারিস সাহেব ক্ষণকাল বিশুর মুখের দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া গম্ভীর-ভাবে কহিলেন,—যদি বলি, আমিই তোমাদের কাছে ঋণী হয়ে আছি, তাই আজ শোধ দিতে কোমর বেঁধেছি?

সকলেই সবিস্ময়ে ওস্তাগর সাহেবের প্রশান্ত মুখখানির দিকে চাহিল।

ওস্তাগর সাহেব কহিলেন,—হ্যাঁ, সত্যই; তোমার বাবার সঙ্গে আমার খুবই ভাব ছিল। শুধুই মুখের ভাব নয়, জমিজেরাৎ সম্বন্ধে তিনি অনেক সুবিধে আমাকে দিয়ে সে ভাব পাকা করে গিয়েছেন। অনেক দায়-দফায় তিনি আমাকে দেখেছেন, মোদের দলিজ তো তুমি দেখেছ, সেখানে কতদিন এসে বসেছেন; এত ভালবাসাবাসি মোদের মধ্যে ছিল। তেনার ছেলে তুমি, আজ মুস্কিলে পড়েছ, খোদাই তোমাকে টেনে এনেছেন এখানে, আমি তোমাকে ছাড়তে পারি না, ছেড়ে দেব না কিছুতেই; তুমি এখানে থাকো, আমি নিজেই যাচ্ছি তোমাদের পাড়ায়, চন্দরবাবুর সঙ্গে আগেই বোঝা পড়া করতে চাই; যদি বুঝি, খোদ পুলিস সাহেবের সঙ্গেও মুলাকাৎ করতে পেছপাও হব না; তুমি কিচ্ছু ভেবনা, জেনো—সবই খোদার মর্জ্জী!

১৪

স্কুলের পথে ও খেলার মাঠে পাড়ার ছেলেদের সহিত বিশুর কত ঝগড়াঝাটি হইয়াছে, সময় বিশেষে মারামারিও কতবার বাধিয়াছে, রক্তপাতও যে তাহাতে না হইয়াছে এমন নহে; কিন্তু সে সব ব্যাপারে পাড়ার মধ্যে কখনও গোলযোগ বাধে নাই এবং অভিভাবক বা অভি-ভাবিকাগণকে ছেলেদের পক্ষ লইয়া ঐ সূত্রে কোমর বাঁধিতেও দেখা যায়

নাই; তাহার জের বড় জোর প্রধান শিক্ষকের এজলাস পর্য্যন্ত গড়াইয়া একটা নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছে।

এদিনও কলহসূত্রে যে কাণ্ড বাধিয়াছিল, তাহারও একটা নিষ্পত্তি যথাযথভাবেই হয়ত হইয়া যাইত। কিন্তু হঠাৎ অন্যের আবির্ভাব ও প্রভাবে এবার তাহা হইল না, বরং ঘটনার স্রোত একটা অপ্রত্যাশিত কদর্য্য পথে ঘুরিয়া গেল। এ ব্যাপারে চন্দ্রনাথ বাবুর রাগের বেগ যতখানি ছিল, রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকের দৃশ্য বিশেষের মত অকুস্থলে অকস্মাৎ পুলিসের আবির্ভাব তাহার গুরুত্ব আরও বাড়াইয়া দিল।

পুলিস একটা তদন্ত করিয়া এই পথ অতিক্রম করিতেছিল। হঠাৎ চন্দ্রনাথ বাবুর উত্তেজিত কণ্ঠের 'ধরো—ধরো' ধ্বনি পুলিসের কর্ত্তাটির কাণে বিপদজ্ঞাপক হুইসিলের মতই বাজিয়াছিল। ইহাতে পুলিসের লোকের গায়ের রক্ত উত্তপ্ত ও কর্ণ কণ্টকিত হইবারই কথা। যথাস্থানে যতদূর সম্ভব দ্রুত আসিয়া পঁহুছাইতেই দেখা দেল, হাত কাটা গুর্খা দারোয়ানটা মাটীতে পড়িয়া কাতরাইতেছে; অখিলের মুখ দিয়া রক্ত গড়াইতেছে, তাহার জামা কাপড় তাহাতে ভিজিয়া গিয়াছে এবং সকলের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। কেবল আঘাতকারী আসামীর কোনও নিদর্শন নাই। সাহেবের প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্রনাথ বাবু ভবিষ্যতের অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক সমস্যার সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া যে ভাবে ঘটনাটি প্রকাশ করিলেন, তাহাতে পুলিস সাহেবও বুঝিলেন যে, অভিযোক্তা কেউকেটা নহেন। আর যাহারা স্বচক্ষে ঘটনাটা দেখিয়াছিল, তাহারাও অবাক হইয়া মনে মনে ভাবিল, তিলকে যে ভাবে তাল করিয়া ফেলা হইল, তাহাতে বিশুর আর নিস্তার নাই।

বহু স্মরিক পরিবেষ্টিত এই পুরাতন পৈতৃক ভদ্রাসনে পদার্পণ করিয়াই চন্দ্রনাথ বাবু মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাঁহার ব্যক্তিত্বের

প্রভাব নানাসূত্রে প্রকাশ করিয়া সরিকদিগকে অভিভূত ও স্তব্ধ করিয়া দিবেন। তাহা হইলে প্রকারান্তরে সকলেই তাঁহাকে ভয় করিবে, তাঁহার একান্ত বাধ্য হইয়া পড়িবে, মাথা তুলিতে বা দল পাকাইতে কেহই আর সাহস পাইবে না। এই চিন্তাই যে সময় তাঁহার মস্তিষ্কে নানারূপ সূত্রের সংস্থান করিতেছিল, তখনই প্রাণাধিক পুত্রের দুর্দ্দশা তাঁহাকে অতিরিক্ত ভাবেই উত্তেজিত করিয়া তুলিল। অমনই হারাইয়া ফেলিলেন—তাঁহার বয়স ও বৃত্তির উপযুক্ত ধৈর্য্য, ভুলিয়া গেলেন—সহজধারায় এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করিবার উপায়; ছেলেটিকে পাকড়াও করিবার জন্য দরোয়ানের উপর কড়া হুকুম দিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ছেলেটি দরোয়ানজীর হাতে ধরা না দিয়া তাহাকেই যখন কাবু করিয়া ফেলিল, সে সময় চন্দ্রনাথ বাবুর মস্তিষ্কে চক্রান্তের যে সূত্রগুলি তালগোল পাকাইয়াছিল, সেগুলিও বুঝি তৎক্ষণাৎ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল; নতুবা তিনি অতটা চঞ্চল হইয়া উঠিবেন কেন?

কিন্তু ঠিক এই সময় কাকতালীয়বৎ পুলিসের আবির্ভাব হওয়ায়, চন্দ্রনাথ বাবুর ব্যক্তিত্বের প্রণষ্ট প্রায় প্রভাবটুকু সহসা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। এক্ষেত্রে এই সুবিধাবাদী মানুষটি আত্মমর্য্যাদা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার এমন সুযোগটি ত্যাগ করিবেন কেন! তাঁহার মস্তিষ্কের ছিন্ন সূত্রগুলিও সঙ্গে সঙ্গে নাগপাশের মত যেমন এক দুশ্ছেদ্য বন্ধনের উপাদান হইয়া দাঁড়াইল, এত বড় আইনবিদ জমিদারটির প্রতি পুলিসের এই ফিরিঙ্গী সাহেবটির শ্রদ্ধাও তেমনই সমবেত সকলের সমক্ষেই প্রকাশ করিয়া দিল—তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব কতখানি!

বিশুর হাতের কুকরী গুর্খা প্রহরীর কব্জির কতিপয় শিরা কাটিয়া হাড় পর্য্যন্ত গিয়া পঁহুছাইয়াছিল। সময়োচিত উপদেশ সহ পুলিস সাহেব দুইজন পাহারাওয়ালার তত্ত্বাবধানে তাহাকে আলিপুরের সরকারী হাস-

পাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চন্দ্রনাথ বাবুও এ প্রস্তাবে সায় দিলেন। অতঃপর মহাসমারোহে আসামীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইল। চারিদিকে পুলিস ছুটিল, কিন্তু আসামীর সন্ধান মিলিল না। চন্দ্রনাথ বাবু আসামীর যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাহাকে ত্যাগ করিয়া সদরে ফিরিয়া যাওয়া সাহেব সমীচীন মনে করিলেন না। চন্দ্রনাথ বাবুরও সেই ইচ্ছা। তৎক্ষণাৎ আতিথ্যগ্রহণের জন্য সাহেবকে চন্দ্রনাথ বাবু সাদর আমন্ত্রণ করিলেন এবং ধন্যবাদ সহকারে সাহেবও তাহাতে সম্মতি দিলেন।

বিশুর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে শোভা ও অখিল উভয়েই সরিয়া পড়িয়াছিল। যে মেয়েটি এই কাণ্ডের সহিত সংস্পৃষ্ট, চন্দ্রনাথ বাবু পুলিস সাহেবের নিকট ঘটনাটা ব্যক্ত করিবার সময় ইহাদের প্রসঙ্গও তুলেন নাই। সেই জন্যই অখিল বা শোভার আর ডাক পড়ে নাই। কিন্তু বাহিরে ডাক না পড়িলেও বাহিরের ব্যাপারটি সম্বন্ধে বাড়ীর ভিতরের উঠানে মেয়েরা যখন শোভাকে ঘিরিয়া নানা প্রশ্ন করিতেছিল, তখন শোভার এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল সে ডাক ছাড়িয়া কাঁদে। সে যে কি উত্তর দিবে, কাহাকে দোষী করিবে, কাহার পক্ষ লইয়া কথা কহিবে, কিছুতেই তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না। ঘটনাস্থলের শোণিতময় দৃশ্যটা নিরবচ্ছিন্নভাবেই যেন তাহার চোখের উপর জ্বল জ্বল করিয়া ভাসিতেছিল।

এক বর্ষিয়সী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন,—আ মর ছুঁড়ি, ফুলকোমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি যে শুধু; কি হয়েছে বলনা?

শোভা আর্ত্ত কণ্ঠে উত্তর দিল,—আমি জানি না।

কথা কয়টি বলিয়াই সে এক রকম ছুটিয়া উঠান হইতে তাহাদের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

পরক্ষণেই বিশুর মা হেমাঙ্গিনী দেবী উপর হইতে উঠি-পড়ি অবস্থায় নামিয়া আসিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হ্যাঁগা, কি হয়েছে, কি সব শুনছি, বিশু কি করেছে ?

উত্তর দিল, তৎক্ষণাৎ কুসুম ; বাহিরের শেষ খবরটুকু পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া সে তখন ফিরিতেছিল। দিব্য সপ্রতিভভাবেই সে কহিল,—যা হয়েছে, আমার কাছেই শোনো না ; এই জন্যই তো হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছি, মাসীমা ?

এই বাচাল মেয়েটির প্রকৃতি এ বাড়ীর সকল বয়সের মেয়েদের মনে যেমন বিরক্তির সঞ্চার করিত, তাহার মুখের কথাগুলিও তেমনই প্রত্যে-কের কাণে যেন সূচের মত বিঁধিত। কিন্তু আজ এ অবস্থায় তাহার মুখেই বাহিরের খবর শুনিতে মহিলাদের কি আগ্রহ! হেমাঙ্গিনী দেবী ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন,—শীগ্‌গীর বলত মা কি হয়েছে ?

কুসুম মুখখানি গম্ভীর করিয়া কহিল,—তোমার ছেলে মানুষ খুন করে ফেরার হয়েছে গো !

বিস্ময়াতঙ্কে অন্নপূর্ণা দেবী কহিয়া উঠিলেন,—কি বললি ? বিশু মানুষ খুন করেছে ?

কুসুম কহিল,—ঠিক খুন না হলেও নিমখুন তো বটেই, অখিলের বাবা বললে, সাত বছরের মত শ্রীঘর বাস !

দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া আর্ত্তকণ্ঠে অন্নপূর্ণা দেবী কহিলেন,—কোথায় বিশু, আমি বাইরে গিয়ে দেখি—কি হয়েছে, কি সে করেছে।

বাধা দিবার ভঙ্গীতে কুসুম কহিল,—ছেলে কি তোমার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে যে চলেছ মাসিমা ! সে ত পালিয়েছে, তোমাকে দেখলেই জানতে চাইবে ছেলে কোথায় ? পুলিস সেখানে গিস গিস করছে ; কি হয়েছে তবে বলি শোনো—

কুসুমের মুখে ঘটনার কথা শুনিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিলেন। হেমাঙ্গিনী দেবী মুখখানা কঠিন করিয়া কহিলেন,—এই কাণ্ড! এর জন্যে বিশু খুনী সাব্যস্ত হয়েছে! কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, কাকা হয়ে জ্ঞাতি হয়ে বিদ্বান হয়ে চন্দর ঠাকুরপো কি করে এ কায করলেন—ছেলেটার হাতে দড়ি দেবার জন্যে পুলিস লিলিয়ে দিলেন!

একজন কহিলেন,—দেবে না? জ্ঞাতি শত্তুর যে! বাগে পেয়েছে, ছোবলাবে না?

আর একজন মন্তব্য করিলেন,—জাত সাপ আর জ্ঞাত শত্তুর, এদের বিশ্বাস নেই, এরা সব পারে।

কেহ কেহ যুক্তি দিলেন,—যা হবার হয়েছে বিশুর মা, এখন অখিলের বাবাকে গিয়ে ধরো—যাতে ক্ষমা-ঘেন্না করে মিটিয়ে নেয়। কিছু খরচ করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে; এমন কত কাণ্ডই ত হসফ হয়েছে দেখিছি।

হেমাঙ্গিনী দেবী কহিলেন,—ঘুস কখনো কাউকে দিই নি, কারুর কাছ থেকে ঘুস বলে কিছু নিইনি ত কোন দিন। বিশুর মুখে না শুনে আমি কিছু করবো না, কাউকে ধরবো না; আগে সে আসুক।

কুসুম কহিল,—শোন কথা, সে ত পালিয়েছে; পুলিস তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, দেখলেই বেঁধে চালান দেবে।

হেমাঙ্গিনী দেবী কহিলেন,—এতো আর মগের মুল্লুক নয় যে পুলিস যা ইচ্ছে তাই করবে। বিশুও জমিদার, তার মান আছে, ইজ্জত আছে, পয়সা আছে। তাকে বেঁধে চালান দেওয়া মুখের কথা নয়।

কুসুম কহিল,—তবে যে অখিলের বাবা বললে, বিশুদার আর রেহাই নেই।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হেমাঙ্গিনী দেবী কহিলেন,—রেখে দে তোর অখিলের বাবা, সে ত আর হাকিম নয়, আর পুলিস সাহেবও বিচারকর্ত্তা নয়; বিচার হবে

আদালতে, তখন দেখা যাবে। চন্দর ঠাকুরপো বোধ হয় ভুলে গেছেন—বিশুকে যে পেটে ধরেছে, সে এখনো বেঁচে আছে।

ছেলের এত বড় বিপদে মায়ের মুখে এমন তেজের কথা শুনিয়া সমবেত পুরমহিলারা একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। হেমাঙ্গিনী দেবী চলিয়া গেলে কেহ কেহ কহিলেন,—একেই বলে, আসন্ন কালে বিপরীত বুদ্ধি!

১৫

চন্দ্রনাথ বাবু টাকা উপায় করতে যেমন পটু ছিলেন, জাঁকজমকের ভিতর দিয়া নিজের দপদপা দশজনকে দেখাইতে তেমনই প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। সাধারণের সামিল যে তিনি নহেন, তাঁহার স্থান অনেক উঁচুতে, এই সত্যটি তিনি আদপ-কায়দায় প্রকাশ করিতে চাহিতেন।

বড়বাড়ীর বাহির মহল্লার যে দুইখানি ঘর চন্দ্রনাথ বাবুর অংশে পড়িয়াছিল, ধরনীধর সেখানে তহশীলের সেরেস্তা পাতিয়া বসিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু আসিয়াই তাহার একখানি ঘর কেতাদুরস্তভাবে সাজাইয়া তাঁহার খাস-কামরার ব্যবস্থা করিতে হুকুম দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সংস্কার হইয়া গেল, যোড়া তক্তাপোষের উপর ফরাস পড়িল, পুরাতন সোফাগুলি আস্তরণ পরিয়া নূতন শ্রী ধরিল, টেবল আসিল, কেদারা, আরাম-কেদারা, যথাযথভাবে স্থান পাইল। দেয়ালগিরি, বেলোয়ারি ঝাড়, দ্বারে গবাক্ষে পরদা—কোনও কিছুরই ত্রুটি রহিল না।

কিন্তু সেদিন সায়াহ্নে বড়বাড়ীর অনেকেই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, এ সবের কিছুই প্রয়োজন ছিল না, খেলার মাঠে যে দপদপা তিনি দেখাইয়াছেন তাঁহারই বংশের একটা ছেলেকে জব্দ করিতে, তাহাই যথেষ্ট।

সন্ধ্যার দিকে স্কুল বাড়ীতে ধরণীধরের তত্ত্বাবধানে পুলিস সাহেবের

খামাপিনার যে আয়োজন চলিয়াছিল, তাহা পরিদর্শন করিয়া ও আলাপ আলোচনায় পরিতুষ্ট সাহেবের ধন্যবাদটুকু লইয়া চন্দ্রনাথ বাবু যখন বড়বাড়ীর বাহির মহলে তাঁহার খাস-কামরায় ফিরিলেন, তখন রাত্রি হইয়াছে।

মহাবীর হাসপাতালে প্রেরিত হওয়ায় খানসামা বাহাদুর তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া এ পর্য্যন্ত প্রভুর শরীর রক্ষা করিতেছিল। তাঁহাকে আরাম-কেদারায় আশ্রয় লইতে দেখিয়া সে বুদ্ধিমানের মত প্রভুর পরবর্ত্তী পরিচর্য্যার উদ্দেশ্যে কক্ষান্তরে গিয়াছিল। এই অবসরে রক্ষীশূন্য দ্বারের পরদা ঠেলিয়া বিনা এত্তেলায় প্রবেশ করিল কুসুম।

আরাম কেদারায় অঙ্গ ঢালিয়া চন্দ্রনাথ বাবু সবেমাত্র আইনের একখানা কেতাবের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি সংযোগ করিয়াছিলেন; তাহার উপর অন্যের ছায়া পড়িতেই সচকিতভাবে দ্বারদেশে চাহিলেন। দেখিলেন, এক কিশোরী অকুতোভয়ে তাঁহার দিকে আসিতেছে, তাহার মুখে প্রচ্ছন্ন হাসি। দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চন্দ্রনাথ বাবু সোজা হইয়া বসিলেন এবং বালিকাকে কোনও প্রশ্ন না করিয়া সজোরে ডাকিলেন, বাহাদুর!

এ ভাবে ডাকিবার অর্থ কুসুম বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে সপ্রতিভ-কণ্ঠে কহিল,—আপনার বাহাদুর যে কল্‌কে হাতে করে ওদিকে গেল মামাবাবু, বোধ হয় আগুণের সন্ধানে!

তীক্ষ্ণকণ্ঠে চন্দ্রনাথ বাবু প্রশ্ন করিলেন,—তুমি কে?

খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া কুসুম উত্তর দিল,—ওমা, আমাকে চিনতে পারেন নি মামাবাবু! আমি যে কুসুম, তবে সবাই আমাকে কুসি বলে ডাকে। রমানাথ বাবু যে আমার দাদু হন, মা'র বাবা; সে হিসেবে আপনি হন মামাবাবু।

কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—ও! তুমি রমানাথ দা'র নাতনী,—তোমার বাবার নাম ত পতিতপাবন, বড় গায়িয়ে?

কুসুম হাসিয়া কহিল,—হঁ্যা, এখন গলা হারিয়ে দাতুর গলগ্রহ হয়ে আছেন। ওঠবার ত শক্তি নেই, যে এসে আপনার সঙ্গে আলাপ করবেন।

মেয়েটির কথা বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া চন্দ্রনাথ বাবু প্রসন্নই হইলেন। কিন্তু মুখের গাম্ভীর্য্যটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই প্রশ্ন করিলেন,—তারপর আমার কাছে কি দরকার?

কুসুম আবার খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং হাসির দমকটুকু থামিলে কহিল,—দরকার না থাকলে বুঝি আপনার লোকের কাছে আসতে নেই, মামাবাবু! আপনি কত বড় লোক, রাজা বললেই হয়; আর কেউ আপনার কাছে ঘেঁসতে ভরসা না করুক, কিন্তু আমার যে জোর আছে, তাই এসেছি।

চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—বেশ করেছ; আসবে বই কি। তুমি পড়াশোনা করছ ত?

কুসুম এবার মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিল,—এখানে পড়াশোনার কি আছে মামাবাবু, যে পড়বো? যা কিছু শিক্ষা হয়েছে, সে কলকেতায়। এখানে ত পাঠশালাই ভরসা। তা আমার সে সব পাঠ হয়ে গিয়েছে।

চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—বটে! তা ইংরিজী স্কুলে ভর্ত্তী হওনি কেন?

দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কুসুম কহিল,—ওবে বাবা! তবেই হয়েছে। আপনি ত দুদিন এসেছেন মামাবাবু, এখানকার কিছুই এখনো দেখেন নি! এখানকার লোক আবার মেয়েকে ইংরিজি শেখাতে ইস্কুলে পাঠাবে? দু-পাতা বেশী পড়েছি বলে, এই নিয়ে কত কথা।

কুসুমের কথায় মনে মনে কৌতুক অনুভব করিয়া চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—বল কি ?

কুসুম এবার উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল,—এখানকার সবাই এখনো একশো বছর পেছিয়ে আছে মামাবাবু! মাগো! এদেশে আবার মানুষ থাকে।

চন্দ্রনাথ বাবু খুসী হইয়া কুসুমের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিলেন। ইহার কথাগুলি তাঁহার ভালই লাগিতেছিল। কুসুমের সাহসটুকুও বাড়িতেছিল, সুযোগ বুঝিয়া সে কহিল,—এই দেখুন না, আপনাকে নিয়ে কি ঘোঁটই সবাই পাকাচ্ছে ; যেন কত বড় অন্যায়ই আপনি করেছেন।

মুখের প্রসন্নতাটুকু তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন করিয়া চন্দ্রনাথ বাবু রুক্ষকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—কি রকম ?

কুসুম কহিল,—রকম আর কি! যা হয়ে থাকে পাড়াগাঁয়ে, তাই। বিশুদার পেছনে পুলিস লিলিয়ে দিয়েছেন বলে, তার মা কি গালাগালটাই আপনাকে দিলে, কত শাপমণ্যি, মাগো মা, শুনে আমি একবারে কাঠ! মাগী যেন কি!

চন্দ্রবাবুর সুন্দর মুখখানার উপর কে যেন আবির ঢালিয়া দিল। গম্ভীর মুখখানার ভিতর দিয়া একটি শুধু স্বর বাহির হইল,—হুঁ!

কুসুম কহিল,—আমি তাঁর পা দুখানি ধরে বললুম—জ্যাঠাই মা, মামাবাবুকে ধর, যাতে তিনি ক্ষমা ঘেন্না করেন। ওমা, অমনি কি না বাজখাঁই গলায় আমায় বললেন—যা, যা! ঢের অমন উকীল দেখিছি, এলোই বা পুলিস, করবে কি শুনি? বিশুও জমিদার আর আমার পেটে সে জন্মেছে, শেষে মজা টের পাবে চন্দর ঠাকুরপো। তাই ছুটে আপনার কাছে আসছি মামাবাবু!

চন্দ্রনাথ বাবু এই অল্পবয়স্কা বালিকার মুখের কথাগুলি শুনিয়া তাহার

সমক্ষেই ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিলেন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—মায়ের আস্কারাতেই ছেলে গোল্লায় যায়; ছেলে থেকেই বুঝিছি, ওর মা'ও কত বড় পাজী। আজ দিচ্ছে গালাগাল, দিক; এর পর ঐ গনা চৌচির হয়ে যাবে কান্নায়।

কুসুম কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত নরম করিয়া কহিল, আপনি কিন্তু বাড়ীর ভেতর সাবধানে আসা যাওয়া করবেন মামাবাবু।

এ কয়টি কথাও চন্দ্রনাথ বাবুকে সচেতন করিয়া দিল। যে লোক পরের কথায় সহজেই তাতিয়া উঠে এবং নিজের দেহরক্ষার ভার পরের উপর সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, দেহের দিক দিয়া কোনওরূপ অহিত ঘটিবার সম্ভাবনা তাহাকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে। চন্দ্রনাথ বাবু কথাটার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াই কহিলেন,—কেন বল ত! বিশুর মা কি কোনো রকম—

কথাটা শেষ হইল না বটে, কিন্তু তাহার অর্থটুকু বুঝিতে কুসুমের মত মেয়ের বিলম্ব হইল না। সে চন্দ্রনাথবাবুর দিকে আরও দুই পা আগাইয়া আসিয়া নিম্নকণ্ঠে কহিল,—ও মাগী খাণ্ডাত্‌নী, সব পারে মামাবাবু। ছেলের কাণ্ড ত দেখেছেন, মাকেও বিশ্বাস করবেন না। কথায় বলে—সাবধানের মার নেই।

একটা অপ্রত্যাশিত আতঙ্ক ও তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় চন্দ্রনাথ বাবুর মস্তিষ্কে আর একটা নূতন চিন্তার খোরাক যোগাইয়া দিল। এই এই সময় খানসামা বাহাদুর পর্দ্দা ঠেলিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল। বাহাদুরের কটিদেশে চামড়ার খাপে আঁটা কুকুরীখানি চন্দ্রনাথ বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার দুশ্চিন্তার কতকটা আসান করিল।

বাহাদুর তাহার হাতের কলিকাটি সুবৃহৎ গড়গড়ার চুড়ায় রাখিয়া সসম্ভ্রমে জানাইল যে, এক আদমী হুজুরের সহিত মুলাকাৎ করিবার মতলবে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।

আদমীর কথা শুনিয়াই চন্দ্রনাথ বাবু মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন। শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোন্ আদমী?

বাহাদুর বিনীত কণ্ঠে উত্তর দিল,—মেরা মালুম নেহি হুজুর!

কিন্তু যে আদমীকে উদ্দেশ করিয়া প্রভুভৃত্যের এই প্রশ্নোত্তর, তিনি কক্ষের বাহিরে বাহাদুরকে খবর দিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া কক্ষদ্বারে দোদুল্যমান সুদৃশ্য পরদাটির পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। হুজুরের প্রশ্ন ও ভৃত্যের উত্তর শুনিয়া তিনি নিজেই পরদা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিলেন,—সেলাম হুজুর! গরীব বান্দার কসুর মাপ করতে হুকুম হোক। বহুৎ জরুরী কামে মোরে আসতি হয়েছে হুজুরের সাথি মুলাকাত করতি।

স্তব্ধ বিস্মিত চন্দ্রনাথ বাবু বদ্ধদৃষ্টিতে আগন্তুককে দেখিলেন, তাঁহার মুখের অশুদ্ধ কথাগুলিও শুনিলেন। সংশয় ও আতঙ্ক তখনও তাঁহার চিত্তে যুগপৎ দোলা দিতেছিল। বার্দ্ধক্যের নানা নিদর্শন নানা দিক দিয়া এই মানুষটির আকৃতির উপর পড়িলেও অটুট স্বাস্থ্য তাঁহার দীর্ঘ-সরল দেহযষ্টিকে কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। আগন্তুকের নাভি পর্য্যন্ত লম্বিত দাড়ি এবং বাবরীর আকারে মাথার চুলে বৈশিষ্ট্য থাকিলেও, জামা কাপড়ে কোনও বৈচিত্র্য ছিল না,—পরনে ছিল একখানা আড়ময়লা কাপড় এবং গায়ে একটা সাধারণ পিরাণ; মাথায় টুপী বা পায়ে পাদুকার কোনও বালাই নাই।

এই লোকটি যে আততায়ী হইয়া আসে নাই, তাহা বুঝিয়া চন্দ্রনাথ বাবু প্রশ্ন করিলেন,—তুমি কে?

আগন্তুক পুনরায় সেলাম করিয়া কহিলেন,—মোর নাম হুজুরের মালুম থাকবারই কথা; হুজুরের সরকারে বছর সালিয়ানা মোরে আঠারো গণ্ডা টাকা খাজনা দিতি হয়। ওয়ারিস ওস্তাগর মোর নাম।

আগন্তুকের পরিচয় চন্দ্রনাথ বাবুকে যেমন আশ্বস্ত করিল, পক্ষান্তরে সাধারণ এক প্রজার এত সহজে খোদ জমিদারের দর্শন প্রাপ্তি সম্বন্ধে তাঁহার চিত্ত কিঞ্চিৎ বিক্ষুব্ধও হইল। মুখখানি অতিরিক্ত গম্ভীর করিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন,—এমন অসময়ে কি দরকারে তুমি এসেছ?

ওয়ারিস সাহেব কহিলেন,—হুজুরের কাছে এক জরুরী আর্জ্জী নিয়ে আসতে হয়েছে।

চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—আর্জ্জী শোনবার অবসর আমার নেই,—আমার ম্যানেজার ধরণীবাবুর সেরেস্তায় এসে কাল পেশ করতে পারো।

ওয়ারিস সাহেব কণ্ঠের স্বর দৃঢ় করিয়া কহিলেন,—ম্যানেজার বাবুকে দিয়ে সে হবে না, হুজুরকেই শুনতে হবে; বিশু বাবুকে নিয়েই যে মোর আর্জ্জি হুজুর!

বিশুর নাম শুনিয়া চন্দ্রনাথ বাবুর দুই চক্ষু দৃপ্ত হইয়া উঠিল। পলাতক আসামীর সম্বন্ধে যে লোক কথা কহিতে আসিয়াছে, তাহাকে যে উপেক্ষা করা চলে না এবং এই সূত্রে অবস্থা অন্যরূপ হইবার সম্ভাবনা, চন্দ্রনাথ বাবুর মত বিচক্ষণ ব্যবহারজীবির তাহা উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইল না। আগুন্তকের উপস্থিতির এই সুযোগটুকু কাযে লাগাইবার অভিপ্রায়ে তৎক্ষণাৎ তিনি একটা চাল চালিয়া বসিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী টেবল হইতে একটা শ্লিপ লইয়া কয়েক ছত্র কি লিখিলেন। বাহাদুর তাঁহার ঠিক পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল। শ্লিপটি তাহার হাতে দিয়া মৃদুস্বরে যে আদেশ করিলেন, তাহা কাহারও কর্ণগোচর হইল না। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল, বাহাদুর পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ হইতে একখানা টুল আনিয়া ওয়ারিস সাহেবের কাছে রাখিল এবং চন্দ্রনাথ বাবুর দিকে অর্থপূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়াই পরদার অন্তরালে চলিয়া গেল।

চন্দ্রনাথ বাবু ওয়ারিস সাহেবের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—বসো।

ওয়ারিস সাহেব শ্রদ্ধাভাজন ভূস্বামীকে পুনরায় সেলাম দিলেন এবং একান্ত কুণ্ঠিতভাবেই টুলখানির উপর বসিলেন।

চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন—কি তোমার আর্জ্জী, বলতে পারো।

প্রায় পনেরো মিনিট ধরিয়া নানা কথার ভিতর দিয়া এবং একই কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পাঁচবার বলিয়া ওয়ারিস সাহেব চন্দ্রনাথ বাবুকে যে আর্জ্জি শুনাইয়া দিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে,—চন্দ্রবাবু বহুকাল পরে তাঁহার বাসভূমে আসায় প্রজারা যেমন আনন্দিত হইয়াছে, তেমনি ব্যথা পাইয়াছে তাঁহারই বংশের একটা 'ছাবালের' উপর তাঁহার আক্রোশ দেখিয়া। দোষ ঘাট যদি তাহার কিছু হইয়া থাকে, তিনি নিজেই ত তাহার বিচার করিতে পারিতেন, এজন্য পুলিস ডাকিবার কি প্রয়োজন ছিল? পুলিস যদি আনন্দপুরের বড় বাড়ীর কোনো জমিদার সন্তানের হাতে হাতকড়ি দিয়া ধরিয়া লইয়া যায়, তাহাতে কি তাঁহার মুখোজ্জ্বল হইবে? অতএব তাঁহার তালুকের সমস্ত প্রজার আর্জ্জি এই যে, তিনি বিশু বাবুকে নিজের ছেলে মনে করিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলুন।

বাঙ্গালা দেশের জমিদারদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি চন্দ্রনাথ বাবুর অবিদিত ছিল না। যে দেশে তিনি ওকালতি করিয়া মাথার চুল পাকাইয়াছেন, সেখানেও লক্ষ্য করিয়াছেন, জমির মালিকের ক্ষমতা কিরূপ অপ্রতিহত। অথচ, দীর্ঘকাল পরে নিজ বাসভূমে আসিয়া আজ তাঁহাকেই স্তব্ধ বিস্ময়ে আর্জ্জি সূত্রে সাধারণ এক প্রজার নির্দ্দেশ শুনিতে হইতেছে!

ক্রোধ ও বিস্ময় দমন করিয়া চন্দ্রনাথবাবু শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিশু কোথায়?

ওয়াঁরিস সাহেব উত্তর দিলেন,—ধরে নিন্ না কেন সে হুজুরের বাড়ীতেই আছে। হুজুর আর্জ্জীতে সায় দিলেই সে হাজীর হবে।

চন্দ্রনাথবাবু কহিলেন,—এতে আমার ত হাত কিছু নেই। পুলিস সাহেব নিজেই যখন তদারক করছেন, আমি কি করতে পারি?

ওয়ারিস সাহেব কহিলেন,—হুজুর মনে করলে সবই পারেন। বিশু বাবুকে যদি ধরে নিয়ে যায়, হুজুরের মাথা কি তাতে হেঁট হবে না?

চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—না। দোষ করলে শাস্তি তাকে নিতেই হবে; তাতে মাথা হেঁট হবে কেন?

ওয়ারিস সাহেব ক্ষণকাল চন্দ্রনাথ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—তাহার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, হুজুরের এ কথার ওপর মোদের কথা আর কি থাকতি পারে! তবে মোদের কাছে হুজুরও যে চীজ, বিশু বাবুও তাই। মোদের তালুকের জমিদারকে পুলিস সাহেব ধরে নিয়ে যাবে, মোরা কিছুতেই তা বরদাস্ত করতে পারবুনি।

চন্দ্রনাথ বাবু রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিলেন,—কি করবে তা হলে শুনি?

ওয়ারিস সাহেব কহিলেন,—শুনলি ত কোনো কাম হবে না হুজুর, যা করবার মোরা দেখিয়ে দেব কামে।

চন্দ্রনাথবাবু কহিলেন,—বটে!

এই সময় কক্ষদ্বারে প্রসারিত পরদার অপর প্রান্ত হইতে ইংরাজীতে প্রশ্ন হইল,—ভেতরে যেতে পারি আমরা?

কণ্ঠস্বর শুনিয়াই চন্দ্রনাথবাবু উল্লাসের সুরে আগন্তুককে ভিতরে আসিবার জন্ত সাদর আহ্বান জানাইলেন।

পরক্ষণেই কক্ষমধ্যে পুলিস সাহেবের প্রবেশ, সঙ্গে দুইজন পুলিস প্রহরী।

সাহেবকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই ওয়ারিস সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং চন্দ্রনাথবাবুর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন,—মুই তাহলে চলুম হুজুর, সেলাম।

সাহেবকে দেখিয়া চন্দ্রনাথ বাবুও উঠিয়াছিলেন। এখন তর্জ্জনের সুরে চন্দ্রনাথ বাবুও কহিলেন,—দাঁড়াও তুমি।

তাহার পর সাহেবের দিকে চাহিয়া ইংরাজীতে কহিলেন,—এই লোক আসামীর সাহায্যকারী, তাকে লুকিয়ে রেখেছে ; একে গ্রেপ্তার করুন।

সাহেব ওয়ারিস সাহেবকে প্রশ্ন করিলেন,—টুমি আসামীর টরফে কি কহিটে চাহে ?

ওয়ারিস সাহেব নির্ভীক ভাবে উত্তর দিলেন,—কিছু না।

চন্দ্রনাথবাবু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—মিথ্যাবাদী! সাহেবের সঙ্গে চালাকী হচ্ছে ?

ওয়ারিস সাহেব দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন,—মুখ সামলে বাত বলবেন হুজুর ? খোদার মালুম আছে, চালাকী করল কে ?

চন্দ্রনাথবাবু দুই চক্ষু পাকাইয়া কহিলেন,—চোপরাও বেয়াদপ।

সাহেব ইংরাজীতে চন্দ্রনাথ বাবুকে চুপ করিতে অনুরোধ করিয়া ওরায়িস সাহেবকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—আসামীকে গোপন করিয়া রাখিলে টাহার কি শাস্তি টুমি জানে ?

ওয়ারিস সাহেব উত্তর দিলেন,—মোর কাম ছ্যাল ওনার সাথে, তোমার কাছে ত মুই আসিনি সাহেব, মোরে কেন ওসব পুছছো ?

চন্দ্রনাথ বাবু ওয়ারিস সাহেবের স্পর্দ্ধার কথাটা ইংরাজী করিয়া সাহেবকে শুনাইয়া দিলেন। সাহেব এবার উষ্ণ হইয়া প্রশ্ন করিলেন,—হামার এক্তিয়ার আছে টোমাকে ক্রশ করিটে, টুমি বাঢ্য আছে হামার কটার জবাব ডিটে।

ওয়ারিস সাহেব কঠিন ভাবে কহিলেন,—মোর কাছে কোনো জবাব তুমি পাবে না সাহেব, জেলে দিলেও না।

সাহেব প্রশ্ন করিলেন,—আসামী কোঠায় আছে ?

ওয়ারিস সাহেব কহিলেন,—মোরে মিছামিছি পুছছো সাহেব।

চন্দ্রনাথ বাবু ইংরাজীতে কহিলেন,—ও বলবে না।

সাহেব রাগিয়া কহিলেন,—হামি টোমাকে চালান ডেবে, টোমার মোকাম সার্চ্চ করবে, টোমার ভারি সাজা হবে। জলডি জবাব ডেও।

ওয়ারিস সাহেব তথাপি নিরুত্তর, শ্মশ্রুময় মুখে ব্যঙ্গের হাসি তাঁহার মনের দৃঢ়তা প্রকাশ করিতেছিল।

সাহেব এবার বজ্রকণ্ঠে তাঁহার প্রহরীদ্বয়ের উদ্দেশে কহিলেন,—ইস্কো পাকড়ো।

কিন্তু সাহেবের স্বরের সঙ্গে সঙ্গে দ্বারের পরদা ঠেলিয়া বিশু কক্ষমধ্যে সবেগে প্রবেশ করিয়া কহিল,—খবরদার সাহেব! পাকড়াতে হয় আমাকে পাকড়াও; আমিই বিশু।

১৬

ওয়ারিস সাহেব যখন বিশুর সকল আপত্তি বাতিল করিয়া তাহাকে রাত্রিটুকু সেইখানে কাটাইতে বাধ্য করেন এবং তাহার পর রহিমকে একান্তে ডাকিয়া চুপি চুপি দুই চারিটি কথা বলিয়াই বাহির হইয়া পড়েন, বিশুর মনের ভিতরটা তখনও পরিষ্কার হয় নাই। একটা নূতন উদ্বেগ সেখানে তালগোল পাকাইতেছিল।

রহিম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—রাত্তিরে তুমি কি খাও বিশু ভাই?

বিশু কহিল,—ভাত খাই। কিন্তু আজ আমি আর কিচ্ছু খাব না।

রহিম প্রশ্ন করিল,—কেন?

বিশু উত্তর দিল,—ক্ষিদে মোটেই নেই, তাই।

পরি হঠাৎ কখন ভিতরে গিয়াছিল, এই সময় পুনরায় ঘরটির মধ্যে

ঢুকিয়াই কহিল,—খাবার এখন ঢের দেরী, রাত ন'টার আগে ত নয়, ক্ষিধে ততক্ষণে খুব হবে।

বিশু মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল, পরির হাতে একখানা মোটা রকমের বাঁধানো বই। তাহার দুই চক্ষুর ম্লান দৃষ্টি সহসা উজ্জ্বল হইয়া বইখানির দিকে পড়িল।

পরি মুচকি হাসিয়া কহিল,—তা বলে যেন মনের ভেতর এখন থেকেই ঠিক দিয়ে রেখোনা বিশুদা, যে আমরা ভাত খাইয়ে তোমার জাত মেরে দেব। খাবার ব্যবস্থা আলাদা রকমই হবে, যাতে তোমার মনে খুঁৎ না ওঠে।

বিশুর দৃষ্টি তখনও বাঁধানো সুদৃশ্য বইখানির দিকে। খাবার সম্বন্ধে কোন কথা না কহিয়া সে ইহারই কথা তুলিল; জিজ্ঞাসা করিল,—ওখানা কি বই?

পরি বইখানা বিশুর হাতের দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল,—গেল বছরের প্রদীপ; বারো মাসে বারোখানা বই ভালো করে বাঁধাতে এরকম হয়েছে। বাবা এর গ্রাহক কিনা। খুলে দেখনা, কত রকমের কত ছবি, দেশ বিদেশের কত কথা, কেমন সব মজার মজার গল্প। আমার ভারি ভালো লাগে পড়তে; তুমি পড় না।

বইখানি হাতে পড়িতেই বিশু তাহা খুলিয়াছিল; এতক্ষণ যে উদ্বেগ তাহার মনের ভিতর উসখুস করিতেছিল, কোথায় তাহা সরিয়া গেল।

এই অবসরে ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে চোখে চোখে কি একটা কথা হইল এবং পরক্ষণেই রহিম বইয়ের-পাতায়-নিবিষ্টচিত্ত-বিশুর উদ্দেশে কহিল,—তুমি ভাই তাহলে বইখানা পড়তে থাক, আমরা ততক্ষণ হাত মুখ ধুয়ে আসি।

বিশু বয়ের পাতা হইতে তৎক্ষণাৎ দুই চক্ষু তুলিয়া কহিল,—আমাকে নিয়ে তোমরা নিজেদের কথাই ভুলে গেছ, এ কিন্তু ভাই ভারী অন্যায়।

পরি সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করিল,—অন্যায়টা কিসে?

বিশু কহিল,—নয় বা কিসে? আমাকে বাড়ীতে এনে খাওয়ালে, কত রকমে খাতির করলে, যেন আমি কোথাকার কোন পীর পয়গম্বর! অথচ, নিজেরা এখনো মুখে জল পর্য্যন্ত দাও নি।

পরি কহিল,—তাতে কি হয়েছে; তুমি যে আমাদের অতিথি, পীর-পয়গম্বরের চেয়েও তুমি কম নাকি?

বিশু শিহরিয়া উঠিয়া কহিল,—অমন কথা ব'ল না, তাতে পাপ হবে।

পরি কহিল, হক কথা বললে পাপ হয় না। অতিথিকে তোমরাও ত বল ভগবান? আমার বাবা বলেন, ভগবান আলাদা নন; মানুষের ভেতরেই থাকেন। মানুষকে ভালবাসলে, তাঁকে ভালবাসা হয়।

রহিম হাসিয়া কহিল,—পরির সঙ্গে কথায় তুমি পারবে না বিশু ভাই! আমার বাবার অনেক কথাই ও মুখস্থ করে রেখেছে, সময় বুঝে সেইগুলো বলে তাক লাগিয়ে দেয়।

বিশু কহিল,—কথাগুলো সত্যই মুখস্থ করে রাখবারই মত। এই সব কথা শুনতে আমি বড় ভালবাসি। তোমাদের বাবা এবার যখন আসবেন, আমি শুনলেই কিন্তু ছুটে আসবো,—একথা বলে রাখছি।

রহিম তাহার কথায় জোর দিয়া কহিল,—নিশ্চয়ই।

সঙ্গে সঙ্গে পরিও হাসিমুখে কহিল,—সেদিন তাহলে তোমার নেমন্তন্ন বিশুদা, এখন থেকেই জানিয়ে রাখছি।

বিশু মুখখানি ম্লান করিয়া কহিল,—আমি কিন্তু ভাবছি, সে সুখ আমার অদৃষ্টে নেই।

ভাই বোন দুজনেই এক সঙ্গে বিশুর বিমর্ষ মুখখানির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল। পরক্ষণে পরির কণ্ঠ দিয়া প্রশ্নটা ঠেলিয়া বাহির হইল,—কেন?

বিশু কহিল;—সে সময় হয়ত আমাকে আলিপুরের জেলখানায় গিয়ে নেমন্তন্ন খেতে হবে।

বিশুর কথাটা উভয়ের মনেই আঘাত দিল। পরির বড় বড় দুটি চক্ষু ছল ছল হইল; রহিম মুখখানা শক্ত করিয়া কহিল,—পাগল। কেন তুমি এখন থেকেই ও সব ভাবছ বিশু ভাই! ওস্তাগরকাকু যখন বেরিয়েছেন, একটা কিছু না করে ফিরবেন না; মিটমাট হয়ে যাবেই।

পরিও এই সময় আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল,—তাই ত; অত ঝগড়া-ঝাটির পর দাদার সঙ্গে তোমার যখন হঠাৎ আজ এমন করে ভাব হয়ে গেল, তখন কি আর ছাড়াছাড়ি হতে পারে! খোদা যে হিসেব করেই কাজ করেন, তাঁর হিসেবে ভুল চুক হয় না। আমি বলছি বিশুদা, তোমার কিচ্ছুই হবে না।

পরিজনসুলভ সান্ত্বনার এই পরিচিত সুর বিশুর উদ্বেলিত চিত্তটি কিছুক্ষণের জন্য যেন স্থির ও নিথর করিয়া দিল; সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতা বাষ্পের আকার ধরিয়া এই অভিভূত বালকটির দুই চক্ষু আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কে যেন তাহাকে সহসা সচেতন করিয়া দিল; তাহার মনে পড়িয়া গেল রহিমের কথা, এখনো তাহার হাত মুখ ধোয়া হয় নাই—হয়ত মুখেও কিছু দেয় নাই। ব্যগ্রকণ্ঠে বিশু কহিয়া উঠিল,—আমি কি স্বার্থপর দেখ, তোমরা ভেতরে যাচ্ছিলে—আমি কথার ফের দিয়ে তোমাদের আটকে রেখেছি; তোমরা যাও; আমি ততক্ষণ বইখানা দেখি।

রহিম কহিল,—তাই দেখ, পরি ঐ বইখানা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে; ওর ভেতর যে কবিতাগুলো আছে, ও সব মুখস্থ করে ফেলেছে।

পরি বেশ সপ্রতিভকণ্ঠে কহিল,—ভাল কবিতা পড়লে কার না মুখস্থ

করবার ইচ্ছে হয় বল? বিশুদাও কি ছাড়বে নাকি? আর তুমি? তা বুঝি জাননা বিশুদা, দাদা ঐ সব কবিতা প'ড়ে নিজে নিজে কত সব কবিতা বাঁধে; তোমাকে সেগুলো শুনিয়ে দেব আজ।

রহিম তর্জ্জন করিয়া উঠিল,—তুই থাম্।

পরি কহিল,—কেন, মিছে কথা ত বলিনি, আর মিছে কথা বলবার মেয়েও আমি নই। কবিতা তুমি লেখ না?

বিশু প্রশংসভরা দৃষ্টিতে রহিমের দিকে চাহিয়া কহিল,—তোমার ত তাহলে অনেক গুণ রহিম ভাই?

রহিম কহিল,—পরির কথা শোন কেন, ও একটা আমার খেলা।

পরি হাসিয়া কহিল,—এখন এসো, এই বেলা আমরা ওদিককার কাজ সেরে আসি। বিশুদা কতক্ষণ একলা থাকবে?

রহিম বিশুর দিকে চাহিয়া কহিল,—বেশীক্ষণ আমাদের দেরী হবে না, এখুনি আসছি বিশু ভাই।

কথাগুলি বলিতে বলিতেই রহিম ভিতরে চলিয়া গেল। পরি কহিল,—একখানা খাতা আর পেনসিল পাঠিয়ে দিচ্ছি বিশুদা, ওর মধ্যে যে কবিতাটি তোমার ভাল লাগবে টুকে নিয়ো; তাতে মুখস্থ করবার সুবিধা হবে।

পরি বাড়ীর ভিতরে গিয়াই তাহাদের বালক চাকরটিকে দিয়া একখানা একসারসাইজ খাতা ও একটা পেনসিল পাঠাইয়া দিল। বিশু তখন পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিল। চাকরটি তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাহার কাছেই সেই দুইটি বস্তু রাখিয়া চলিয়া গেল।

এই হিন্দু চাকরটিকে আনন্দপুরের বাজারে পাঠাইয়া, বিশুর জন্য রাত্রির খাবারের ব্যবস্থা করিতেই ভ্রাতা ও ভগিনী ভিতরে গিয়াছিল।

কিন্তু তাহাদের ফিরিবার পূর্ব্বেই প্রদীপের একটা লেখা বিশুর অন্তরের অন্তঃস্তলে যেন প্রদীপ্ত শিখার উত্তপ্ত পরশ দিল। বিশু তৎক্ষণাৎ শিহরিয়া সোজা হইয়া বসিল, বইখানি আপনা আপনিই মুড়িয়া গেল। তাহার চিত্তমধ্যে তখন অসহ্য জ্বালা ধরিয়াছে। সত্যই ত, সে কি পাগল হইয়াছে? ইহারা না-হয় গৃহীর কর্ত্তব্য করিতেছে, আশ্রিতকে রক্ষা করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে; ওস্তাগার সাহেব তাহাকে রক্ষা করিতে কোমর বাঁধিয়া ছুটিয়াছেন। বইয়ের ঐ গল্পটার বৃদ্ধটির মত হয়ত এই সূত্রে তিনি অতি বড় বিপদে জড়াইয়া পড়িবেন এবং হাসিমুখেই তাহা সহিবেন। কিন্তু তাহার কি উচিত, এই সুযোগটুকু লইয়া এইভাবে নিজেকে রক্ষা করা? গল্পের ঐ বিপন্ন মানুষটি চুপ করিয়াই বসিয়াছিল, তাহাকে বাঁচাইতে অপরিচিত বৃদ্ধটির মৃত্যুবরণ শেষ পর্য্যন্তই সে দেখিয়াছিল! কিন্তু সেও কি তাহাই করিবে? না, সে ঐ গল্পের মোড় ফিরাইয়া দিবে। সত্য সে গোপন করিবে না, তাহার জন্য আর একজন নিরপরাধকে সে বিপদগ্রস্ত হইতে দিবে না। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র উত্তেজনা বিশুকে অস্থির করিয়া তুলিল। তাহার নিজের মনই যেন কঠিন হইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল,—কেন সে ভীরুর মত মাঠ হইতে পলাইয়া আসিল? কেমন করিয়া এখানে সে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে? তাহাকে উপলক্ষ করিয়া এই সদাশয় ওস্তাগর সাহেব যদি শাস্তি পান সে কি খুসী হইবে?

বিশু সবেগে উঠিয়া পড়িল, আপন মনেই মাথা নাড়িয়া কহিল,—না না না, আমি থাকতে পারব না; এখানে লুকিয়ে—কিছুতেই না।

হঠাৎ চঞ্চল দৃষ্টি তাহার পড়িল তক্তপোষের উপর একসারসাইজ্ খাতা ও পেনসিলটির উপর। সেই দুইটি বস্তুই যেন তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিষ্কৃতির একটা যুক্তি তাহার অস্থির মস্তিষ্কের ভিতর সঞ্চার করিয়া

দিল। খাতাখানা খুলিয়াই সে তাহার প্রথম পৃষ্ঠায় পেনসিল দিয়া লিখিয়া ফেলিল—

ভাই রহিম,

তোমাদের আদর-যত্ন আমাকে আর সমস্তই ভুলিয়ে দিয়েছিল। তোমরা সকলেই মহতের মতই কাজ করেছ, কিন্তু আমি করেছি ঠিক তার উল্টো। এই বয়ের একটা গল্প থেকেই আমার ভুলটুকু বুঝতে পেরেছি, তাই নেহাৎ কাপুরুষের মত এখানে লুকিয়ে না থেকে ধরা দেবার জন্য আবার এখান থেকে পালাচ্ছি। না বলে যাওয়ার জন্য আমাকে ভাই ক্ষমা ক'র তোমরা। তোমাদের কথা কখনো ভুলতে পারব না।

তোমাদের—বিশু।

খাতায় লেখার অংশটা খুলিয়া রাখিয়া ও তাহার উপর বাঁধানো বইখানার কিয়দংশ চাপা দিয়া বিশু সতর্ক পদে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

ইহার কিছুক্ষণ পরেই পরি তাহার দাদার লেখা একখানা কবিতার খাতা হাতে করিয়া কল হাস্যের সহিত ঘরে ঢুকিল। কিন্তু যে অতিথিটিকে চমৎকৃত করিয়া দিবার জন্য বিজয়িনীর মত পরির আবির্ভাব, পরিচিত তক্তপোষটির উপর তাহার অভাব এক নিমিষে সমস্ত ওলট পালট করিয়া দিল। সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল কলহাসির ঝঙ্কার, দুই চক্ষুর দৃষ্টি পড়িল বাঁধানো কেতাবখানির একাংশ চাপা খাতাখানির উপর। তাড়াতাড়ি সেখানা টানিয়া লইয়া সে বিশুর চিঠিখানা পড়িতে আরম্ভ করিল।

পরক্ষণেই রহিম আসিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—অমন করে পড়ছিস্ কি? বিশু কোথায়?

পরি মৃদুকণ্ঠে কহিল,—পাখী তোমার উড়ে গেছে!

তীক্ষ্ণকণ্ঠে রহিম কহিল,—সব সময় ডেঁপমী ভাল লাগে না; হ'ল কি?

পরি খাতাখানা রহিমের হাতে দিয়া কহিল,—যা হওয়া উচিত, তাই হয়েছে। পড়ে দেখ না।

বিশুর চিঠি পড়িতে পড়িতে রহিমের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। পড়া শেষ হইতেই একটা নিশ্বাস জোরে ফেলিয়া সে কহিল,—এখন বুঝছি, ওকে একলা ফেলে আমাদের যাওয়াটা ঠিক হয় নি।

পরি কহিল,—ছেলেটা ভারী আহাম্মুখ নয় দাদা?

রহিম কোন উত্তর দিল না, বিশুর হাতের লেখা অক্ষরগুলি এই ছেলেটির মনের ভিতরেও বুঝি তখন অবিরত মন্দ্র হইতেছিল। বিশু যেন তাহারই মনের কথা টানিয়া বাহির করিয়া খাতার এই কাগজখানায় দাগিয়া দিয়াছে—কাপুরুষের মত লুকিয়ে না থেকে ধরা দেবার জন্য এখান থেকে পালাচ্ছি।

দাদার মনের কথা যেন তাহার এই নীরবতার ভিতর দিয়াই ধরিয়া ফেলিয়া পরি সহসা কহিল,—আচ্ছা দাদা, তুমি এই বিশুদার অবস্থায় পড়লে কি করতে?

রহিমের মুখ এবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, গলায় জোর দিয়া সে কহিল,—আমিও ঠিক এমনি করেই পালাতুম পরি!

পরির মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল,—কহিল,—সত্যি? তাই বুঝি তোমার বন্ধুকে ধরতে ছোটনি, গুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছ, আর মনে মনে তার তারিফ করছ?

রহিম কহিল,—তারিফ করবার কাজই ত সে করে গেল।

পরি এবার দাদার কথায় সায় দিয়া কহিল,—যা বলেছ দাদা, যদিও ওর জন্যে মনে আমাদের কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু না বলে পারছি না ঠিক

রাস্তাই এবার ও ধরেছে,' আর এর জন্যে ওকে আমি এই প্রথম ছেলাল করছি।

ইহার ঘণ্টা দুই পরেই ওয়ারিস সাহেব ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, বাহিরের ঘরখানিতে ভ্রাতা ও ভগিনী দুইটি প্রাণী তাঁহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।

ওয়ারিস সাহেবকে দেখিয়াই উচ্ছ্বসিত স্বরে পারি প্রশ্ন করিল,—কি হল কাকু? বিশুদার সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?

ওয়ারিস সাহেব সমস্ত কথাই স্পষ্ট করিয়া ভ্রাতা ভগিনীকে শুনাইয়া দিলেন, যাহা যাহা সেখানে ঘটিয়াছিল, জমিদার চন্দ্রনাথ বাবুর নির্দ্দেশে পুলিশ সাহেব তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে হাতকড়ি বাহির করিলে কেমন করিয়া ঠিক সেই সময় বিশু সেখানে উপস্থিত হইয়া ধরা দিয়াছিল।

রহিম জিজ্ঞাসা করিল,—সেই হাতকড়ি বুঝি বিশুর হাতেই পড়ল?

ওয়ারিস সাহেব কহিলেন,—পড়তই ত, তাজ্জব ছাবাল, কিছুতেই ভয়ডর নেই। সাহেব যেই বললে, তুমি বিশু ত, তোমাকে আমি বাঁধবো। অমনি সে দুখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে—বাঁধো।

দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া পরি কহিল,—বাঁধলে?

ওয়ারিস সাহেব কহিলেন,—খোদার মর্জ্জী কে নয় করে? হঠাৎ অমনি বিশু বাবুর মা সেখানে এসে হাজীর হলেন। চোখ পাকিয়ে কইলেন,—মুই জামীন, মোর ছাবালরে তুমি রেহাই দাও সাহেব।

রহিম কহিল,—বিশুর মা বললেন এ কথা? বা! বা! তারপর, সাহেব কি বললে?

ওয়ারিস সাহেব কহিলেন,—সাহেবকে কি চন্দরবাবু কথা বলতে দেয়,—কত আইন বাতলায়, ইংরাজীতে বলে, বুঝতে ত পারিনে বাপু।

হাঁ, তবে সাহেব হলে কি হয়, মেয়ে লোকের মান ইজ্জৎ বোঝে, চন্দর বাবুকে এক ধমকানি দিয়ে থামিয়ে দিলে। তারপর বিশুবাবুর মাকে বুঝিয়ে বললে, জামীন দেবার মালিক ত মুই নই মায়ী, সে হচ্ছে মেজেষ্টর হাকিমের হাত। তা আপনার ছাবালের হাতে মুই হাতকড়ি দোব না, অমনি অমনি আদালতে নিয়ে যাব কাল সকালে। আজ রাতটা সে তোমার কাছেই থাকবে মায়ী, মুই খুব ভোরে ভোরেই হাজীর হব এখানে। চন্দরবাবু তাতে না করলে, কত কি ইংরাজীতে সাহেবকে বোঝালে, কিন্তু সাহেব তেনার কথায় কান না দিয়ে বিশুবাবুর মায়ীকে ছেলাম দিয়ে গট্ গট্ করে বেরিয়ে গেল। চন্দরবাবু হাঁ করে বসে রইলেন।

পরি কহিল,—ভাগ্যিস বিশুদা গিয়েছিল!

রহিম জিজ্ঞাসা করিল,—আসবার সময় চন্দর বাবু তোমাকে কিছু বললে কাকু?

ওয়ারিস সাহেব কহিলেন,—আমি তাঁকে যা বলবার বলে এলুম, তিনি রাটি কাড়লেন না।

পরি জিজ্ঞাসা করিল,—কি বলে এলে কাকু?

ওয়ারিস সাহেব কহিলেন,—বললুম, বিশুবাবু বার আনন্দপুরের তামাম লোকের বুকের কলজে, ওনার তরে মোদের সবার জান কবুল; তোমার যা ক্ষ্যামতা হয় কর।

রহিম ও পরি উভয়েরই মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। পরক্ষণে রহিম কহিল,—বেশ বলেছ কাকু!

১৭

ঘরের বাহিরে দালান ও উঠানে বড় বাড়ীর প্রায় সকলেই সমবেত হইয়াছিলেন। এমন সঙ্গীন ব্যাপারটির কি রকম নিষ্পত্তি হয়, তাহা

জানিতে ইহাঁদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন নাই কিম্বা বিশুর পক্ষ লইয়া কোনো কথা কহিতে কাহাকেও আগ্রহশীল দেখা যায় নাই।

বিশুর হাতখানি ধরিয়া হেমাঙ্গিনী দেবী যখন ইহাঁদেরই ভিতর দিয়া নিজের প্রকোষ্ঠের দিকে চলিলেন, তখন অনেককেই সহানুভূতি প্রকাশ করিতে দেখা গেল। বাড়ীর এক প্রবীণা অগ্রসর হইয়া অযাচিত ভাবেই কহিল,—কি ভরসা তোমার মা? .

আর এক প্রবীণা তৎক্ষণাৎ কথাটার সায় দিয়া কহিল,—ভরসা না হলে বাঘের মুখ থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে আনতে পারে?

কিন্তু হেমাঙ্গিনী দেবী এ সকল কথায় কাণ না দিয়া বা কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপটুকুও না করিয়া ছেলের সহিত নিজের মহল্লার দিকে হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন।

তখন মা ও ছেলেকে কেন্দ্র করিয়া আর এক দফা আলোচনা আরম্ভ হইল। যে দুই প্রবীণা এইমাত্র আগু বাড়াইয়া মায়ের প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহারাই পুনরায় মায়ের অসাক্ষাতে বিচিত্র ভঙ্গীতে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন।

প্রথম প্রবীণা কহিল,—মাগীর তেজ দেখলে! যেন লড়াই ফতে করে চলেছেন, আমাকে মাটীতে আর পা পড়ে না!

অপর প্রবীণা কহিল,—মাগো-মা! দিনে দিনে এ সব হচ্ছে কি! না হয় হাতে দু' পয়সা আছে, তাই বলে ধিঙ্গীর মত সদরের ঘরে সবার সামনে বেরুতে হবে! সায়েব-গোরা—তার সামনে দাঁড়িয়ে তকরার! কি ঘেন্না মা, কি ঘেন্না!

কুসুমের মা নবতারাও এই দলে ছিল। বুড়ীদের কথা তাহার কাণে বুঝি বিঁধিতেছিল। সে এই সময় মুখ টিপিয়া হাসিয়া মৃদুস্বরে কহিল,

কিন্তু তোমরাই দুজনে ত ওপর পড়া হয়ে মেজ বৌদির সুখ্যেত করলে পিসিমা? এখন আবার উল্টো গাইছ যে!

ঝঙ্কার দিয়া প্রথম প্রবীণা তৎক্ষণাৎ জোরগলায় কহিল,—তুই থাম্ ছুঁড়ি! মুখের ওপর কথা ক'স নি!

অপর প্রবীণাও সঙ্গে সঙ্গে মারমুখী হইয়া কহিল,—ওর গায়ে যে লেগেছে, তাই টিলটি ছুঁড়ে টস্ দেখালে! ওর মেয়েও যে ও-ঘরে ছেল, বিশুর মার পিছু পিছু গেল দেখনি! .

সত্যই কুসুম শেষ পর্য্যন্তই বাহিরের ঘরে থাকিয়া ঘটনাটার নিষ্পত্তি দেখিয়াছিল এবং বিশুর হাত ধরিয়া তাহার মা বাহির হইবামাত্রই সেও মনে মনে কি একটা মতলব আঁটিয়া তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল।

কুসুমের মা নবতারার প্রকৃতি আর যাহাই হউক স্পষ্ট কথা বলিতে সে কোন ক্ষেত্রেই দৃকপাত করিত না, এখানেও করিল না! খপ করিয়া কহিল,—মেজ বৌদি যদি বাইরের ঘরে এসে সায়েবের সঙ্গে কথা কইতে পারে, আমার মেয়ের তাতে ও ঘরে যাওয়াটা কি এমন দোষের হয়েছে?

মুখ ঝাপটা দিয়া এক প্রবীণা কহিল,—হয়নি দোষ? মেয়ে কি তোর কচি খুকিটি এখনো আছে নাকি! এসব ভাল নয়।

নবতারা পূর্ব্ববৎ হাসিয়া কহিল,—দোষ যদি হয়েছে, তাহলে মেজ বৌ-দিকে দেখেই ছুটে গিয়ে অত সুখ্যেত করলে কেন? আর যেই সে চোখের আড়ালে গেছে, অমনি সুর পাল্টাচ্ছই বা কেন?

নবতারার এই জেরার উত্তর দেওয়া যেমন কঠিন, এই শ্রেণীর নারীদের জিহ্বার গতি রুদ্ধ করাও ততোধিক কঠিন। অন্যের দোষগুলি ইহাদের যে তীক্ষ্ণ চক্ষুর উপর সর্ব্বদাই কিলবিল করিতে থাকে, নিজেদেরে কোন দোষের ছায়াটুকুও তাহাতে পড়ে না, কেহ এ সম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশ দিলে

ইহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সুতরাং নবতারা হাসিমুখে যে প্রশ্ন করিল, ইহারা তাহার ধার দিয়াও না গিয়া অন্য দিক দিয়া নবতারাকে নির্ম্মম আঘাত দিল। কহিল, তবু যদি সোয়ামীর মুরদ থাকত! বাপের বাড়ী গুষ্টিশুদ্ধ পড়ে লাথি ঝাঁটা যারা খেতে পারে, তাদের মুখ ত অমনি আলগাই হবে।

কোন্ কথা হইতে কোন্ কথা আসিল! কিন্তু ইহাদের প্রকৃতি নবতারার অবিদিত ছিল না। সে কিছুমাত্র তাতিল না, পূর্ব্ববৎ হাসিমুখেই কহিল,—বাপ বেঁচে থাকলে তাতেও সুখ আছে পিসীমা, যা তা একটা সুবাদ ধরে পরের দোর আঁকড়ে পড়ে থাকার চেয়েও বাপের বাড়ীর লাথি ঝাঁটাও ভাল!

নবতারার কথাটায় যেন জোঁকের মুখে নুন পড়িল! উক্ত দুই প্রবীণাই বড় বাড়ীর কোন দুই সরীকের গলগ্রহরূপেই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, পতি ও পিতৃকুলে ইহাঁদের বাতি দিতে কেহ নাই, মাতৃকুল সম্পর্কে দূরতম কোন প্রশাখা অবলম্বন করিয়া এখানে কায়েমীভাবে বাসা পাতিয়াছেন।

বিতর্কের নিষ্পত্তি হয়ত এখানেই হইত না, কিন্তু এই সময় দেহরক্ষী বাহাদুরের সহিত চন্দ্রনাথ বাবুকে সেই পথে আসিতে দেখিয়া—হঠাৎ একটা দমকা বাতাস বহিলে তুলার স্তূপ যে ভাবে চারি ধারে উড়িয়া ছড়াইয়া পড়ে—দালান ও উঠানে সমবেত মহিলারাও ঠিক সেই ভাবে কে কোথায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল।

কোন কোন সংসারে, এমন প্রকৃতির মেয়েও দেখা যায় যে, অন্যায় তাহারা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারে না এবং কাহারো অন্যায় কথা কাণে বাজিলে নীরবে সহ্য করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। অথচ, ইহাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে, যে সব কাজ নিজের একান্ত অবাঞ্ছিত, নিজস্ব

প্রিয়জনরা তাহাতেই ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে। নিজের ঘরের জঞ্জাল সাফ করিতে ইহারা যে পরিমাণ উদাসীন, পরের বাড়ীর আবর্জ্জনা দেখিয়া নাক নাড়িতে সেই পরিমাণেই আগ্রহশীল। নবতারা ঠিক এই শ্রেণীরই মেয়ে। স্বামীকে সে বিপথ হইতে ফিরাইতে পারে নাই এবং তাহার মেয়ে কুসুমও এই বয়সেই—বয়সের অনুপাতে যেরূপ বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে, সে পরিচয়ও আমরা পাইয়াছি। মেয়েকেও শাসন করিবার মত শক্তি নবতারার নিশ্চয়ই নাই। সুতরাং তাহার প্রকৃতিগত ন্যায়নিষ্ঠা ও অন্যের উদ্দেশে উচিত কথার কি সার্থকতা থাকিতে পারে?

যাহারা বিশুর মায়ের অনুগ্রহপ্রত্যাশী, এ অবস্থায় সমবেদনা প্রকাশ করিতে তাঁহাদের প্রকোষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। অনেকেই অনেক কথা কহিল, সে সকল কথায় অপর পক্ষের উপর নিন্দা ও আক্রমণ যে পরিমাণ ছিল, হেমাঙ্গিনী দেবীর সাহস ও আক্কেল বিবেচনা সম্বন্ধে ততোধিক প্রশংসাও ছিল। কিন্তু হেমাঙ্গিনী দেবীকে কাহারও কথায় কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিতে দেখা গেল না, তাঁহার মুখের একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য বর্ম্মের মতই যেন বহু কণ্ঠের নিন্দা স্তুতি সমস্তই প্রতিহত করিয়া দিল। তখন একে একে আর সকলেই আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল, রহিল শুধু একা কুসুম। সহসা সে মুখখানা মচকাইয়া ও চোখ দুইটি ঘুরাইয়া হেমাঙ্গিনী দেবীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—ছেলে যেন তোমার কি মামীমা! ছিলেন আমার কাছে, ফুল পাড়ছিলেন, অমনি চাপলো মাথায় রোখ, এক লাফে গাছের ডাল থেকে মাটীতে না নেমেই এক ছুটে একবারে মাঠ! বারণ কি কানে নিলে তখন! না গেলে ত এ সব কিছু হ'ত না।

বিশু রুক্ষ কণ্ঠে কহিল,—তুই থাম্।

কুসুম কহিল,—থেমেই ত গোল বাধিয়েছি। যদি তখন জোর করে

ফেরাতুম, এ ভোগান্তি তাহলে হ'ত ? তোমার কি বল না, দুচক্ষু যেথানে নিয়ে গেল ছুটলে এদিকে মামীমার মুখখানা যদি দেখতে ! মা ত !

ছেলের সঙ্গে মায়ের অনেক কথাই ছিল। কিন্তু কুসুমের উপস্থিতি তাহাতে বাধা দিতেছিল। অথচ এমন আন্তরিকতার সহিত এই মেয়েটি কথাগুলি বলিতেছিল যে, মুখ ফুটিয়া তাহাকে চলিয়া যাইবার কথা বলিতে বাধিতেছিল।

কুসুম পুনরায় কহিল,—এখন তোমাকে বলি মামীমা, তোমার কথা শুনে মনটার ভেতর কি রকম যেন করে উঠল, তাই নিজেই ছুটেছিলুম বুড়োর ঘরে, বললুম—কাজটা কি তোমার ভাল হচ্ছে মামা বাবু ? ছেলেয় ছেলেয় না হয় ঝগড়াই হয়েছে, এমন ত কতই হয়, তা বলে তুমি বুড়ো মিনসে—গুর্খা লিলিয়ে দিলে কি হিসেবে ?

মনের এমন বিপ্রিয় অবস্থাতেও কুসুমের কথায় হেমাঙ্গিনী দেবীর মুখে ঈষৎ হাসির সঞ্চার হইল। তিনি কহিলেন,—তুই ত দেখছি আচ্ছা মেয়ে ?

উৎসাহের সুরে কুসুম কহিল,—আগে কথাগুলো সব শোনো ? বুড়ো চোখমুখ পাকিয়ে বললে—ও কি ছেলে ? একটা ক্ষুদে ডাকাত, আমি ওকে জেলে দিয়ে তবে ছাড়ব ! আমারও মামীমা মাথায় রোখ চেপে গেল, বিশুদার বাতাস ত গায়ে লেগেছে ! বললুম অমনি বুড়োর মুখের ওপর—এটা কিন্তু মগের মুল্লুক নয় মামাবাবু যে, যা ইচ্ছে তাই করবে ? বিশুদার মাকে ত তুমি জান না, তোমাকে এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিনতে পারে !

হেমাঙ্গিনী দেবী শেষের কথায় কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু হইয়াই কহিলেন,—কি দরকার ছিল বাবু ও সব কথার ! তুই এখন ঘরে যা, মা, রাত হয়েছে।

কুসুম কহিল,—যাচ্ছি গো! জ্বালা কি শুধু তোমার একলার? হ্যাঁ, একটা কথা তোমাকে বলে যাচ্ছি মামীমা, বুড়ো উকীল হলে কি হবে, নিজেই গোল করে মরেছে!

হেমাঙ্গিনী দেবী প্রশ্ন করিলেন,—কেন?

কুসুম কহিল,—আচ্ছা, ঝগড়া ত বেধেছিল ঐ রাঙ্গা মূলো অখিল ছোঁড়াটাকে নিয়ে, তারও গোড়াতে ছিলেন আমাদের রাইকিশোরী শুভি; মামলা হলে এদের দুটিকে ত ডাকতে হবে! উকীল বুড়ো কিন্তু ওদের দুজনের কথা একদম যে চেপে গেছে, তা বুঝি জান না?

হেমাঙ্গিনী কহিলেন,—তাই নাকি?

কুসুম কহিল,—আমি যে সুরু থেকেই ছিলুম গো! সব দেখিছি চোখে, আর শুনিছিও কাণে, তবে ধরা-ছোঁয়া দিইনি মামীমা! উকীল বুড়ো ওদের দুটিকে ছাড়ান দিয়েছে কেন, তাও আমি বুঝিছি!

এই মেয়েটির মুখে এই ধরণের অপ্রত্যাশিত কথা শুনিয়া হেমাঙ্গিনী দেবী অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে প্রশ্নও প্রকট হইতেছিল, বিস্ময়েরও অন্ত ছিল না।

কুসুম দিব্য সপ্রতিভকণ্ঠেই কহিল,—কেন তা শুনতে চাও মামীমা? তবে বলি শোনো, পাছে নিজের রাঙ্গামুলো ছেলেটিকে নিয়ে আদালতে টানা হেঁচড়া চলে—তাই! তাহলে যে ওঁর মানে ঘা লাগবে গো! কিন্তু আমি তোমাকে বলে যাচ্ছি মামীমা, মামলা যখন হবে, আমাকে সাক্ষী মেনো, আমি হাকীমের সামনে দাঁড়িয়ে সব ফাঁস করে দেব।

কথাটা বলিয়াই কুসুম হন হন করিয়া চলিয়া গেল, কথাটার কোন উত্তর প্রত্যাশা করিলনা বা পিছনের দিকে একটিবারও ফিরিয়া চাহিল না।

২৮

শোভাই প্রথমে বাড়ীর ভিতরে আসিয়াছিল। কপালের ক্ষতটা হাত দিয়া ঢাকিবার যত চেষ্টাই সে করুক, কচি কচি আঙুলগুলির ফাঁক দিয়া তখনও রক্তের চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। এ সব ঘটনা পল্লীপরিবারে নূতন নহে, প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। সাবিত্রী দেবী মেয়ের দিকে চাহিয়া মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিলেন,—পড়ে মরেছিস বুঝি, না মারামারি করে এলি কারুর সঙ্গে?

শোভা কোনও উত্তর না দিয়াই নিজের শয়ন কক্ষের দিকে চলিল। মা খপ করিয়া মেয়ের হাতখানা ধরিয়া কহিলেন,—কই, দেখি।

মেয়ে দেখাইতে চাহে না, হাতখানা ছাড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া কহিল,—কিচ্ছু হয় নি, ছেড়ে দাও।

মা কণ্ঠে জোর দিয়া কহিলেন,—কিচ্ছু নয় কি! কপালখানা ত ফাটিয়ে এসেছিস্ দেখছি; হাত দিয়ে ঢাকা দিলেই কি রক্ত থামানো যায় পোড়ারমুখী! এম্নি করে কোন্ দিন খুন হবি, না হয় কোনো একটা অঙ্গ খুইয়ে আসবি। আয় দেখি—

বলিয়াই মা জোর করিয়া মেয়ের শুশ্রূষায় মনোযোগ দিলেন! ব্যথার সুরে কহিলেন,—ইস্! এখানটা যে একেবারে ডোবোর হয়ে গেছে রে! কোথায় পড়েছিলি? ইস্—মাগো!

মর্ম্মবাণীর সঙ্গে সঙ্গে আহত স্থানটি ধুইয়া মুছিয়া তাহাতে চুন ও হলুদের পুলটিশ দিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় মহামায়াদেবী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাহিরের গোলযোগ শুনিয়াই সম্ভবতঃ ছাদের উপর হইতে তিনি ক্ষিপ্রপদে নামিয়া আসিয়াছেন, তখনও ঘন ঘন শ্বাস পড়িতেছিল। হঠাৎ চোখে পড়িল শোভার কপালের ক্ষত, অবশ্য তখন তাহাতে রক্তের সংস্রব বিশেষ ছিল না। কিন্তু ইহা দেখিয়াই

তিনি অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া আর্ত্তস্বরে কহিলেন,—ওরে বাবা! কি হয়েছে কপালে ওর? আপনি এখনো মুখ বুজে রয়েছেন? কি দিচ্ছেন? চুন হলুদ? না—না,—ওতে কি হবে, টিঞ্চার আয়ডিন্ দিন তুলোয় করে, দাঁড়ান, আমি আনাচ্ছি, ওঁর ব্যাগে আছে।—

এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা বলিয়াই তিনি একেবারে হাঁফাইয়া উঠিলেন। একটু দম লইয়া বোধ হয় তাঁহার দাসীকে ডাকিবার উপক্রম করিতেছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সম্মুখে যাহা দেখিলেন, তাহাতে মুখের স্বর মুখের ভিতরেই আবদ্ধ রহিল, দুই চক্ষু যেন কপালের দিকে ঠেলিয়া উঠিল, দেহের সমস্ত সম্বিতটুকু কাড়িয়া লইয়া হঠাৎ কে যেন তাঁহাকে ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ করিয়া দিল!

দ্রুত পদশব্দ ও তৎসহ একটা চাপা কণ্ঠের আর্ত্তস্বর শুনিয়া সাবিত্রী দেবী দ্বারের দিকে চাহিতেই দেখিলেন, সে আর কেহ নয়, অখিল। কিন্তু এ কি মূর্ত্তি তাহার! ঠোঁট দুইটি ফুলিয়া পটলের আকার ধরিয়াছে। কোঁচার খুঁটটি হইতে জামার হাতা দুইটি রক্তে মাখামাখি হইয়াছে। কি হইয়াছে জানিবার জন্য যেমন তিনি ঠোঁট দুখানি নাড়িয়াছেন, অমনি তাঁহাকে অবাক করিয়া দিয়া মহামায়া দেবী চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—ওগো, এ কি সর্ব্বনাশ হল আমার! বাবারে!

বিশাল অন্দরমহলে যে যেখানে ছিল, হাতের কায ফেলিয়া সবাই আসিল এইখানে ছুটিয়া। সাবিত্রীদেবী নির্ব্বাক, শোভা ভ্যাবাচাকা হইয়া চাহিয়া রহিল,—এমন তুচ্ছ ঘটনায় এত উচ্চ গ্রামের আর্ত্তনাদ আর কখনও সে শুনে নাই। সে ভাবিয়া পাইল না, কি করিবে!

চারিদিক্ হইতে ছেলে মেয়েরা ছুটিয়া আসিয়া যেন থ হইয়া গেল! বুক চাপড়াইয়া কপালে হাতের তালির ঘা দিয়া মহামায়া দেবীর কি

আর্ত্তনাদ!—ওরে খোকোনরে! বাবা আমার—এমন করে কোন্ কালনিমে তোকে খুন করলে রে!

সাবিত্রী দেবী তৎক্ষণাৎ মেয়েকে ছাড়িয়া অখিলকে লইয়া পড়িলেন। ক্ষতস্থান ধোওয়া মুছা, পরিচর্য্যা—কিছুরই ত্রুটি হইল না। মহামায়া দেবীর মুখে শেষ পর্য্যন্ত হা-হুতাশ ও উচ্ছ্বাস যে পরিমাণ শুনা গেল, শুশ্রূষার কোন নির্দ্দেশ সে অনুপাতে কিছুমাত্র প্রকাশ পাইল না।

সাবিত্রীদেবী কহিলেন,—ছেলেয় ছেলেয় হয়েছে হয়ত কিছু, এ এমন হয়েই থাকে; এই নিয়ে কি অমন করে চেঁচাতে আছে দিদি! কোথায় আইডিন্ আছে আনতে বলুন, লাগিয়ে দিই।

কিন্তু বলিবেন কাহাকে, আর শুনিবেই বা কে? যেমন কর্ত্রী, তেমনই তাঁহার দাসী। খোকাবাবুর ঠোঁট ফোলা, জামার কাপড়ে রক্তের দাগ, এ সব দেখিয়া কেমন করিয়া সে স্থির থাকিবে? তাহার আর্ত্তস্বর তখন সুর সংযোগে সপ্তমে চড়িয়াছে,—ওগো কর্ত্তা বাবু গো! এ খুনে দেশে খোকাবাবুকে কেন এনেছিলে গো!

বড় বাড়ীর সকলে হতভম্ব হইয়া ভাবিতেছিল, একটু কিছু হলেই বুঝি বড় লোকদের এমনি ঘটা করে কান্নাকাটি করতে হয়!

যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত সাবিত্রীদেবীর তৎপরতায় সমস্তই সুসম্পন্ন হইয়া গেল। হঠাৎ কোনও দুর্ঘটনা হইলে, যে সকল ঔষধপত্র ও তোড়-যোড়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে, সে সমস্তই যে-চাকরের জিম্বায় ছিল, সাবিত্রী দেবীর তাগিদে সে সমস্তই আনিয়া দিয়াছিল। নিপুণ নার্সের মত ক্ষিপ্রহস্তে সাবিত্রী দেবী অখিলের মুখের আহত স্থানটি রীতিমত ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। মহামায়া দেবীর সর্ব্বাঙ্গ শেষ পর্য্যন্ত ঠক্ ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল, তিনি কিছুতেই হাত লাগাইতে পারেন নাই।

অখিলের মুখে পটি পড়িতে, এত দুঃখেও শোভার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিতেছিল, কি কষ্টেই যে তাহাকে সে হাসি চাপিতে হইয়াছিল তাহা সেই জানে। এই সময় মহামায়াদেবী অনেকটা প্রকৃতস্থ হইয়া কহিলেন,—ভাগ্যিস্. আপনি ওপরপড়া হয়ে এসব করলেন! দেখলেন ত, সবই আছে; কিন্তু এমনই আমার ভীতু মন, একটু কিছু হলে আর হাত পা ওঠে না, একবারে এলিয়ে পড়ি।

সাবিত্রীদেবী কহিলেন,—পাড়াগাঁয়ে এ রকম আকছারই হয়ে থাকে দিদি! আজ এ পড়লো হোঁচট খেয়ে, কাল ভাঙ্গলো মাথা, তারপর ছেলেয় ছেলেয় মারামারি—

মায়ের প্রশ্নের উত্তরে অখিল ইতিমধ্যেই মারামারির কাহিনীটুকু প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং মারামারির কথাটা মহামায়াদেবীর কাণে বাজিবামাত্রই তিনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—ছোটলোকের ছেলেরাই এ রকম করে মারধর করে বেড়ায়, মগের মুল্লুকে ত এতকাল ছিলুম, কই এ রকম কাণ্ড ত কখনো দেখিনি চোখে!

শোভা এই সময় পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িবার পথ খুঁজিতেছিল। মহামায়াদেবী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—মেয়েটির কপালখানাও ত দেখছি গর্ত্ত করে দিয়েছে হতচ্ছাড়া দস্যি ছেলে! কই, ওখানে ত আইডিন দিলেন না! শীগগীর দিন। নইলে এখুনি সেফ্‌টীক হবে—

ইচ্ছা না থাকিলেও সাবিত্রীদেবীকে আইডিনের শিশি ও কিঞ্চিৎ তুলা লইয়া মেয়ের দিকে মনোযোগ দিতে হইল। কিন্তু মেয়ে অমনই বাঁকিয়া বসিল, মুখখানা ভার করিয়া কহিল,—আমি ও ওষুধ দেব না, এ আপনি সেরে যাবে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে ত্রস্তা হরিণ শিশুটির মত সেখান হইতে ক্ষিপ্রগতিতে চলিয়া গেল।

মহামায়াদেবী কহিলেন,—মেয়ে ত আপনার ভারি অবাধ্য দেখছি!

সাবিত্রীদেবী কোন উত্তর দিলেন না। শোভার এভাবে স্থানত্যাগ অখিলের আহত মনে পুনরায় আঘাত দিল, মুখে বিরক্তির ভাবটুকু ফুটাইয়া সে কহিল,—ঐ বিশে ছোঁড়াটার পাল্লায় পড়ে ও বিগড়ে যাচ্ছে।

ছেলের কথায় মহামায়াদেবী তাঁহার গম্ভীর মুখখানি ঘুরাইয়া এইবার তীক্ষ্ণকণ্ঠে নির্দ্দেশ দিলেন,—ফিরুন উনি আগে, এর বিহিত তখন হবে।

কিন্তু এই বাড়ীরই এক প্রত্যক্ষদর্শী এই সময় এখানে আসিয়া বাহিরের দুর্ঘটনার পরবর্ত্তী অংশটুকু সালঙ্কারে সকলকে শুনাইয়া স্তব্ধ করিয়া দিল।

১৯

এই অতি অপ্রত্যাশিত ঘটনাটির সঙ্গে সঙ্গেই বড় বাড়ীর বাসীন্দাদের মধ্যে দুইটি দল প্রকাশ্যভাবে গড়িয়া উঠিল এবং আর একটি দল নিরপেক্ষতার ভাণ করিয়া অপ্রকাশ্যভাবে দুই দলের সহিতই ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিয়া চলিল।

ইহাতে নূতনত্ব নাই, বিস্ময়েরও কিছু নাই। পল্লী অঞ্চলের এইরূপ বহু পরিবারসমন্বিত বনেদী বংশের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, এই দলাদলির রহস্য তাঁহাদের নিকট পরিস্ফুট। হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, অনৈক্য—জাতিগত যত কিছু অনাচার—সবগুলিই যেন এই শ্রেণীর পুরাতন বাড়ী ও প্রাচীন বংশকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের ভিত্তি পর্য্যন্ত দূষিত করিয়া দেয়।

ঘরোয়া কলহের কথা ছাড়িয়া দিলেও বাহিরের কাহারও সহিত এই বংশের কেহ যদি কলহে রত হয়, তখন একই বংশজাত কত বিভীষণই

অসঙ্কোচে বাহিরের দলে যোগ দিয়া ঘরের পতন ঘটাইতে ব্যাকুল হইয়া উঠে। অথচ, চক্ষুর উপরেই ইহারা এরূপ ঘটনার বিপরীত আদর্শ প্রায়শঃই দেখিয়া থাকে। পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী বাহির-আনন্দপুরের মুসলমান বাসীন্দারা শিক্ষায় সভ্যতায় ও অর্থে যতই তাহারা দুর্ব্বল হৌক না কেন, রক্তের সম্বন্ধমাত্র নাই এমন কোন স্বধর্ম্মী প্রতিবাসী যদি বাহিরের কোন, বিশেষ ক্ষমতাশালী কর্ত্তৃক কোনসূত্রে আক্রান্ত হয়, তখনই সমস্ত গ্রাম সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহার পক্ষ সমর্থন করিবেই! কিন্তু পুরুষানুক্রমে কৌলিক অনৈক্যকে ইহারা এমনই অন্ধভাবে প্রশ্রয় দিয়াছে যে, প্রতিবেশী সঙ্ঘবদ্ধ জাতির এত বড় দুর্ল্লভ গুণটি উপলব্ধি করিবারও অবসর কখনও পায় নাই।

স্বামীর প্রতিক্ষায় মহামায়াদেবী উদগ্রীব হইয়া বসিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে কত কথাই তিনি শুনিয়াছেন, নানা সূত্রে কত আশঙ্কাই তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে, ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া এইখানেই এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটির উপর যবনিকা ফেলিতে তাঁহার আগ্রহের অন্ত ছিল না।

চন্দ্রনাথবাবু বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্রই তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—তোমার পায়ে পড়ি, যা হবার হয়েছে, আর ভীমরুলের চাকে ঘা দিয়ে ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ো না—কালই এখান থেকে ফিরে চলো।

চন্দ্রনাথবাবুর মনটা প্রসন্ন ছিল না; বিশুর মায়ের দৃঢ়তা এবং তাহাতে পুলিস সাহেবের পোষকতা তাঁহার সম্ভ্রমে যে আঘাত দিয়াছিল, তাহার জ্বালা তিনি তখনও মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিলেন। ইহার প্রতিবিধানের কত উপায়ই পিনাল কোডের ধারাগুলির ভিতর দিয়া তাঁহার মস্তিষ্কে পল্লবিত হইতেছিল। এ অবস্থায় স্ত্রীর এই মর্ম্মোচ্ছ্বাস তাঁহাকে বিচলিত ও বিরক্ত করিয়া তুলিল। বদ্ধদৃষ্টিতে ক্ষণকাল স্ত্রীর

বিবর্ণ মুখখানার দিকে চাহিয়া তিনি শ্লেষের সুরে কহিলেন,—হ'ল কি তোমার, বিশুর মা এসে বুঝি উঠে যাবার নোটিস্ দিয়ে গেছে ?

মহামায়াদেবী কহিলেন,—নোটিশ নাই দিক, কিন্তু বিশুর মা যে মোচনমান লিলিয়ে দিয়েছে, তাকি তুমি টের পাওনি ?

চন্দ্রনাথবাবু কহিলেন,—তা আর পাইনি ! তবে এখনো যে ভয়ে জমাট বেঁধে যাইনি কেন, তাই ভাবছি ! এতকাল বর্ম্মার মগ চরিয়ে এলুম, আজ একটা দজ্জাল মাগী আর জনকতক দর্জ্জীর হুমকী দেখে নিজের দেশভুঁই ছেড়ে না পালালে ইজ্জত থাকে কই ?

স্বামীর তীক্ষ বিদ্রূপ সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া মহামায়াদেবী অভিমান-ভরে কহিলেন, তোমার দেশভুঁই, তোমার ঘর বাড়ী হলেও তুমি এদের কাউকে আজো চেনো নি। যদি চিনতে, তাহলে ও কথা বলতে না।

চন্দ্রনাথবাবু কথা আর না বাড়াইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য দিকে আলোচনার মোড় ফিরাইয়া দিলেন। দিব্য সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—খোকা কোথায় ? ঘুমিয়েছে ?

মহামায়াদেবী কহিলেন,—এই ত এতক্ষণ জেগে ছিল, ঘুমোতে কি পারে বাছা ! মুখখানা ফুলে যেন জয় ঢাক হয়ে উঠেছে ! সাধ করে কি আর বলেছি—এখানে থেকে কাজ নেই, ফিরে চলো।

চন্দ্রনাথবাবুর সহজ কণ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে সতেজ হইয়া উঠিল, তর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—এই জন্য আমিও পণ করেছি—ঐ বজ্জাত বিচ্ছুটাকে জেল খাটিয়ে তবে ছাড়বো।

কক্ষান্তরে রাত্রিভোজনের আয়োজন চলিয়াছিল এবং সাবিত্রীদেবী ইঁহাদের পাচিকা ও পরিচারিকাকে লইয়া সেই ব্যবস্থায় বিব্রত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। ঠিক সাহেবীও নয়, অথচ ইঁহাদের পরিচিত ধারার সহিত খাপ খায় না—এমন এক খিচুড়ী ধরণের ভোজে সাবিত্রীদেবীর মত সুগৃহিণীকে

তালিম দিতে বুঝি হিমসিম খাইতে হইয়াছে। কোনও রকমে আয়োজন সমাধা করিয়া ঠিক এই সময়ই তিনি অবগুণ্ঠণবতী বধূটির মত মহামায়া-দেবীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং ইঙ্গিতে জানাইলেন,—খাবার দেওয়া হয়েছে।

কাজেই স্বামি স্ত্রীর আলাপ আলোচনা এইখানেই বন্ধ হইল।

অখিল ঘুমাইতেছিল বটে, কিন্তু শোভা এ পর্য্যন্ত চক্ষু দুইটির পাতা একটিবারও বুজাইতে পারে নাই। পাশাপাশি কয়েকখানি ঘরের পর তাহার নিজের ক্ষুদ্র কুঠরীটির ভিতর একধারা একখানা তক্তপোষে পাতা বিছানায় পড়িয়া সে বুঝি এতক্ষণ আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছিল! সেই যে কুরঙ্গ শিশুটির মত ক্ষিপ্রপদে ছুটিয়া আসিয়া শয্যায় আশ্রয় লইয়াছে, তাহার পর আর উঠে নাই। মা অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও তাহাকে কিছুই খাওয়াইতে পারেন নাই। এক কথায় সে মায়ের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে—বড্ডো মাথা ধরেছে, কিছুই ক্ষিধে নেই, খাব না মা! আমি ঘুমাব।

কিন্তু সে কি ঘুমাইয়াছে? যখনই এই ঘটনা লইয়া কক্ষান্তরে কথা হইয়াছে, সকল চিন্তাকে ঠেলিয়া তখনই প্রতি শব্দটি সংগ্রহ করিতে তাহার কি আগ্রহ! আবার যখনই কথোপকথনে বিশুর কথা উঠিয়াছে, তখন ধৈর্য্য ধরিয়া সে শয্যার উপরও পড়িয়া থাকিতে পারে নাই, আস্তে আস্তে উঠিয়া পা দুখানি টিপিয়া টিপিয়া দরজার দিকে গিয়াছে, কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া বিশুর তত্ত্ব আহরণ করিয়াছে। এমন কতবার যে তাহাকে বিছানা হইতে উঠা নামা করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

চন্দ্রনাথবাবুর গলার স্বর শুনিয়াই সে ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছিল। ইহারই প্রতীক্ষা কত আগ্রহে সে করিতেছিল।

এবারও সে পা টিপিয়া টিপিয়া দরজার পাশটিতে গিয়া স্বামিস্ত্রীর কথা শুনিতেছিল। কিন্তু যখন চন্দ্রনাথবাবুর মুখের চরম হুমকিতে জেলের কথা ব্যক্ত হইল, তখন বুঝি সেই ঘরের ছাদ হইতে একখানা টালি ভাঙ্গিয়া তাহার মাথার উপর পড়িল! টলিতে টলিতে বিছানায় ফিরিয়া বালিশের উপর মুখখানি গুঁজিয়া দিল, তাহার অজ্ঞাতে অবিরল অশ্রুর ভিতর দিয়া শুধু একটি আর্ত্তস্বর বাহির হইল,—মাগো!

কক্ষান্তরে অনেকক্ষণ ধরিয়াই রাত্রির ভোজন পর্ব্ব চলিল, তাহার সাড়া শব্দ এ ঘরেও আসিতেছিল; কিন্তু শোভার চক্ষুতে ঘুম নাই; ঘরের ভিতরে আলোক ছিল না, ইচ্ছা করিয়া সে দীপটী নিবাইয়া দিয়াছিল; কিন্তু সেই আঁধারের মধ্যেও তাহার চক্ষুর উপর একটি একটি করিয়া যে সকল চিত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল, সেগুলি চিনিবার জন্য কোন আলোরই প্রয়োজন তাহার পক্ষে ছিল না। এ বয়সের স্মৃতিটুকু যতদূর পর্য্যন্ত অতীতের দিকে পৌঁছিতে পারে, সে বুঝি একটা ঢেলার মতই তাহাকে জোর করিয়া শেষ সীমানা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়াছিল, তাহাতে কি সে লক্ষ্য করিয়াছে, কোন্ কাম্য বস্তুটি সর্ব্বক্ষণই তাহার দৃষ্টির উপর নানাভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কাহার আকর্ষণ তাহার জীবন-রথে টান দিয়াছে,—সে কে! সে কে! প্রতিবারই বালিকা স্পষ্ট দেখিয়াছে, সে আর কেহ নহে, সে তাহার—বিশুদা! খেলা ধূলা, পড়া শুনা, ঝগড়া ঝাঁটি, ভাব আড়ি, মারামারি—যাহাই মনে জাগিয়া উঠে, তাহাতেই ভাসিয়া উঠে—বিশুদার মূর্ত্তি!

সেই বিশুদা তাহার জেল খাটিবে? ভাবিতে ভাবিতে কতবার নিজের উপরেই তাহার রাগ ও অভিমান জাগিয়াছে; কেন সে অখিলের সহিত ভাব করিয়াছিল! ভাবই না হয় করিল, কিন্তু কেন তাহাকে খেলার মাঠে লইয়া গিয়াছিল? অখিলদা ত যাইতে চাহে নাই, কেন

সে তাহাকে জোর করিয়া সেখানে লইয়া গিয়াছিল? সমস্ত গোলের জন্য সেই দায়ী। যদি বিশুদার জেল হয়, সে ত তাহারই দোষে। কিন্তু বিশুদা যদি সত্যিই জেলে যায়, সে কেমন করিয়া লোকের কাছে মুখ দেখাইবে? যারা পাজী, বদমাস, চোর ডাকাত, তারাই ত জেলে যায়, বিশুদাও কি তাই?

এ কথার উত্তর কে তাহাকে দিবে! সকল চিন্তা তালগোল বাধিয়া এইখানে আসিয়াই স্তব্ধ হয়। বালিকার চক্ষুদুটি অমনি ডবডবিয়া উঠে, মনকে আর দমন করিতে পারে না, অশ্রুও আর শাসন মানিতে চাহে না, বালিসের উপর মুখখানা চাপিয়া এইবার সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠে, সেই বিপুল অশ্রুর আবর্ত্তে সে যেন দেখিতে পায়—কয়েদীর পোষাক পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহার বিশুদা;—হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি,—উঃ কি ভয়ঙ্কর! বিলাতী ছবির বই হইতে এমনই একটা কয়েদীর ছবি আজিই না অখিলদা তাহাকে দেখাইয়াছে,—সে ছবির চেহারাটা এখনও যে তাহার চক্ষুর উপর জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে! কেন সে মরিতে অখিলদার ঐ ছবির বইখানি দেখিয়াছিল, তাহার বিশুদাও কি ছবিটার মত জেলের কয়েদী হইবে!

২০

একটা কদর্য্য স্বপ্ন শোভার স্বল্পক্ষণের ঘুমটুকু ভাঙ্গিয়া দিল।

বিছানায় শুইয়া শুইয়া যে সব কথা সে ভাবিয়াছে, বিশুদার সম্বন্ধে যে সকল সমস্যা একটীর পর একটী উঠিয়া তাহার কোমল মনটীকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে,—অথচ কোনটীরই সমাধান হইয়া উঠে নাই; ঘুমের কোলে ঢলিয়া পড়িলেও, সেই সব ভাবনা ও সমস্যা তাহাকে রেহাই ত দেয় নাই, বরং আরও নিবিড় করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে।

বিশুদার সহিত ভাব ও মনোবাদ সম্বন্ধে কত স্বপ্নই ত সে দেখিয়াছে ; খেলা, পড়া, ছুটাছুটী, ফুল পাড়া, মালা গাঁথা, দিঘির জলে মাতামাতি যে সব নিত্যই ঘটিত, রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে তাহাদের প্রকৃত ও বিকৃত কত-রূপ ছবিই ত সে স্বপ্নের ভিতর দিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু তাহার কোনটিই ত কোন দিন গভীর হইয়া মনের পটে আঁচড় কাটে নাই. ঘুম ভাঙ্গিবা-মাত্রই কোথায় যেন সে সব কুয়াশার মত মিলাইয়া যাইত—কোনরূপ দ্বিধাই মনে জাগিত না।

কিন্তু আজ কেন এমন হইল ! আর এমন বিদঘুটে কদর্য্য স্বপ্নই বা সে দেখিল কেন ! যে স্বল্প সময়টুকু সে ঘুমাইয়াছে, কেবল দুইটী মানুষকে লইয়া তাহার দ্বন্দ্ব চলিযাছে। তাহাদের একটী বিশুদা, অন্যটি নবাগত আত্মীয় অখিল। এই দুইটী ছেলের পাল্লায় পড়িয়া স্বপ্নের ভিতর দিয়া কি ভোগান্তিই না তাহার গিয়াছে ; কত হাসি, কত কান্না. কত রকমের ঘাত-প্রতিঘাত তাহাকে সহিতে হইয়াছে ; স্বপ্নের সে সব ঘটনা যদিও ঘুম ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির রাস্তা ছাড়িয়া এলোমেলো ভাবে সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু শেষের ঘটনাটা যেন সুস্পষ্ট হইয়া রাস্তা যুড়িয়া দাঁড়া-ইয়াছে। ঘুমাইবার পূর্ব্বে জেল হইবার সম্ভাবনায় বিশুদার হাতে হাত কড়ি, পায়ে বেড়ি ও কোমরে দড়ি বাঁধার কথা মনে উঠিতেই ছবির বইয়ে দেখা কয়েদীর ঐরূপ যে ছবিটি তাহার চক্ষুর উপর ফুটিয়া উঠিয়াছিল, স্বপ্নে দেখিল, তাহারই সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। মস্ত একখানা গাড়ী, তাহার ঘোড়া দুইটা যেমন বড়, তেমনই মিসমিসে কালো ; সেই গাড়ীখানার ভিতরে সে বসিয়া আছে, হাত দুইখানি তাহার দড়ি দিয়া বাঁধা, পাশে বসিয়া অখিল ; দুইহাতে সে শোভার মুখখানি চাপিয়া ধরিয়াছে, চেঁচাইবার জন্য তাহার কি চেষ্টা, কিন্তু কিছুতেই মুখ দিয়া কথা ফুটিতেছে না। একে অখিলের হাতের চাপুনী ও চোখ রাঙ্গানি, তাহার উপর

আবার তাহাদের সামনের ছেলেটির শাসানী ; সে ছেলেটির চোখ দুটি যেন জ্বলন্ত আঙ্গরা, আর তাহার হাতে একখানা কি প্রকাণ্ড ছোরা! সে রকম চেহারার ছেলে সে কখনও দেখে নাই। গাড়ী ছুটিয়াছে, হঠাৎ সে দেখিতে পাইল, চলন্ত গাড়ীখানার পিছু পিছু বিশুদা ছুটিয়া আসিতেছে। অমনই বুকখানা তাহার আশা উল্লাসে দুলিয়া উঠিল, কিন্তু যেমন সে অখিলের হাত ছাড়াইয়া উঠিতে যাইবে, অমনই সামনের ছেলেটি ছোরাখানা তাহার বুকে দিল বসাইয়া! ইহার পরও ঘুমের ঘোর কি আর থাকিতে পারে?

ধড়মড় করিয়া যখন সে উঠিয়া বসিল, তখন ঘামে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে ; ঠক ঠক করিয়া তখনও তাহার কি কাঁপুনি! দুই হাতে চোখ দুইটি রগড়াইয়া সে চারিদিকে চাহিতেই বুঝিল, স্বপ্ন দেখিয়াছে ; কিন্তু একি বিশ্রী স্বপ্ন! উঃ—কি ভয়ানক!

তখন ভোর হইয়াছে, কিন্তু বড়বাড়ীর অনেকেরই ঘুম তখনও ভাঙ্গে নাই। শোভা কি ভাবিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে পূজার দালানটীর উদ্দেশে চলিল।

বড়বাড়ীর অতিকায় দেউড়ী ও তৎসংলগ্ন দালানযুক্ত বাহিরের ঘরগুলির পরেই বিশাল পূজার দালানটি এখানকার অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিবার জন্য এখনও জরাজীর্ণ অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সারিবন্দী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খিলানগুলির অপূর্ব্ব কারুকার্য্যের অধিকাংশই যদিও কালের প্রচণ্ড আঘাতে ও অযোগ্য বংশধরদের অবহেলায় বিলয় পাইয়াছে, তথাপি এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা হইতেই ইহার অতীত প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সুউচ্চ সুবিস্তীর্ণ বিশাল দালান, মধ্যস্থলে দেবী প্রতিমার অধিষ্ঠান হইলেও দুই পার্শ্বের আয়তন এত বৃহৎ যে, পূজার প্রচুর উপচারাদি রাখিয়াও দুই তিন শত পুরমহিলার অবস্থিতি অনায়াসেই

সম্ভবপর। ইহার সম্মুখেই দরদালান; দেওয়ালে কালোপযোগী কারু-কার্য্যের নিদর্শন। দরদালানের নিম্নেই সোপানশ্রেণী প্রাঙ্গনে আসিয়া নামিয়াছে। প্রাঙ্গনটিও দালানের উপযুক্ত বিশাল ও সৌষ্ঠব সম্পন্ন, —দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে এখনও এ বাড়ীর বারোমাসে তেরো পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া, প্রাঙ্গনটি এ পর্য্যন্ত ভাগীদারদের বণ্টনরজ্জুর বন্ধন পরে নাই। এই সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনের প্রায় চারিধারেই চক মিলানো দ্বিতল হর্ম্মশ্রেণী, পূজার দালান ও প্রাঙ্গনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এই মহল্লাটি যে ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক সৌন্দর্য্যপ্রিয় দর্শককে মুক্তিকণ্ঠেই নির্ম্মাতাদের রুচি ও সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রশংসা করিতে হইবে।

এই পূজার দালান ও তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গনটি এ পর্য্যন্ত বড়বাড়ীর অসংখ্য সরিকদের সমক্ষে বুঝি সমানাধিকারবাদের প্রতীকরূপেই খাড়া হইয়া আছে। সুতরাং সরিকানি মনোবিবাদ এখানে কোনও প্রকার বাধার বৃতি রচনা করিতে পারে নাই। পরস্পরের মধ্যে যাহাদের সম্প্রীতি আছে, তাহারাও যেমন অসঙ্কোচে এখানে আসে, বসে, গল্প গুজব করে,—পক্ষান্তরে পরস্পরের মধ্যে মুখদেখাদেখি পর্য্যন্ত যাহাদের নাই, তাহারাও অধিকার সূত্রে এখানে আসিয়া থাকে এবং মুখ ঘুরিয়া বসিয়া সকল আলোচনায় যোগ দেয় বা কথা প্রসঙ্গে প্রতিযোগিদের উপর ঠেস দিয়া কথার শব্দভেদী বাণ চালাইয়া গায়ের জ্বালা মিটায়।

শোভা আস্তে আস্তে আসিয়া যখন পূজার দালানে উঠিয়া উপরের সিঁড়িটিতে পীঠ দিয়া বসিল, তাহার ত্রীসীমায় তখন কেহ ছিল না। কোনও খারাপ স্বপ্ন দেখিলে, তুলসী মঞ্চের নিকট দাঁড়াইয়া বাসিমুখেই স্বপ্নের কথা শুনাইতে হয়, এই তথ্যটুকু তাহার জানা ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই সে বাহিরে আসিয়াছিল। কিন্তু স্বপ্নে দেখা মূর্ত্তিগুলি তাহার

মনটির ভিতর তখনও এমনই নাড়াচাড়া দিতেছিল যে, আসল উদ্দেশ্যটুকুই সে ভুলিয়া গেল এবং স্বপ্নের বিষয় বস্তুটিই তাহার একমাত্র আলোচ্য হইয়া উঠিতেছিল,—আচ্ছা, ছোরা হাতে ঐ লোকটা কে? বিশুদার মত ত নয়ই, অখিলদার মতও তাহার চেহারা নয়, ওদের চেয়েও বড় নিশ্চয়ই, কিন্তু বড় হলেও গোঁফ ত নেই, দাড়ীও নেই, মাথায় মাথায় এদেরই মত, কিন্তু চোখ দুটো যেন কি, আর মুখখানাও কি রকম চ্যাপ্‌টা! হাতে আবার ছোরা, সেটা আমার বুকে বিঁধিয়ে দিলে ঐ দস্যিটা—মাগো! বিশুদা যেন দেখতে পেয়ে ছুটে ছুটে আসছিল, কিন্তু আসবার আগেই ঐ মুখপোড়াটা—

শোভার চিন্তা এইখানে সহসা ভাঙ্গিয়া গেল অখিলের কথায়!

—এই যে, রাজকন্যের ঘুম ভেঙ্গেছে দেখছি, তবু ভালো!

শোভা চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, উঠানের এক পার্শ্বে বাড়ীর ভিতরে যাইবার গলিটির মুখে দাঁড়াইয়া অখিল, মুখখানি তাহার অতিশয় গম্ভীর; অথচ এই গম্ভীর মুখ দিয়াই তাহার উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের মর্ম্মভেদী স্বর বাহির হইয়াছে। অন্য সময় হইলে শোভার মত অভিমানিনী মেয়ে কখনই ইহা সহ্য করিত না, সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা জবাব দিত অথবা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু আজ তাহার মনের ভিতর যে সমস্যা বিষম ঝঞ্ঝা তুলিতেছিল, তাহাতে অখিলের উক্তি বুঝি সেখানে স্থান পাইল না, তাই সে অখিলের কথাগুলি যেন উড়াইয়া দিয়াই চিন্তা বিষণ্ণ মুখখানাকে কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল করিয়া কহিল,—আচ্ছা অখিলদা, তুমি বলতে পার, স্বপ্ন কি কখনো সত্যি হয়?

অখিল তাহার কথার উত্তরে হঠাৎ এরূপ একটা কঠিন প্রশ্ন শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। শোভার কল্যকার আচরণে সে ক্ষুব্ধ হইয়াই ছিল। তাহার আহত মুখখানায় ব্যাণ্ডেজ পড়িল, কিন্তু শোভা তাহার ক্ষতস্থানে

আইডিনের প্রলেপ দিবার প্রয়াস উপেক্ষা করিয়া যখন এক রকম ছুটিয়া চলিয়া গেল, তখন হইতেই অখিলের মনে একটা উষ্মা জাগিয়াছিল, প্রথম দর্শনে তাহারই রেশটুকু সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু শোভা তাহা গায়ে না মাখিয়া এই প্রশ্ন করায় অখিলের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক হইবারই কথা। ক্ষণকাল মনে মনে কি ভাবিয়া শোভার প্রশ্নটার সে উত্তরই দিল ; কহিল,—কেন, বইয়ে ত লেখা আছে—স্বপ্ন অমূলক চিন্তা-মাত্র ; পড়নি ?

শোভা কহিল,—তাহলে আমি কাল রাত্তিরে যে সব স্বপ্ন দেখিছি, সব মিথ্যে ?

অখিল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—কি স্বপ্নটা দেখেছ বলই না শুনি।

কথাগুলি শোভার মনে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিল, সে সহসা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—ঐ যাঃ, আসলেই ভুল করে মরিছি।

অখিল জিজ্ঞাসা করিল,—কি হল ?

শোভা কহিল,—খারাপ স্বপ্ন দেখলে বাসিমুখে তুলসীগাছকে শোনাতে হয়। বিছানা ছেড়েই তাই না সোজা এসেছিলুম পূজোর দালানে, তার পর আর হুঁস্ নেই।

অখিল মুখে উপহাসের ভঙ্গী আনিয়া কহিল,—গাছ বুঝি মানুষের কথা শোনে ?

শোভা ইহার উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পশ্চাতে তৃতীয় কণ্ঠের খিল্ খিল্ হাসি তাহাতে বাধা দিল। মুখ ফিরাইয়া সবিস্ময়ে সে দেখিল, কুসুম তাহার ঠিক পিছনে দাঁড়াইয়া ঐ রকম করিয়া হাসিতেছে। তাহার কথাটাকে উপলক্ষ করিয়াই যে এই হাসি, তাহা বুঝিতে শোভার বিলম্ব হইল না! মুহূর্তে তাহার মুখখানা রীতিমত ভার হইয়া উঠিল।

কুসুম বুঝিল, তাহার হাসিটা এবং এখানে আসাটা শোভার ভাল লাগে নাই কিন্তু শোভাকে আঘাত দিবার এ সুযোগটুকু সে ছাড়িতে পারিল না, অখিলের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে সে কহিল,—নতুন এখানে এসেছ তুমি, নতুন কথাই শোন না—গাছ কথা শোনে, এর পরে হয় ত শুনবে, মানুষের মতই ওরা চলে হেঁটে বেড়ায়।

অখিল হাসিল, কোনও উত্তর দিল না। কিন্তু শোভার মুখখানা হঠাৎ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রখর করিয়া কুসুমের দিকে চাহিয়া কহিল,—তুই খামকা গায়ে পড়ে কথা কচ্ছিস কেন্ লা?

আবার পূর্ব্ববৎ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া কুসুম কহিল,—শুনলে ত অখিল দা মেয়ের কথা, পাড়াগেঁয়ে স্বভাব যাবে কোথায়, এখনো 'লা' ছাড়া কথা নেই; দূর্ দূর্!

শোভার রাগ তখন সীমা অতিক্রম করিয়াছে। কণ্ঠের স্বর আরও কঠোর করিয়া সে কহিল,—আমার খুসী, তোর সঙ্গে ত আমি সেধে কথা কইতে যাই নি,—তুই আমার কথায় ঠোকর দেবার কে,—ভারি আমার সহুরে মেয়ে এসেছেন?

কুসুম এবার মারমুখী হইয়া একেবারে শোভার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া হুমকী দিল,—বিশুদা কাল তোর কপালখানা ছেঁচে দিয়েছে, আমি আজ জীবখানা তোর ভোঁতা করে দেব।—

কথার সঙ্গে সঙ্গেই সে সবেগে আগাইয়া গিয়া শোভার গলাটি দুই হাতে চাপিয়া ধরিল।

বিপুল ক্রোধে বুঝি শোভার শক্তি আজ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সে একটা ঝটকা দিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া সোপান শ্রেণীর দিকে ছুটিল। ইচ্ছা, উঠানে নামিয়া অখিলের কাছে যাইবে। কিন্তু সে অবসর কুসুম

তাহাকে দিল না। সিড়ীর তৃতীয় ধাপটিতে পা দিতেই কুসুম ক্ষিপ্রহস্তে শোভার পীঠের এলায়িত চুলগুলি ধরিয়া সজোরে দালানের দিকে টানিল। সেই অবস্থায় শোভার কণ্ঠ দিয়া আর্ত্তস্বর উচ্ছ্বসিয়া উঠিল,—মাগো !

অখিল স্তব্ধ, মুখে তাহার কথা নাই। পূর্ব্বদিনের দুর্ঘটনায় স্ফীত ঠোঁট দুইটি যদিও আজ স্বাভাবিক অবস্থা পাইয়াছে, কিন্তু ব্যথা একেবারে নিঃশেষ হয় নাই। আজ আবার আর এক কাণ্ড উপস্থিত ! পূর্ব্বদিনের অবস্থার স্মৃতি বুঝি তাহাকে স্তব্ধ করিয়া দিল,—সুতরাং ইহাতে যোগদান করিতে কোনওরূপ উৎসাহ তাহার দেখা গেল না।

কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই চতুর্থ প্রাণীর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব উপস্থিত তিনটি প্রাণীকেই যেমন যুগপৎ স্তম্ভিত করিয়া দিল, ঘটনার স্রোতও তাহাতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

যাহাকে আজ পূজার দালানের ত্রিসীমাতেও দেখা যায় নাই বা যাহার আবির্ভাব কেহ কল্পনাও করে নাই, সেই অবাঞ্ছিত বালকটি যেন বাঘের মত দুই বালিকার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

কুসুমের আকর্ষণে শোভার অবস্থা এমন সাঙ্ঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, আততায়ীর হস্তচ্যুত হইলেও সাত আটটা সিঁড়ি টপকাইয়া তাহাকে উঠানের উপর ঠিকরাইয়া পড়িতে হয়। বিশু এ অবস্থাটুকু লক্ষ্য করিয়াই যেন দুইজনের মাঝখানে পড়িয়া দুইহাতে দুইজনকেই ধরিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত তফাৎ করিয়া দিল। তাহার এই সতর্কতার জন্য শোভাও ঠিকরাইয়া নীচে পড়িল না, কুসুমও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে ইচ্ছানুরূপ কাবু করিবার আর ফুরসৎ পাইল না।

শোভার হাতখানি ধরিয়া বিশু তাহাকে আস্তে আস্তে সোপানপথে উঠানের দিকে ঠেলিয়া দিল এবং যাহাতে কুসুম পুনরায় তাহাকে আক্রমণ করিতে না পারে, তজ্জন্য যেন দৃঢ় হইয়া মধ্যপথে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কথা নাই কিন্তু তিনটি বালক বালিকার বদ্ধদৃষ্টি বিশুর দিক হইতে ফিরিল না।

কুসুমই প্রথমে কথা কহিল। মুখখানা বিকৃত করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—তুমি কি ভেবেছ শুনি

বিশু উত্তর দিল,—কি আবার ভাবব?

কুসুম কহিল,—কাল না দাঙ্গা করে জেলের দিকে পা বাড়িয়েছ, আজ কোন মুখে ফের মারামারি করতে এলে, তুমি?

বিশু কহিল,—আমি কি মারামারি করতে এসেছি?

কুসুম ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—কি করতে এখানে এসেছ শুনি? কে তোমাকে ডেকেছিল আসতে?

বিশু কহিল,—একটা পুঁয়ে পাওয়া মেয়েকে তুমি পিটছিলে, সেটাকে বাঁচাবার জন্যেই আমাকে আসতে হয়েছে।

কথাটা শুনিবামাত্রই কুসুম খিল্ খিল্ করিয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে অখিলকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—বুঝতে পারলে বিশুদার কথা, তোমার সঙ্গে শুভির ভাব হয়েছে কিনা, তাই বললে—ওটাকে পুঁয়ে পেয়েছে। কথার শেষে আবার তাহার সেই হাসি।

শোভা এতক্ষণ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বিশু তাহাকে উঠানের দিকে ঠেলিয়া দিলেও সে সেদিকে পা দুখানি চালনা করে নাই, মুখখানি ফিরাইয়া ঠায় দাঁড়াইয়া তাহার বিশুদার দিকে চাহিয়াছিল, তাহার দৃষ্টিতে শুধু প্রশংসার প্রকাশ ছিল না, গত রাত্রের স্বপ্নও তাহাতে সংশয় বাধাইয়াছিল, সে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াও ঠিক করিতে পারিতেছিল না—স্বপ্নে বিশুদার ঠিক এই চেহারাই দেখিয়াছিল কি না?

এমন সময় তাহার সম্বন্ধে বিশুদার মুখের নির্ঘাত নির্দ্দেশ তাহার

বুকে যেন হাতুড়ীর ঘা দিল। সঙ্গে সঙ্গে কুসুমের তীক্ষ্ণ হাসি ও অখিলকে লক্ষ্য করিয়া কয়টি কঠোর উক্তি ঠিক যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত জ্বালা ধরাইয়া দিল। রাগে অপমানে ও অভিমানে তাহার মুখখানা এক নিমেষে লাল হইয়া উঠিল। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কুসুম ও বিশুর দিকে চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ মুখখানা ফিরাইয়া লইতেই অখিলের সহিত তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল, ঠিক এই সময় অখিল তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিল।

মনে মনে তখনই কি একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া লইয়া শোভা এক রকম ছুটিয়া অখিলের কাছে গেল এবং তাহার একখানা হাত জোর করিয়া ধরিয়া কহিল,—চল অখিল দা, আমরা যাই; ভুয়ে-পেত্নীর খপ্পরে পড়ার চেয়ে পুঁয়ে পাওয়া ঢের ভাল।

অখিলও সরিয়া পড়িবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তেই উভয়ে অন্দর মহলের পথে অদৃশ্য হইল।

কুসুম ঠোঁঠের কোনে একটা চাপা হাসির ঝিলিক তুলিয়া বিশুর দিকে চাহিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বিশুর কথা কয়টি শোভার ক্ষুদ্র বুকটির উপর যেমন হাতুড়ীর ঘা দিয়াছিল, এখন শোভার অভিব্যক্তি ও কুসুমের হাসি তাহার সর্ব্বাঙ্গে জল-বিছুটির জ্বালা ধরাইয়া দিল কি?

২১

গল্পে আছে, একদা এক পর্ব্বতের প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়। পর্ব্বত ত গর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করিয়া দিল; দেব দানব যক্ষ নর যে যেখানে ছিল, ছুটিয়া আসিল; সকলেই ভাবিয়া আকুল, না জানি পর্ব্বত কি বিরাট আকারের সন্তান প্রসব করে? কিন্তু অবশেষে আকাশভেদী গর্জ্জনের পর পর্ব্বত প্রসব করিল একটি ক্ষুদ্র মুষিক!

বিশুকে লইয়া বড়বাড়ীতে যে হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছিল, চন্দ্রনাথবাবু সেটিকে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া এত বড় ও ভয়াবহ করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, সমস্ত অঞ্চলটা ব্যাপিয়া একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, সবাই বিপুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল, কি হয় কি হয় রণে জয় পরাজয় !

কিন্তু চন্দ্রনাথবাবুর বিবিধ তোড়জোড়, প্রচুর প্রয়াস, যথেষ্ট অর্থব্যয় ও বিপুল তদ্বির সত্ত্বেও গুটি তিনেক শুনানীর পর এত বড় সঙ্গীন মামলাটির যে ভাবে নিষ্পত্তি হইল, তাহাতে পর্ব্বতের প্রসববেদনা ও তৎপরে একটি ক্ষুদ্রকায় মূষিক প্রসবের সহিত অনায়াসেই ইহার উপমা দেওয়া চলে।

আনন্দপুর গ্রামখানি আলিপুর মহকুমার এলাকাধীন, সুতরাং আলীপুরের পুলিস কোর্টেই মামলাটি দায়ের হইয়াছিল। বিচারক ছিলেন জনৈক প্রবীণ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

উভয় পক্ষই আদালতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বাহির-আনন্দপুরের প্রাপ্তবয়স্ক প্রায় সকল মুসলমান পূর্ব্ব হইতেই আদালতের সুবিস্তীর্ণ হাতায় সমবেত হইয়াছে। আসামী বিশু ও তাহার পক্ষভুক্তগণকে দেখিবামাত্রই তাহারা এমন আন্তরিকতার সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিল যে, কে বলিবে এই ছেলেটি ইহাদেরই অতি আপনার জন নহে, ইহার সহিত এতগুলি প্রাণীর প্রাণের যোগসূত্র দৃঢ়ভাবেই রচিত হয় নাই। পুলিস যখন বিশুকে আসামীর কাঠগড়ায় হাজীর করিবার জন্য লইতে আসিল, ডাক পড়িল এবং বিশু ধীরে ধীরে বিচারক হাকিমের এজলাসের দিকে চলিল, তখন তাহারই চারিপার্শ্বে সমবেত প্রায় তিন শত দরদীর খোদার উদ্দেশে কি আকুলি ব্যাকুলি প্রার্থনা! ওয়ারিস ওস্তাগর বরাবর বিশুর কাছেই ছিলেন, তিনি এই সময় তাহার চিবুকটি ধরিয়া স্নেহের সুরে কহিলেন,—তিন ওক্ত নামাজে খোদার কাছে তোমার জন্যে দোওয়া মেগেছি বাবজান, সটান চলে যাও, কুছপরোয়া নেই।

আদালতে আসিবার সময় আনন্দপুরের ষ্টেশনে রহিম আসিয়া বিশুর সহিত দেখা করিয়াছিল, কত ভরসা, কত সাহস, কত আশ্বাসই সে দিয়াছিল। শেষে যে কথাটি বিশুকে সে শুনাইয়া গেল, তাহাতে বিশুকে স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে হইয়াছিল, এরা আমার জন্যে করছে কি?

রহিমের শেষের আশ্বাসটুকু এই যে, পরি চিঠিতে সব কথা লিখিয়া তাহাদের পিতার নিকট কলিকাতায় লোক দিয়া পাঠাইয়াছে। তিনি কখনই চুপ করিয়া থাকিবেন না, নিশ্চয়ই আদালতে বিশুর সহিত দেখা করিবেন।

আদালত বসিতেই প্রথমে বিশুর মামলা উঠিয়াছিল; আদালতের সহিত বিশুর এক দিনের মাত্র পরিচয়, একবার আলিপুরের পশুশালা দেখিয়া সে ফৌজদারী মামলার বিচার দেখিতে এক হাকিমের এজলাসে আসিয়াছিল। সে দিন এক খুনী আসামীর বিচার তখন চলিতেছিল, বিশুর সমক্ষেই সেদিন তাহাকে দায়রায় সোপরদ্দ করা হয়। তখন সে ক্ষুব্ধ হইয়াই আপন মনে বলিয়াছিল,—কত পাপ করলে তবে ঐখানে গিয়ে মানুষকে দাঁড়াতে হয়! কিন্তু সে দিন কি সে ভুলিয়াও ভাবিতে পারিয়াছিল—একদিন ঐ কাঠগড়ায় তাহাকেও দাঁড়াইতে হইবে?

বিচারক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এই অপূর্ব্ব আসামীর আপাদ মস্তক দেখিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কোর্ট ইন্সপেক্টারের দিকে চাহিলেন।

চন্দ্রনাথবাবু ইতিমধ্যেই সরকারী উকীলকে তালিম দিয়া মামলার গতিপথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘ ভূমিকার সহিত আসামীর অনুষ্ঠিত অপরাধের এক বিবৃতি দিলেন। যদিও আসামী বালক, কিন্তু এই শ্রেণীর বালকদের ঝাঁঝটুকু ধানি-লঙ্কার মত, বিবিধ দৃষ্টান্তসহ তাহাও তিনি ব্যক্ত করিলেন।

আসামীর তরফে দুইজন বিচক্ষণ মোক্তার দাঁড়াইয়াছিলেন। চার্জ্জ

গঠন সম্বন্ধে তাহাদের সহিত বিতর্ক উঠিলেও চন্দ্রনাথ বাবুর অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হইল। আসামীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে দুইটি মারাত্মক চার্জ্জ গঠিত হইয়া গেল। অতঃপর ফরিয়াদীপক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দীর জন্য পরবর্ত্তী দিন ধার্য্য হইলে আসামীর জামীন সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিল। ফরিয়াদী পক্ষ হইতে জামীনের বিরুদ্ধে তুমুল আপত্তি উঠিলে বিচারকও বিচলিত হইলেন। চন্দ্রনাথ বাবু জামীনের প্রতিকূলে এমন সব সমীচীন নজীর যোগান দিতেছিলেন যে, এরূপ অবস্থায় জামীন দেওয়া সম্বন্ধে দ্বিধা স্বাভাবিক। কিন্তু ঠিক এই সময় এই আদালতে হাইকোর্টের স্বনামখ্যাত কৌন্সলী দাস সাহেবের উপস্থিতি সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিল। আইন-জগতের দিকপাল স্বরূপ এই অসামান্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষটির এইরূপ আকস্মিক আবির্ভাবে একটা চাঞ্চল্য উঠিবারই কথা। কিন্তু তিনি বরাবর হাকিমের এজলাসের দিকে অগ্রসর হইয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন,—যে আসামীর বিচার চলছে, তারই পক্ষ সমর্থন করতে আমি এই আদালতে এসেছি।

ব্যারিষ্টার দাস সাহেবের নাম তখন বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পরিচিত, তাঁহার সম্বন্ধে কত প্রবচনই সৃষ্ট হইয়া লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছিল। বিশুও এই বিখ্যাত নামটির সহিত অপরিচিত নহে, কাঠগড়া হইতেই পেস্কার ও উকীলদের মুখে এই নাম শুনিয়াই সে আগন্তকের দিকে চাহিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই যখন সে শুনিল, এই বিখ্যাত লোকটি এই মামলাটির সংস্রবেই এখানে উপস্থিত, তখন সে অতি বিস্ময়ে যেন অভিভূত হইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে আসামীর পক্ষসমর্থন সম্পর্কে আসামী-পক্ষের উকিলদের সহিত দাস সাহেবের অল্প আলোচনার অবসরে বিস্মিত বিশু তাঁহাদের নিকট ওয়ারিস ওস্তাগর এবং আর একজন সৌম্যমূর্ত্তি সম্ভ্রান্ত মুসলমানকে

দেখিয়াই বুঝিল, এ যোগাযোগের মূলে কে? যদিও উক্ত সৌম্যমূর্ত্তি মানুষটির মুখে ওয়ারিস সাহেবের মত সুদীর্ঘ শ্মশ্রু ছিল না, কিন্তু তাঁহার মাথার তুরস্কদেশীয় মূল্যবান টুপীটি দেখিয়াই মনে মনে সে সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছিল, তিনিই রহমন সাহেব, রহিম ও পরির স্নেহময় পিতা। কন্যার চিঠি পাইয়াই তিনি ব্যারিষ্টার দাস সাহেবকে লইয়া আদালতে ছুটিয়া আসিয়াছেন। আনন্দের আবেগে বিশুর দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল, ষ্টেশনে রহিমের আশ্বাসবাণী তাহার দুই কর্ণে যেন শঙ্খধ্বনির মত বাজিয়া উঠিল। একদিনের ঘনিষ্ঠতায় এমন অকৃত্রিম ইহাদের স্নেহ!

আসামীর জামীনের বিরুদ্ধে ফরিয়াদীপক্ষের সকল আপত্তি একটি একটি করিয়া খণ্ডন করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নজীর দেখাইয়া ব্যারিষ্টার দাস কহিলেন,—কলিকাতার একজন সরকারজানিত ব্যবসায়ী এই আসামীর জামীন হতে এসেছেন। তিনি আমার মক্কেল এবং বন্ধু, সুতরাং এই আসামীর সম্বন্ধে যে কোন দায়িত্ব নিতে আমিও প্রস্তুত।

বিচারক তৎক্ষণাৎ আসামীর জামীন মঞ্জুর করিলেন এবং নির্দ্দেশ দিলেন যে, এই আদালতের বিশ্বাসযোগ্য যে কোন জামীনই যথেষ্ট। সুতরাং যে দুইজন মোক্তার আসামীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বিশুর অনুকূলে জামীন নামায় দস্তখত করিলেন।

চন্দ্রনাথ বাবু ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছিলেন, কিছুতেই এ দিন তিনি বিশুকে জামীনে মুক্ত হইতে দিবেন না, অন্তত একটি রাতও তাহাকে হাজতে বাস করাইয়া ছাড়িবেন। এ সম্বন্ধে নানাদিক দিয়া নানাবিধ যোগাড়যন্ত্রই তিনি করিয়াছিলেন কিন্তু ব্যারিষ্টার দাস সাহেবের আকস্মিক উপস্থিতি তাঁহার এত বড় সাধে বাদ সাধিল। তাঁহারও মনে তখন এই প্রশ্ন জাগিতেছিল, এই যোগাযোগ ঘটাইল কে? কিন্তু হঠাৎ ওয়ারিস

সাহেবের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তাঁহার দুই চক্ষু যেন বিস্ফারিত হইয়া গেল।

উভয় পক্ষ বাহিরে আসিলে রহমন সাহেব ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন,—আমাদের আসামী কই?

বিশু পিছনে পড়িয়াছিল, তাড়াতাড়ি এই শ্রদ্ধাভাজন মানুষটির সম্মুখে গিয়া শ্রদ্ধাভরে অভিবাদন জানাইল।

রহমান সাহেব তাহাকে একেবারে কোলের দিকে টানিয়া লইয়া কহিলেন,—সাবাস্! তুমি যখন রহিমের বন্ধু, আমার ছেলেরই সামীল মনে করি তোমাকে। পরি আমাকে পাঁচপাতা চিঠিতে তোমার সব কথাই লিখে জানিয়েছে। কিছু তোমার ভয় নেই, তুমি বেকসুর খালাস পাবেই।

বিশু কহিল,—আমার জন্য আপনারা কত কষ্ট পেলেন, কত খরচ পত্তর আপনার হয়ে গেল!

ওয়ারিস সাহেব উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন,—কথা শোন বাচ্চার!

রহমন সাহেব কহিলেন,—তবে আমার কথা শুনলে কি? বললুম না, রহিমের বন্ধু, তাই তাতে আর তোমাতে ভেদ নেই। তার জন্যে যা করা উচিত, তোমার জন্যও সেই রকম যদি কিছু করি, তাতে কষ্ট হবে কেন?

বিশু মুখখানি নীচু করিয়া কহিল,—আমি ভুল করেছি, আমাকে মাপ করবেন। আমার বাবা নেই, আজ থেকে মনে করব—তাঁরই মতন মাথার ওপর আপনি আছেন, আর আছেন ঐ স্নেহময় কাকু!

হাসিমুখে রহমান সাহেব কহিলেন,—কাকু? বাঃ, তাহলে তোমার সঙ্গেও ঠিক সম্পর্ক পাতিয়েছে আমার এই ছেলেটি, কি বল ওস্তাগর?

ওয়ারিস সাহেব কহিলেন,—বেসক্! মোর পরি মায়ী সব কথাই ত তোমাকে নিকেছে দোস্ত!

এই সময় দেখা গেল, চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার পক্ষদের সহিত সেই স্থান অতিক্রম করিতেছেন। ওয়ারিস সাহেব চুপি চুপি এই সময় রহমন সাহেবকে কি বলিলেন। পরক্ষণেই দেখা গেল, রহমন সাহেব দ্রুতপদে চন্দ্রনাথ বাবুর অভিমুখে ছুটিয়াছেন।

ওয়ারিস সাহেবও ক্ষিপ্রপদে বন্ধুর অনুসরণ করিলেন। বিশু একটু তফাতেই দাঁড়াইয়া রহিল।

রহমন সাহেব একেবারে চন্দ্রনাথ বাবুর সম্মুখে গিয়া তাঁহার গতি-রোধের উদ্দেশে হাতখানা ললাটের দিকে তুলিয়া কহিলেন,—সেলাম!

চন্দ্রনাথ বাবু থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রহমন সাহেবের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুখে তাঁহার বাণী না ফুটিলেও চক্ষুর প্রখর দৃষ্টি বুঝি তাঁহার প্রশ্নটা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া দিল।

এই সময় ওয়ারিস সাহেব উভয়ের সান্নিধ্যে আসিয়া এই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দিলেন। তিনি চন্দ্রনাথ বাবুর উদ্দেশে সসম্ভ্রমে সেলাম জানাইয়া বিনয়ের সুরে কহিলেন,—হুজুর, সেলাম।

ওয়ারিস সাহেবকে দেখিবামাত্রই হুজুর জ্বলিয়া উঠিলেন। এই লোকটিকে লইয়া গত রাত্রির ঘটনা এত শীঘ্র ভুলিবার কথা নয়। বিশেষতঃ বর্ত্তমান মামলার ব্যাপারে মুসলমানদের এতটা ঘনিষ্ঠতার সহিত এই বর্ষীয়ান অশিক্ষিত ওস্তাগরটির সংস্রব যে বিশেষ ভাবে বিদ্যমান, চন্দ্রনাথ বাবু ইতিপূর্ব্বেই তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং ওয়ারিস সাহেবের প্রতি তাঁহার চিত্ত বিরুদ্ধ হইয়াই ছিল। মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া রুক্ষকণ্ঠে তিনি কহিলেন,—তোমার কি খবর?

ওয়ারিস সাহেব কহিলেন,—খবর মোর নয় হুজুর, এনার। নাম হয় ত হুজুরের শোনা থাকতি পারে, ভারি নামী কারবারী, রইস

আদমী,—হুজুরেরই তালুকে তিন বন্দর বাইশ বিঘের চরটা আরজান মোল্লার কাছ থেকে প্রজাই সত্ব কিনে বাগান ইমারত বানিয়েছেন—

ইতিমধ্যেই চন্দ্রনাথ বাবুর পিছু পিছু বড় বাড়ীর যে কয়টি উমেদার তাঁহার পারিষদস্থানীয় হইয়া ফিরিতেছিল, তাহাদেরই একজন ওয়ারিস সাহেবের কথা সম্পর্কে তাঁহার কাণে কাণে এমন কতিপয় কথা শুনাইয়া দিল যে, তাহাতে অধৈর্য্য হইয়া তিনি হঠাৎ কহিয়া উঠিলেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানে এসেই আমি সে খবর পেয়েছি; একটা বাকিদার প্রজার জোত সত্ব কিনে আমারই তালুকে আবু হোসেনের বাদসাহী চলেছে, আর আমাদেরই গোটা কতক চুনোপুঁটি শরিকের যোগ-সাজসে এ কায হয়েছে। কিন্তু এ আমি বলে দিচ্ছি, ওরা যাই করুক, আমি কিন্তু একটুও টলছি না—আমার সেয়ারের খারিজ আমি কিছুতেই দিচ্ছি না—লাখ টাকা দিলেও নয়।

শেষের কথাগুলি চন্দ্রনাথ বাবু রহমন সাহেবের দিকে চাহিয়া তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া কহিলেন।

ওয়ারিস ওস্তাগর অবাক ও অপ্রস্তুত হইয়া রহমন সাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন। কিন্তু রহমান সাহেব কিছুমাত্র উষ্ম না হইয়া ঈষৎ হাসিয়া অতিশয় কোমল কণ্ঠেই কহিলেন,—মিছে আপনি জমির কথা তুলছেন; আমার কেনা জমির খারিজের কথা বলবার জন্য আমি এখানে আপনাকে সেলাম করে থামাই নি।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—তবে?

রহমন সাহেব কহিলেন,—আমার অন্য কথা আছে।

উদ্ধত ভাবে চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—রাস্তায় দাঁড়িয়ে জমিদার কোন প্রজার কথা শোনে না, তা সে প্রজা যেই হক।

এ আঘাতও উপেক্ষা করিয়া রহমন সাহেব পূর্ব্ববৎ হাসিয়া কহিলেন,

—এখানে ত জমিদারের সঙ্গে প্রজার কথা হচ্ছে না; তাহলে নিশ্চয়ই একটা নজরানার ব্যবস্থা করা হত। এই মাত্র যে মকদ্দমাটার মুলতুবী হল, আমি সেই সম্বন্ধেই আপনার সঙ্গে দুচারটে কথার আলোচনা করতে চাই—আপনিও মানুষ আমিও মানুষ, এই সম্পর্ক নিয়ে; শুনবেন?

চন্দ্রনাথ বাবু অবজ্ঞার ভঙ্গীতে প্রশ্ন করিলেন,—আলোচনাটা কি?

রহমন সাহেব কহিলেন,—আলোচনাটা এই যে, মামলাটা যাতে মিটে যায়, তারই একটা ব্যবস্থা করা। আপনারই ঘরের ছেলে, ওকে জেলে দেবার জন্যে আপনার কি এমন করে কোমর বাঁধা ঠিক হচ্ছে? ঈশ্বর না করুন, যদি কোনো ক্ষতিই ওর হয়, আপনার গায়ে লাগবে না? যদি ছেলেটা শাস্তি কিছু পায়—তাতে ও দাগী হয়ে থাকবে না, ওর আখের তাতে নষ্ট করা হবে না? আপনি ওর বাপের মতই ত, এটা মিটিয়ে নিয়ে সবারই মুখ রাখুন।

চন্দ্রনাথ বাবু বক্রদৃষ্টিতে রহমন সাহেবের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপের সুরে কহিলেন,—সব ত শুনলুম, কিন্তু স্বার্থটা কি, সেইটুকুই ত শোনা হল না।

রহমন সাহেব সঙ্গে সঙ্গে কহিলেন,—আমার? শুনতে চান?—পরক্ষণেই তিনি পকেট হইতে একখানি খোলা চিঠি বাহির করিয়া চন্দ্রনাথ বাবুর হাতে এক রকম গুঁজিয়া দিয়া কহিলেন,—এই চিঠিখানা পড়ুন আগে, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন।

বাহিরে অনিচ্ছা ও বিরক্তির ভাব স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াই তিনি চিঠির উপর দুই চক্ষুর কৌতুহলোদ্দীপক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

মিনিট কয়েক পরেই চিঠিখানি রহমান সাহেবের হাতে ফিরাইয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে চন্দ্রনাথ বাবু প্রশ্ন করিলেন,—পরিটি কে?

রহমন সাহেব কহিলেন,—আমারই মেয়ে।

চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—এই মেয়েটি তার বাবার কাছে যে আবদার করেছে, আমাকেও সেটা মেটাতে হবে নাকি?

রহমন সাহেব কহিলেন,—তাই যদি হয়, সেটা কি ভাল নয়?

চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—ভালমন্দ বোঝবার শক্তি আমার নিজেরই যথেষ্ট আছে।

রহমন সাহেব কহিলেন,—সেটা সকলেরই থাকা উচিত।

হঠাৎ কি ভাবিয়া চন্দ্রনাথ বাবু এই সময় কহিলেন,—তাহ'লে কি ব্যারিষ্টার দাস জামিন সম্পর্কে যে মার্চ্চেণ্টের কথা বলছিলেন—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি আর একবার রহমন সাহেবের মুখখানির উপর সন্দেহের দৃষ্টিতে চাহিলেন।

রহমন সাহেব কহিলেন,—তিনি আমার বাল্যবন্ধু; পাঠশালা থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজ পর্য্যন্ত আমরা এক সঙ্গে পড়েছি; তারপর তিনি যান বারে, আমি ঢুকি কারবারে।

চন্দ্রনাথ বাবুর নাসাপথে নিশ্বাস-বায়ু একটু অস্বাভাবিক গতিতে সবেগে নির্গত হইল এবং সেই সঙ্গে কণ্ঠের ভিতর দিয়া হুজুরী হুমকীর মতই একটা স্বর শ্বসিয়া আসিল,—হুঁ!

ক্ষণকাল সকলেই নীরব। সহসা চন্দ্রনাথবাবুই সে নীরবতা ভাঙ্গিয়া দিলেন। তাঁহার দুই চক্ষুর সতর্ক-তীক্ষ্ণদৃষ্টি চারিদিকে ঘুরাইয়া হঠাৎ সার্চ্চলাইটের মত তাহা রহমন সাহেবের মুখের উপর ফেলিয়া তিনি কহিলেন,—কথা আছে।

সংক্ষিপ্ত দুটি কথাতেই রহমন সাহেব বক্তার উদ্দেশ্য বুঝিলেন। উভয়ের চক্ষুর উপরেই অদূরবর্ত্তী অতিকায় গাছটির ছায়াচ্ছন্ন তলদেশ প্রকাশ পাইল, কর্পোরেশনের কতকগুলি যন্ত্রপাতি সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে পড়িয়া

থাকায় কেহ সেদিকে ঘেঁসে নাই। উভয়েই একযোগে এই নির্জ্জন অংশে উপনীত হইলেন।

চন্দ্রনাথবাবুই এক্ষেত্রে আহ্বানকারী; সুতরাং রহমন সাহেব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে এই দাম্ভিক ভূস্বামীটির দিকে চাহিলেন।

চন্দ্রনাথবাবু গম্ভীর ভাবেই কহিলেন,—আমার একটা স্বভাব এই, যেটা ধরি তা আর ছাড়তে পারি না; এ জেদটুকু এ পর্য্যন্ত ঠিক বজায় আছে।

রহমান সাহেব কহিলেন,—দুনিয়ার দরবারে যাঁরা মাথা তুলে বড় হবার দাবী রাখেন, এটা তাঁদের স্বভাব।

চন্দ্রনাথবাবু কহিলেন,—এখানে এসেই ঐ ছেলেটার সঙ্গে ঠোকাঠুকি বেধে গেছে। এর গোড়ায় আছে একটা সরিকানী চক্রান্ত,—ছেলেটাকে নাচাচ্ছে ওর মা। মাগী বজ্জাতের ধাড়ী—

রহমন সাহেবের অটল ধৈর্য্যে এইখানে চাঞ্চল্য দেখা গেল। একটা শিক্ষিত বর্ষীয়ান ব্যক্তি বাহিরের এক অপরিচিত ও নিতান্ত পরের সমক্ষে এভাবে যে নিজের বংশের শুদ্ধান্তের কোন মহিলার সম্বন্ধে রূঢ় মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন, ইহা তাঁহার জানা ছিল না। কিন্তু তাঁহার কোন প্রতিবাদের পূর্ব্বেই চন্দ্রনাথবাবু নিজেই এ প্রসঙ্গ চাপা দিয়া আসল বক্তব্য কথাটাই তাড়াতাড়ি পাড়িয়া ফেলিলেন,—যাক্ সে কথা, এখন আমি যা চাই, আর দু' পক্ষেরই লাভ, সেইটিই বলছি।—আমার এই জেদ, ছেলেটা যাতে একটু শিক্ষা পায়। এটা খুব সহজেই সম্ভব হতে পারে যদি ব্যারিষ্টার দাস এতে হাত না দেয় আর মুসলমানরা সবাই সরে দাঁড়ায়।

রহমন সাহেব মনের বিস্ময় ও বিক্ষোভ অতিকষ্টে দমন করিয়া ঈষৎ বিকৃত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—এমন সম্ভাবনার হদীস আপনি কিছু পেয়েছেন?

চন্দ্রনাথবাবু বলিলেন,—সেইটি হচ্ছে আসল কথা। ঐ যে বাইশ বিঘে জমির কথা একটু আগে হল না? ওর সিকি অংশের মালিকান সত্ত্ব আমার! এ পর্য্যন্ত আমার সেরেস্তায় ও জমির ব্যাপারে নামথারিজ হয় নি। সেটা কালই নিখরচায় হতে পারে, যদি—কথাটা আরো খুলে বলতে হবে কি?

রহমন সাহেব এবার স্বাভাবিক সহজকণ্ঠেই কহিলেন,—বলা ত আপনার সবই হয়ে গেছে। কারবার করে যখন খাই, এমন বোকা নই যে, আসল কথাটা আপনার ধরতে পারিনি। কিন্তু বড় দুঃখেই বলতে হচ্ছে, বিঘে কতক জমির নাম-খারিজের লোভটুকু আমাকে দেখিয়ে আপনি নিজেকেই ভারি ছোট করে ফেলেছেন।

ঝুনো উকীল ও ঝানু হিসিবী লোক হইয়াও চন্দ্রনাথবাবু আজ অজ্ঞ বালকের মত হিসাবে ভুল করিয়া বসিলেন। তিনি রহমন সাহেবের কথায় মনে মনে সাব্যস্ত করিলেন, গরজ বুঝিয়া লোকটা আরও কিছু উঁচু রকমের দাঁও কসিতেছে। মুখখানা কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—আঁচটা কি রকম শুনি?

রহমন সাহেব কহিলেন,—আপনার তালুকটা লিখে দিতে পারবেন?

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চন্দ্রনাথবাবু রহমন সাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন। একি রহস্য? কিন্তু পরক্ষণেই মন বিরোধী হইয়া জানাইয়া দিল—এ লোকটা ত তাঁহার বয়স্য নহে। তবে?

রহমন সাহেব নিজেই সমস্যাটার সমাধান করিয়া দিলেন। আস্তে আস্তে কহিলেন,—দেখুন, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছিলেন বলেই আমি ও ভাবে তালুকের কথাটি তুলিছি। আসলে ওটা ভুয়ো। এখন শক্ত হয়েই আমাকে বলতে হচ্ছে, সত্যিই যদি তালুকটা আপনি লিখে দেবার লোভ দেখান তবুও মনে মনে যে সম্ভাবনা আপনি ঠিক দিয়ে রেখেছেন

তা হবে না। আপনার যেমন জেদ বিশুবাবুকে জব্দ করবেন, আমাদেরও তেমনই রোখ্—যেমন করেই হোক তাকে বেকসুর খালাস করতে হবে। এর ভেতরে আর কোন কথা নেই।

চন্দ্রনাথবাবুও আর কোন কথা কহিলেন না। অদূরবর্ত্তী প্রাঙ্গনের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত মুসলমান দর্জ্জীদিগকে এই সময় এই দিকেই আসিতে দেখা গেল। চন্দ্রনাথবাবু বক্রদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া এবং রহমন সাহেবের মুখের উপর একটা অর্থপূর্ণ সুতীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি নিজের দলে গিয়া মিশিলেন।

চন্দ্রনাথ বাবুর এ দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে রহমন সাহেবের কষ্ট হয় নাই। কিন্তু মনে মনে হাসিয়া তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশে কহিলেন,—তোমার যা ইচ্ছা তাই হবে।

ওয়ারিস সাহেব নিকটে আসিয়া ব্যগ্রভাবে কহিলেন,—ব্যাওরা কি ?

রহমন সাহেব কহিলেন,—জমির কথা তুলে তুমিই ত জমিদারের জেদ বাড়িয়ে দিলে, এখন ম্যাও ধর ?

ওয়ারিস সাহেব সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওনার কি রায় ?

রহমন সাহেব কহিলেন,—তোমাদের সবাইকে ইনাম দিতে চান, কিন্তু বিশুবাবুর দলে কেউ তোমরা থাকতে পাবে না—এই কড়ারে। রাজী আছ ?

সুদীর্ঘ দাড়ী সবেগে দুই দিকে দুলাইয়া এবং দুই চক্ষুর দৃষ্টি উজ্জ্বল করিয়া ওয়ারিস সাহেব কহিলেন,—না—না! কিছুতেই না।

রহমন সাহেব কহিলেন,—তাহলে খানার ফরমায়েস কর, লড়তে যখন হবে, পুরিমিঠাই পেটে পুরে দেহগুলোকে ত জুত করা চাই। পরি চিঠিতে লিখেছে, দোকান থেকে সেদিন খাবার আনিয়েও বিশুকে খাওয়ানো হয় নি, যেটা বাকি আছে, এখানেই সেটা ভাল করে শেষ

করতে হবে! তাছাড়া গাঁ থেকে যারা এসেছে, কেউ যেন বাদ না পড়ে।—

এ দলের কেহই সেদিন বাদ পড়ে নাই। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আলিপুর কোর্টের খাবারের দোকানগুলির যাবতীয় সঞ্চয় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।

ইহার পর এই মামলার যে কয়টি শুনানী হইয়াছিল, প্রত্যেকটিতেই চন্দ্রনাথবাবু নিজের জেদটুকু রক্ষা করিতে বৈধ অবৈধ সকল রকম তদ্বিরের পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই শেষ রক্ষা হইল না। ব্যারিষ্টার দাস সাহেবের মারাত্মক জেরায় তাঁহার সংগৃহীত সাক্ষীরা প্রত্যেকেই ঘাবড়াইয়া গিয়া অনুচিত এমন অনেক কথা স্বীকার করিয়া ফেলিল, এবং আহত গুরখা দারোয়ানটি পর্য্যন্ত যে সকল কথা কহিল, আসামীর বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ ও ফরিয়াদীপক্ষের সযত্নরচিত বিবৃতির সহিত তাহার ঐক্য বা সামঞ্জস্য দেখা গেল না। জেরায় গুর্খা মহাবীর স্পষ্টই স্বীকার করিল যে, সেইই প্রথমে আসামীর গণ্ডে সজোরে চপেটাঘাত করিয়াছিল এবং যদি আসামী তাহাতে তাহার কুকরীটি খাপ হইতে টানিয়া না লইয়া তাহার গালেই পাল্টা থাপ্পর দিত, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই রুখিয়া ও অতিশয় রুষ্ট হইয়া নিজেই আসামীর উদ্দেশে কুকরী চালাইত। স্বাভাবিক চিত্তে উত্তেজনা আনিবার ইহা যথেষ্ট কারণ।

ফরিয়াদী পক্ষের উকীল অবশ্য সাক্ষীদের উক্তির উপর নানারূপ আবরণ দিয়া আসামীর শাস্তির অনুকূলে অনেক কথাই সওয়াল জবাবে বলিলেন। কিন্তু আসামী পক্ষ হইতে ব্যারিষ্টার দাস স্বল্প কথায় যেনির্দ্দেশ দিলেন, তাহাই হইল এই পরিস্থিতির আকাশভেদী গর্জ্জনের পর পর্ব্বতের মূষিক প্রসবের মত হাস্যকর!

বিচারক রায়ে শুধু যে এই অপূর্ব্ব আসামীকে বেকসুর খালাস দিলেন, তাহা নহে ; ইহার সাহস, দৃঢ়তা ও সত্যনিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া তাহার মর্য্যাদা বাড়াইয়া দিলেন। আসামী অনায়াসেই আঘাত করিবার কথা অস্বীকার করিতে পারিত, অকুস্থলে উপস্থিত পুলিস কর্ম্মচারীও ত তাহাকে স্বচক্ষে আঘাত করিতে দেখেন নাই। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ দাস তাঁহার সওয়াল জবাবে বলিয়াছেন যে, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক পরীক্ষার ছলে আসামীকে আঘাতের কথাটা অস্বীকার করিতে একাধিকবার বলিয়াছিলেন কিন্তু সে দৃঢ়তার সহিত প্রতিবারই বলিয়াছে, যে কার্য্য আমি করিয়াছি নিশ্চয়ই স্বীকার করিব, আমাকে মিথ্যা বলিতে অনুরোধ করিবেন না। আমি কখনও মিথ্যা বলি নাই। অপরাধ সম্বন্ধে আদালতের প্রশ্নেও আসামী বলিয়াছে, আমি কোন অপরাধ করি নাই। একজন নিঃসম্পর্কীয় লোক আমার ইজ্জতে আঘাত করে, মানুষ মাত্রেরই উচিত নিজের ইজ্জত রক্ষা করা। গুর্খাটার আচরণ আমাকে কুকরী চালাইতে বাধ্য করিয়াছে। বিষয়টি অতি তুচ্ছ, কিন্তু বাবু চন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ইহাকে গুরুতর করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার মত প্রবীণ আইনজ্ঞ ব্যক্তি অনায়াসেই ঘটনাটির স্রোত অন্য দিকে ফিরাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই এবং তাঁহারই অসঙ্গত ও অসহিষ্ণু আচরণকেই যদি এই দুর্ঘটনার কারণ বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা কিছুতেই অন্যায় হইতে পারে না। ফরিয়াদি পক্ষ অভিযোগের বর্ণনায় উল্লেখ না করিলেও, আসামীর বিবৃতি ও আসামী পক্ষের বিচক্ষণ কৌন্সলীর জেরায় ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীদের উক্তি হইতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, চন্দ্রবাবুর পুত্র অখিলনাথের সহিত আসামীর কলহ বাধে, তাহারও মূলে একটি বালিকা, নাম তাহার শোভা। উক্ত অখিলনাথই আসামীর প্রতিযোগী ও এই মামলার প্রকৃত ফরিয়াদী। কিন্তু চন্দ্রনাথ

বাবু পুত্রকে সন্তর্পণে সরাইয়া দিয়া নিজেই তাহার স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ফৌজদারী আইনের দূষিত বাতাসে পাছে তাঁহার বালক পুত্রের দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হয়, এই জন্যই এরূপ সতর্কতায় তিনি তৎপর হইয়াছেন, পক্ষান্তরে তাঁহারই বংশের এই ছেলেটিকে জেলে পাঠাইয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবনটা ব্যর্থ ও বিষময় করিয়া দিতে ইনি কোনও রূপ চেষ্টারই ত্রুটি করেন নাই। এইরূপ নীচ মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষগুলিই ভারতীয় সমাজ, সভ্যতা ও মানবতার ভয়ঙ্কর শত্রু। এই সকল কারণ পরম্পরায় এবং গুর্খা মহাবীরকে কুকরী দ্বারা আঘাত করা সম্পর্কে এই অল্প বয়স্ক আসামীর উচ্চ মনোবৃত্তির দিক দিয়া উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ ছিল বিবেচনা করিয়া তাহাকে বেকসুর খালাস দেওয়া গেল।

২২

আলিপুর হইতে আনন্দপুরে রেলে যাতায়াত চলে,—দুই ঘণ্টার পথ। মামলা নিষ্পত্তির পর অপরাহ্নের ট্রেণে সেকেণ্ড ক্লাসের ছোট কামরাটি অধিকার করিয়া সপার্ষদ চন্দ্রনাথ বাবু অধিষ্ঠিত,—মুখখানি তাঁহার শুষ্ক ও বিবর্ণ। পারিষদবর্গও নিজ নিজ মুখের উপর বুঝি জোর করিয়াই বিষাদের আবরণ টানিতেছিল।

কুসুম নামে ফাজিল মেয়েটির মাতামহ বৃদ্ধ রমানাথ মুখুজ্যেও এই মামলায় চন্দ্রনাথ বাবুর দলে যোগ দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ইনি বংশের জ্যেষ্ঠ বলিয়া চন্দ্রনাথ বাবুর নির্দ্দেশ মত তাঁহার স্ত্রী মহামায়া দেবী একখানি মোহর এবং ব্রহ্মদেশীয় এক প্রস্থ রেশমী বস্ত্র দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন। সেই সূত্রে চন্দ্রনাথবাবু ও তাঁহার সুবিবেচক পরিবারবর্গের নামে অতঃপর বৃদ্ধের মুখ দিয়া লালা ঝরিতে থাকে, সুখ্যাতি আর ধরে না। চন্দ্রনাথ বাবুর অনুরোধে সাক্ষীদিগকে তালিম দিবার জন্য এই বয়সে আদালতে

উপস্থিত হইতেও দ্বিধা করেন নাই। প্রত্যেক শুনানীর দিনই ফিরিবার সময় ট্রেণের কামরায় বসিয়া দৃঢ়স্বরে ইনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন,—কি তুমি দাস সাহেবের কথা বলছ চন্দর, স্বয়ং জ্যাকসন কিম্বা ডাব্লিউ সি বাঁড়ুয্যে নেমে এসে দাঁড়ালেও ওর নিস্কৃতি নেই,--নির্ঘাত জেল, এ তুমি দেখে নিয়ো।

এদিনও ট্রেণের কামরায় ইনি উপস্থিত ছিলেন এবং সর্ব্বপ্রথম ইনিই উৎসাহের সুরে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন,—তুমি অমন করে মনমরা হয়ে থেক না চন্দর, হারলেও তোমার জিত হয়েছে; হ্যাঁ, একেই বলে জেদ। তবে কি জান, খেলা মামলা গাওনা-বাজনা এ সব হাওয়ার তালে চলে; উলটো হাওয়া যেই বইলো, অমনি ফাঁস! কিন্তু কুচ পরোয়া নেই, আপীলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আদিনাথ, নটনাথ, ভূতনাথ প্রভৃতি বড়বাড়ীর অন্যান্য কতিপয় নিষ্কর্ম্মা সরিক যাঁহারা গোড়া হইতেই চন্দ্রনাথ বাবুর দলভুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও বয়োবৃদ্ধ রমানাথের কথায় সায় দিয়া প্রায় সমস্বরেই কহিলেন, দাদা ঠিক বলেছেন, আপীলেই মামলা ঘুরে যাবে।

কিন্তু ইহাতেও চন্দ্রনাথ বাবুর মুখে আশার আলো ফুটিল না, তিনি বিমর্ষভাবেই মৃদুস্বরে কহিলেন,—গোড়াতেই আমাদের গলদ হয়েছিল, আপীলেও সুবিধা হবে না। তা ছাড়া, এ ছুঁচোর বিষ্ঠা আর পর্ব্বতে তোলবার ইচ্ছা আমার নেই। অন্য রাস্তা ধরে আমি এর শোধ নিতে চাই।

প্রত্যেকেই চক্ষুর উপর প্রশ্ন ভরিয়া সাগ্রহে চন্দ্রনাথ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রনাথ বাবু এবার মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিলেন,—কিন্তু এ রাস্তাতেও আপনারা এমন করে হাত পা বেঁধে পড়ে আছেন যে, একলাই আমাকে হাতড়ে হাতড়ে এগুতে হবে।

বক্তার উক্তি শ্রোতাদের চক্ষুর দৃষ্টি অধিকতর বিস্ফারিত করিয়া দিল। কথাটার অর্থ কাহারও উপলব্ধি হইল না।

রমানাথ বাবু অসঙ্কোচে প্রশ্ন করিলেন,—খুলেই বল না কথাটা, যাতে সকলে বুঝতে পারি।

চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—এতে না বোঝবার কি আছে? গোটা কতক টাকা হাতে পেয়ে আপনারা সবাই এক ধার থেকে রহমন মিঞাকে প্রজা স্বীকার করে নিয়েছেন, সাবেক প্রজার নাম বাতিল করে এই লোকটার নাম নিজেদের সেরেস্তায় পত্তন করে নিয়েছেন। নেন নি?

এ প্রশ্নে প্রত্যেক সরিকের মুখ শুখাইয়া গেল। রমানাথই শুধু সাহস করিয়া কহিলেন,—হ্যাঁ, তা নিয়েছি বটে, আর না নিয়ে উপায়ও ছিল না।

কেন?

সে অনেক কথা। সাবেক প্রজা আরজান মোল্লা ফেল হবার যো হয়, খাজনা এক পয়সাও দিত না, দেবার শক্তিও তার ছিল না; নালীশ করেও আদায় উস্থলের উপায় কিছু পাওয়া যায় নি। কাজেই যখন জানা গেল, একজন পয়সাওয়ালা বিদেশী লোক বাস করবার জন্য ঐ জমির জোতসত্ব কিনেছে, পাই পয়সা বকেয়া খাজনা আর নাম খারীজের জন্যে মোটা টাকা দিতে রাজী, তখন তাতে সায় না দিয়ে পারি নি!

আমিও ত সেই কথাই বলেছি—গোটাকতক টাকার লোভে হাত পা বেঁধে সব বসে আছেন। আপনারা যদি আরজান মোল্লার জোত সত্ব স্বীকার না করে মামলা করতেন, ঐ লোকটা তা হলে পাত্তা পেত?

সেধোকে যেই জিজ্ঞাসা করা—ভাত খাবি? অমনি সে ধড়মড়িয়ে উঠে জানতে চাইলে—বসব কোথায়? এটাও হয়েছিল ঠিক তাই। তুমি ত এখানে থাকতে না, সরিকদের হাল চাল কি বুঝবে বল? যেই ওয়ারিস

ওস্তাগর কথাটা পাড়লে, অমনি সরিকদের চুলবুলুনি দেখে কে! যেখানে ওদেরই সাধাসাধি করবার কথা, সেখানে এরাই বাড়ীপড়া হয়ে তাড়াতাড়ি যাতে ন্যাটা চুকে যায় তার জন্যে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিলেন,—কেউ কেউ ঐ পাওনা দেখিয়ে পাওনাদারদের পর্য্যন্ত পীঠ চাবড়ে দিয়েছিলেন।

বলেন কি?

বলছি বই কি, হক কথা বলব, তাতে আবার ভয় ডর কি! এই ত সামনেই বসে রয়েছে ভূতো, ওকেই জিজ্ঞাসা কর না—পা টিপে টিপে কবার ওয়ারিস ওস্তাগরের দলিজে ধন্না দিতে গিয়েছিল?

এ কথায় ভূতনাথের মুখখানা ভূতের মতই বুঝি ভয়াবহ হইয়া উঠিল, দুই চক্ষু পাকাইয়া বৃদ্ধ রমানাথের দিকে এক ঝলক অগ্নি বৃষ্টি করিয়াই যেন কহিল,—কি বল্লে খুড়ো, আমি গিয়েছিলুম ধন্না দিতে মোচনমানের দলিজে? তুমি দেখেছ?

রমানাথ দমিলেন না, বরং আরও তীব্র হইয়া দৃঢ়স্বরে কহিলেন,—যাসনি তুই? আবার তকরার? শুধু যাওয়া, পাঁচটা আগাম টাকা আর পাঁচ গণ্ডা হাঁসের আণ্ডা বাগিয়ে মুখুজ্জ্যে বাড়ীর সবাইকে লুকিয়ে চুপি চুপি বাড়ী ঢুকেছিল কে?

মুখখানার ভঙ্গী অদ্ভুত রকম করিয়া ভূতনাথ কহিল,—মুখ সামলে কথা বল বলছি, নইলে আমি কিন্তু এই নিয়ে থানা পুলিস করব বলে রাখছি।

রমানাথ এবার রীতিমত দাবড়ী দিয়া কহিলেন, তবেরে হারামজাদা, পথ ময়লা করে আবার চোখ রাঙ্গিয়ে কথা,—গাড়ী থামুক ত সন্তোষপুর ইষ্টিসনে, ওয়ারিস ওস্তাগর ত এই গাড়ীতেই আছে, তাকে ডেকে এনে যদি না ভজিয়ে দিতে পারি—

চন্দ্রনাথ এই সময় বাধা দিয়া কহিলেন,—থাক্ থাক্, এ নিয়ে আর

ভজাভজি করে দরকার নেই, তাতে নিজেদের মুখেই চুনকালি পড়বে। কিন্তু আপনাকেও বলছি দাদা, ওরা যাই করুক না কেন, আপনি কেন ওতে সায় দিতে গেলেন ?

রমানাথ বাবু কহিলেন,—বাঃ ! ওরা সবাই মিলে শাঁশটুকু শুষে নিক, আর আমি তফাতে থেকে তাই দেখি আর ছোবড়াগুলো জড়ো করে তোমার মতন বোকা সাজি ?

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চন্দ্রনাথ বাবু প্রশ্ন করিলেন,—এ কথার মানে ? আমাকে এর ভেতরে আনবার কারণ ? আমার সেরেস্তায় রহমন মিঞার নাম পত্তন হয়েছে বলতে পারেন ?

রমানাথ বাবু মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিলেন,—নাম পত্তন ঠিক না হলেও আরজান মোল্লার বাকিবকেয়া খাজনা ঐ রহমন মিঞার মারফত বলে নেওয়া ত হয়েছে, দাখিলাও ঐ বলে দেওয়া ত হয়েছে, থোকায়ও অবশ্য ও নাম বকলমায় উঠেছে, তবে আর বাকি রইল কি ?

চন্দ্রনাথ বাবু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন এবং পরক্ষণেই পার্শ্ববর্ত্তী বেঞ্চিখানির এক প্রান্তে উপবিষ্ট ও এই সকল আলোচনায় নির্লিপ্ত ধরণীধর বাবুকে আহ্বান করিয়া প্রশ্ন করিলেন—হ্যাঁ, চক্রবর্ত্তী মশাই, বাইশ বিঘে বন্দর জমা কি নামে দাখিলা কেটে আস্‌ছেন ?

চক্রবর্ত্তী মহাশয় শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—সাবেক প্রজা আরজান মোল্লার নামেই দাখিলা বরাবর দেওয়া হয়েছে।

চন্দ্রনাথ বাবু রমানাথের দিকে চাহিতেই তিনি রুক্ষকণ্ঠে ধরণীধরকে জেরা করিলেন,—সে ত দেওয়া হয়েছে জানি, কিন্তু তলায় মাঃ রহমন মিঞা বলে জিগির দেওয়া হয়ে আসছে কিনা—সেইটিই বল না ?

ধরণীধর আমতা আমতা করিয়া উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, তা হয়েছে বটে।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে তর্জ্জনের সুরে চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—কেন হয়েছে শুনি ? কে আপনাকে ওর মারফত বলে জিগির দেবার হুকুম দিয়েছিল ?

ধীরকণ্ঠে ধরণীধর কহিলেন,—এই দস্তুর।

মুখ ও মুখের স্বর বিকৃত করিয়া চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন;—দস্তুর ! আপনি আমাকে কানুন শেখাচ্ছেন ? জানেন, কি সর্ব্বনাশ আপনি করেছেন, মামলার পথে কত বড় একটা বাধা পড়েছে—দাখিলায় ওর মারফতে টাকা পেয়েছেন এই কটা কথা লেখায় ?

ধরণীধর কহিলেন,—টাকা নিতে হলে ওটা লিখতে হয়, নইলে টাকা ওরা দিত না। আপনাকেও এটা জানান হয়েছিল, কিন্তু নাম-খারিজ দিতেই আপনার বারণ ছিল, টাকা নিতে নয়।

চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—আমি কি তখন জেনেছিলুম যে, আপনি ওর মারফতেই টাকা নেবেন, আর নিলেও নামটা পর্য্যন্ত দাখিলায় বসিয়ে দেবেন ? কত বড় অন্যায় করেছেন বলুন ত ?

ধরণীধর উত্তর দিলেন,—আমি এটাকে অন্যায়-মনে করি নি। আর, একথাও বলছি, যদি এই মামলা না বাধত, আপনি এই নিয়ে এতটা চঞ্চল হতেন না, সদ্ভাবেই সব মিটমাট হয়ে যেত।

এই সময় ট্রেণের গতি মন্থর হইয়া আসিলে, এই অপ্রীতিকর আলোচনাও এই স্থানে হঠাৎ রুদ্ধ হইল—ষ্টেসনের পোর্টারের চীৎকারে। দেখা গেল, ট্রেণ আনন্দপুর ষ্টেসনে উপস্থিত।

সকলেই যখন প্ল্যাটফরমে নামিতে তৎপর, তখন একটা প্রকাণ্ড কোলাহল ট্রেনের ইঞ্জিনের আস্ফালনকেও অতিক্রম করিয়া আরোহীদিগকে চমকিত করিয়া দিল।

ষ্টেসন মাষ্টারের সহিত চন্দ্রনাথ বাবু সুপরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়াই ষ্টেসন মাষ্টার ব্যস্তভাবে

নিকটে আসিয়া কহিলেন,—আপনি এখন ষ্টেসনের বাইরে যাবেন না স্যার, আমার আফিসের ভেতরে শীগ্‌গীর আসুন।

চন্দ্রনাথ বাবু অপ্রসন্নভাবে প্রশ্ন করিলেন,—ব্যাপার কি?

ষ্টেসন মাষ্টার বাহিরের দিকে চন্দ্রনাথ বাবুর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া কহিলেন,—দেখতে পাচ্ছেন না, শুনচেন না হল্লা, আমাদের ত কাণে তালা ধরে গেছে। আপনাদের মামলা নিয়েই এই ব্যাপার,—পাঁচহাজার মুসলমান জমায়েত হয়েছে স্যার,—আর দাঁড়াবেন না, আসুন।

চন্দ্রনাথ বাবুর বুঝিতে আর কিছু বাকি রহিল না,—তিনি ক্ষণিকের জন্য সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন, ষ্টেসনের সন্নিহিত দুইটি বড় বড় ময়দান, মধ্যবর্ত্তী রাজপথ সমস্তই মুসলমান জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আর সেই বিপুল জনসমুদ্র মথিত করিয়া ঘন ঘন সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি উঠিতেছে—আল্লা হো আকবর! বিশু বাবু কি জয়!

ভয়টা গভীরভাবে শুধু চন্দ্রনাথ বাবুকেই অভিভূত করিল না, রমানাথ, ভূতনাথ নটনাথ প্রভৃতি সকলেরই সমান অবস্থা। সুতরাং পদক্ষেপ দীর্ঘ ও ক্ষিপ্রতর করিয়া ষ্টেসন মাষ্টারের পিছু পিছু তাঁহারা অফিসের ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং সেখান হইতেই গবাক্ষপথে প্রমত্ত জনতার কার্য্যকলাপ অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

২৩

বারান্দায় রেলিংটির উপর দেহটি হেলাইয়া দিয়া শোভা অদূরবর্ত্তী অপর একটি বারান্দার দিকে ব্যাকুলদৃষ্টিতে তাকাইয়া সেখানকার উৎসব দেখিতেছিল। দেখিতেছিল, একই বাড়ীতে একই সময়ে হর্ষ ও বিষাদের কি আশ্চর্য্য সমাবেশ। এ বাড়ী আজ বিমর্ষ, ম্রিয়মান, আলোয় দীপ্তি নাই, লোকের মুখে হাসি নাই, চারদিক যেন থম থম করিতেছে অথচ

ওদিকে সুবৃহৎ উঠানটির ওপারে অপর মহলটি আলোয় কুরকুটি, হর্ষ আর হাসি ওখানে যেন দুটিতে হাত ধরাধরি করিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে; শঙ্খধ্বনি, হরিলুটের হুল্লোড়, কত লোকের পরিচিত ও অপরিচিত স্বর হাওয়ায় হাওয়ায় এ বাড়ীতে ভাসিয়া আসিতেছে, কত লোক আসা-যাওয়া করিতেছে কিন্তু শোভার আজ ওদিকে ভাল করিয়া চাহিবারও বুঝি অধিকার নাই। অথচ ঐ বাড়ীটাকে ঘিরিয়া শোভার এই বাল্যজীবনের কত স্মৃতিই জড়াইয়া রহিয়াছে! ওখানকায় প্রতি ঘরের প্রত্যেক জিনিষটির সহিত কি নিবিড় পরিচয়ই তাহার ছিল; একটি বেলা ওদিকে না গেলে ডাকের উপর ডাক আসিত তাহার দেহটি এ বাড়ীতে থাকিলেও মনটি বুঝি ও-বাড়ীর সহিত মিশিয়া থাকিত। কিন্তু প্রায় তিনটী মাস অতীত হইয়া গিয়াছে, আর ও বাড়ীর চৌকাঠটিও সে মাড়ায় নাই, দুই বাড়ীর মধ্যে যে গভীর যোগসূত্র ছিল, তাহা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তাই না আজ ওবাড়ীতে অমন উৎসব, অত ধুম-ধাম, অথচ সেখানে, আজ আর কেহ তাহাকে ডাকে নাই, কাহারও ডাকিবার জো নাই!

বারান্দায় আলো ছিল না, অন্ধকার আশ্রয় করিয়াই বালিকা ও-বাড়ীর উৎসব দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে ও বাড়ীর হর্ষ এবং এ-বাড়ীর বিষাদ বুঝি পর পর তাহার অন্তরটির ভিতর ঢুকিয়া তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছিল—হর্ষ যেন তাহার পীঠটি চাপড়াইয়া জোর গলায় বলিতেছিল,—যে ভয়ে তুমি কাঁটাসার হয়েছিলে, সে ত ঘুচে গেল, আর ত কেউ বলতে পারবে না—বিশুদা তোমার জেলে যাবে; সে জয়ী হয়েই ত ফিরেছে। আনন্দ কর, আনন্দ কর!—আবার পরক্ষণেই বালিকার আনন্দোজ্জ্বল চিত্তটি অন্ধকার করিয়া বিষাদ আসিয়া কহিল,—সব ত হ'ল, বিশুদা তোমার হাসি মুখে ফিরে এল, কিন্তু

তোমাকে ত খুঁজলে না? তোমার মুখে ও হাসি কেন? তার সঙ্গে ত তোমার চিরদিনের মত ছাড়াছাড়ি হয়েছে,—তবে?

বালিকার দুই চক্ষু অশ্রুভারে স্ফীত হইয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র দেহটিও তাহার আড়ষ্ট হইতে থাকে। কিন্তু আবার কোথা হইতে হর্ষ ছুটিয়া আসিয়া আশ্বাস দেয়,—তা কেন? হলোই বা আড়ি, এমন কত বার ত হয়েছে, তারপর কি ভাব আর হয় নি? নাই বা হল ভাব, বিশুদা ত আর জেলে যাবে না, বাড়ীতেই থাকবে,—তবে?

হর্ষ-বিষাদের এই দ্বন্দ্বে বালিকার কোমল হৃদয়টি যখন মথিত হইতেছিল, সেই সময় অখিল আস্তে আস্তে পা দুটি টিপিয়া টিপিয়া তাহার ঠিক পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। শোভার মন তখন সম্মুখের দিকে অদূরবর্ত্তী আলোক-উজ্জ্বল উৎসব-মুখর সুপরিচিত ঘরগুলির ভিতর গিয়াছে, চক্ষু কর্ণ—এই দুইটি বিশেষ ইন্দ্রিয়ও মনের অনুসরণ করিয়াছে; কাযেই কেমন করিয়া জানিবে যে, তাহার পিছনে চুপিসাড়ে আর একটি ছেলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! জানিতে পারিল এবং সঙ্গে সঙ্গে চমকিয়া উঠিল, যখন সেই ছেলেটির সুকোমল হাত দুইখানি তাহার কাঁধটির উপর পড়িল।

এই আকস্মিক স্পর্শে শোভার কণ্ঠ দিয়া ভয়ার্ত্ত স্বর বাহির হইল,—মাগো!

ঠিক পার্শ্বে বারান্দার দিকে আসিয়া অখিল কহিল,—ইস্, ভয়ে যে ডুগরে উঠলি রে?

—মাগো, তুমি যেন কি! এমন করে বুঝি ভয় দেখায়? যা’ ভয় আমার হয়েছিল!

—যার প্রাণে এত ভয়, কোন্ ভরসায় এই নিরিবিলি বারান্দায় সে এসে দাঁড়ায়! কি দেখা হচ্ছিল?

—কি আবার দেখব ?

—তবু ?

—তোমার মাথা।

—আমার মাথা ত আর ওদিকে নেই যে অমন করে চোরের মতন চুপিসাড়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবি ! আমি যেন কিছু জানতে পারি নি ?

—কি জেনেছ তুমি ?

—ঐ বিশে ডাকাতটা খালাস পেয়েছে, তাই চোখে মুখে আর হাসি ধরে না !

—আ-হা ! তোমাকে বলেছিলুম !

—ব'লবি কেন, আমি কি কাণা, কিছু দেখতে পাই না, না, বুঝতে পারি না ?

—কি বুঝেছ ?

—তিনটি মাস মেয়ের মুখে হাসি ছিল না, ভাল করে কারুর সঙ্গে কথা কওয়া হত না, সন্ধ্যে হতে না হতেই বিছানায় পড়ে ঘুমের কি ঘটা,— আজ সে সবই পালটে গেছে। এই ত হাতেনাতেই ধরলুম—বেহুঁস হয়ে ঐ ইতরদের পেজমী দেখা হচ্ছিল !

—ওরা ইতর ?

—ইতর নয় ত কি ? শুধু কি তাই,—ওরা পাজী, নচ্ছার, বজ্জাত। জিত হয়েছে বলে আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে ঐ সব করছে। তোর লজ্জা নেই, তাই ঐ দিকে চেয়ে চেয়ে দে'খছিস ?

ও পক্ষের উদ্দেশ্যে এইরূপ অভদ্র মন্তব্য শোভার ভাল লাগে নাই। মন্তব্যটির শেষ ভাগে অখিল তাহার প্রসঙ্গ তুলিতেই সে অমনি সাপের মত ফোঁস করিয়া উঠিয়া কহিল,—আমার খুসী।

মুখ ভ্যাঙ্গাইয়া অখিল শোভার উক্তিটাই বিকৃত করিয়া কহিল,—

আমার খুসী! আচ্ছা আর দুদিন পরে দেখা যাবে, এ খুসী কোথায় থাকে! বাবা বলেছেন, কালই এখানে পাঁচিল তুলে দেবার জন্যে মিস্ত্রী লাগাবেন।

শোভা মুখখানি ম্লান করিয়া কহিল,—পাঁচিল তোলা হবে এখানে? কেন?

অখিল কহিল,—তোরই জন্যে, যাতে ও-বাড়ীর দিকে আর তাকাতে না পারিস। শুধু এখানেই নয়, যেখানে-যেখানে ওদের বাড়ী যাবার রাস্তা আছে, সে সমস্তই বন্ধ করে দেওয়া হবে।

শোভা শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—তাতে কি লাভ হবে?

অখিল কহিল,—ওদের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হবে, এইটুকুই লাভ। তোর ভারি কষ্ট হবে, না?—প্রাণের বিশুদার সঙ্গে আর দেখা হবে না, কথা কইতে পাবি নি, ভাব আর কোন দিন হবে না—

শোভার কণ্ঠ দিয়া আর্ত্ত রোদনের একটা প্রবল উচ্ছ্বাস বুঝি ঠেলিয়া আসিতেছিল, অতি কষ্টে বালিকা তাহা সম্বরণ করিয়া কহিল,—তিন মাস ত হয়ে গেল, কথা আমি তার সঙ্গে কয়েছি? একটিবার ওদিকে গিয়েছি কোন দিন? দেখেছ তুমি?

অখিল কহিল,—তবে লুকিয়ে লুকিয়ে ওদিকে চেয়ে এতক্ষণ কি হচ্ছিল?

শোভা কহিল,—আমি জানি না।

অখিল কহিল,—হ্যাঁ জানিস, তোকে বলতে হবে।

শোভা কহিল,—আমি বলব না।

অখিল এবার রুখিয়া কহিল,—না বললে আমি সকলকে বলে দেব—তুই একলা এখানে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ও-বাড়ীর দিকে চেয়েছিলি।

শোভা কহিল—আর যদি বলি ?

অখিল কহিল—তাহলে কাউকে আর বলব না।

শোভা দুই চক্ষুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি অখিলের মুখের উপর তুলিয়া কহিল,—সত্যি ?

অখিল শোভার অপূর্ব্ব দুইটি চক্ষুর শান্ত দৃষ্টির সহিত নিজের দুই চক্ষুর প্রখর দৃষ্টির সংযোগ করিয়া কহিল,—তোর দিব্যি !

শোভা এবার মুখখানি নীচু করিয়া মৃদুস্বরে কহিল—তবে সত্যি কথাই বলি—বিশুদাকে খুঁজছিলুম; আজ বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে তার সঙ্গে আবার ভাব করতে। কথার সঙ্গে সঙ্গে তাহার রাঙ্গা রাঙ্গা দুইটি ওষ্ঠ স্ফীত ও উদ্গত অশ্রুভারে দুই চক্ষু সিক্ত হইয়া উঠিল ; পরক্ষণে মুখখানি তুলিয়া সম্মুখবর্ত্তী মহলটির দিকে তাকাইতেই সে যেন বিস্ময়ানন্দে স্তব্ধ হইয়া গেল !

অখিলও শোভার শেষের কথার সঙ্গে সঙ্গে দুই চক্ষু পাকাইয়া তাহার দিকে চাহিয়াছিল এবং পরক্ষণে বারান্দার দিকে তাহারও দুইটি বিস্মিত চক্ষুর দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছিল। উভয়েই দেখিল, বারান্দার রেলিংটির উপর রীতিমত ঝুঁকিয়া একটি ছেলে এ দিকের বারান্দার দিকে চাহিয়া আছে, সে আর কেহ নহে—বিশু !

ক্ষণকাল পূর্ব্বে শোভার যে কণ্ঠ ঠেলিয়া কান্নার উৎস নির্গত হইতে চাহিতেছিল, সে সবলে তাহাকে রুখিয়াছিল ; এবার সেখান হইতে যে স্বরটি স্নেহসিক্ত হইয়া শ্বসিয়া উঠিতেছিল, শোভা তাহাকে রুখিতে পারিল না, বুঝি রুখিবার চেষ্টাও সে করিল না, পার্শ্বে দণ্ডায়মান বিস্ময়াহত অখিলকে অধিকতর আঘাত দিয়া সে স্বর সম্মুখের বারান্দার দিকে ছুটিল, —বিশুদা !

পরক্ষণেই প্রত্যুত্তর আসিল,—শোভা !

অখিল ঠিক এই সময় উন্মত্তের মত শোভার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুইহাতে সবলে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া কহিল,—চুপ!

শোভা সবেগে মাথার একটা ঝাঁকুনি দিয়া নিজেকে অখিলের হাত হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া কহিল,—পাঁচিল তুলে রাস্তা বন্ধ করে, আমাকে ধরে বেঁধে বিশুদার কাছ থেকে তফাত করতে পারবে তোমরা?

অখিল কহিল,—খুব পারব; বাবা বলেছেন, এ-বাড়ীর যে ওদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে, কথা কইবে, বাবা তাদের ছেঁটে ফেলে দেবেন।

শোভা মুখখানা তুলিয়া গলার স্বরে জোর দিয়া কহিল,—আমাকে কি করবেন, আমি যদি কথা কই, যদি সম্পর্ক রাখি?

অখিল কহিল,—কথা কইলে তোর মাকে দিয়ে মুখে গোবর গুঁজে দেবেন, ফের ওমুখো হলে ঘরে পুরে চাবিতালা বন্ধ করে রাখবেন।

শোভা কহিল,—মানুষের মনকে কেউ বুঝি ধরে বেঁধে ঢিট করতে পারে? কত গল্পই ত শুনেছি, তা হয় না।

অখিল বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করিল;—তুই কি করতে চাস তাহলে?

শোভা মুখখানা কঠিন করিয়া উত্তর দিল,—আমার দেহটাকে তোমরা ধরে বেঁধে রেখে যা ইচ্ছে তাই কর না কেন, আমার মন এখানে থাকবে না কিছুতেই। তাকে কি করে ধরে রাখবে?

অখিল কহিল,—তোর মন কোথায় থাকবে?

শোভা কহিল,—আমার মন কি আমার কাছে থাকে? এই ত তোমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা কইছি, কিন্তু মন কি এখানে আছে?

অখিল প্রশ্ন করিল,—তবে?

শোভা কহিল,—পাঁচিলই তোল, আর আমাকে ধরে বেঁধেই রাখ, আমি থাকব এদিকে, আর মন থাকবে ওদিকে; কেউ রুখতে পারবে না তাকে।

অখিল বিকৃতকণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন করিল,—এ কথার মানে ?

ঠিক এই সময় পিছন হইতে খিল খিল করিয়া হাসিয়া কুসুম কথাটার উত্তর দিল,—কি অবুঝ তুমি অখিল দা, কথাটা এখনো বুঝতে পারলে না ? এর মানে, বিশুদার শ্রীচরণে উনি করেছেন আত্মসমর্পণ !

২৪

ইতিমধ্যে পরি ও হাজির সহিত শোভার সদ্ভাব ও সম্প্রীতি নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। যদিও শোভা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী, কিন্তু বিদ্যালয়ের কোনও বালিকার সহিত তাহার বিশেষ মাখামাখি কোনও দিন দেখা যায় নাই। তাহার সঙ্গী সাথী বা সখী সব কিছুই ছিল একাধারে বিশুদা। তাহার সহিত যে খেলিয়া সুখ, মেলামেশায় সুখ, ঝগড়া-ঝাটির ভিতরেও বুঝি সুখ ছিল। তাই সে আর কাহারও দিকে ঝুঁকিত না। কিন্তু বিশুদার সহিত ছাড়াছাড়ির পর মনের যে দিকটা তাহার খালি হইয়া গিয়াছিল, অখিল সেটা ভরাইবার যত চেষ্টাই করুক, শোভা বেশ বুঝিত, সেটা খালিই আছে। কিন্তু কয়টি সপ্তাহের মধ্যে পরি যে ধীরে ধীরে তাহার কতকটা জুড়িয়া বসিয়াছে, তাহা সে জানিতে পারে নাই। যে দিন জানিতে পারিল, পরির সহিতও সেদিন তাহার ছাড়াছাড়ির সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

এক সঙ্গে তিনটি মেয়েকে ছুটীর পর রাস্তা ধরিয়া আসিতে দেখা যায়। পরি ও শোভা দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া কত কথা কত আলোচনাই করে, হাজি তাহাদের পিছু পিছু কথাগুলি শুনিতে শুনিতে যায়, কখনও বা নিজেও গায়ে পড়িয়া দুই একটা কথা কয়। পরির সংস্পর্শে ইতিমধ্যে হাজির আড়ষ্টভাব ও কথার জড়তা অনেকটা কাটিয়াছে।

শোভাও এই পরিহাস-প্রিয় সদাহাস্যমুখী সুচতুর মেয়েটির সাহচর্য্য

পাইরা বিশেষ সপ্রতিভ হইয়া উঠিয়াছে। অনেক নূতন কথা এবং কহিবার অনেক কায়দাও সে পরির নিকট শিখিয়াছে। বিশুর অভাবে পরিই যেন তাহার মুরব্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরির প্রতি শোভার এতখানি শ্রদ্ধার আর একটী কারণ এই যে, পরির নিকটেই সে বিশুদার সম্বন্ধে সেদিনকার সকল কথাই শুনিয়াছে এবং বিশুদার প্রতি পরির অতি যত্নের পরিচয় পাইয়া তাহার মনটি একেবারে ভরিয়া গিয়াছে। তাই না সে মন খুলিয়া শুধু এই মেয়েটির কাছেই তাহার সকল গোপন কথাই বলিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে।' পরিও বিনিময়ে এদিককার সকল খবর, মায়—আদালতের মামলার প্রতি দিনটির আগাগোড়া বিবরণটি পর্য্যন্ত শোভাকে শুনাইয়াছে; পরি না শুনাইলে এ খবর সঠিকভাবে শুনিবার কোনও সম্ভাবনাই তাহার পক্ষে ছিল না। এখনও সে প্রত্যহ এ বাড়ীর সকল কথা পরিকে শুনায় এবং তাহার নিকট নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ লয়। এই সকল কারণেই ইহাদের মধ্যে এতটা ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়াছে।

আজ বিদ্যালয়ে টিফিনের ছুটির সময় শোভা পরিকে ডাকিয়া গত রাত্রির সকল কথাই একটি একটি করিয়া শুনাইয়া দিল।

পরি কহিল—সত্যিই পাঁচীল তুলে দেবে?

শোভা মুখখানা ম্লান করিয়া কহিল,—দেবে কি, দিচ্ছে। ইস্কুলে আসবার সময় দেখে এসেছি, উঠানে এক গাড়ী ইট এসেছে, মিস্ত্রীও লেগেছে! গিয়ে হয়ত দেখবো—পাঁচীল উঠে গেছে।

পরি কহিল,—তোর জন্যেই তাহলে পাঁচীল উঠলো বল্—যাতে বিশুদার সঙ্গে মুখ দেখাদেখি আর না হয়?

শোভা কহিল, তা নয় ত কি! অখিলদা ত স্পষ্টই বললে ও কথা; আর কথাটা তার মিছেও ত নয়, কাল যে কথা বলেছিল, তাই ত হচ্ছে, ভাই!

পরি উপেক্ষার ভাব প্রকাশ করিয়া কহিল,—তুলুক গে পাঁচীল, ঐ একটা জায়গা বই ত নয়; না হয় ওখান দিয়ে আর দেখাশোনা হবে না, কিন্তু তাতেই কি মুখ দেখাদেখি বন্ধ হবে মনে করিস্?

শোভা হতাশের সুরে কহিল,—অখিলদা তাই বলেছে, ও বাড়ী যাবার যেখানে যত রাস্তা আছে সব বন্ধ করে দেবে।

পরি কহিল,—না হয় দিলে; কিন্তু তাতেও কি মুখ দেখাদেখি বন্ধ হতে পারে? ইস্কুলের রাস্তায় দেখা হবে, খেলার মাঠে দেখা হবে; ওখানে ত আর পাঁচীল তুলতে পারবে না!

শোভা আর্ত্তকণ্ঠে কহিল,—তখন বলবে, খবরদার ওর সঙ্গে মিশো না, কথা কয়ো না, চোখটী তুলে চেও না,—ও ছেলে ডাকাত। সেই থেকে ওরা ত বিশুদার নামই রেখেছে বিশে ডাকাত।

পরি একটু হাসিয়া কহিল,—তা ভাই নামটা ওরা বেছে বেছে ঠিকই রেখেছে; এইটুকু ছেলে, এই বয়সে কম কাণ্ডটা করলে! আর ডাকাত হওয়াও ত সোজা কথা নয়! গায়ে জোর চাই, মনে সাহস চাই, মাথায় বুদ্ধি চাই—

শোভা মুখ ঝাপটা দিয়া কহিল,—তুই থাম্; তোকে আর ডাকাতের বাখ্যানা করতে হবে না।

পরি হাসিয়া কহিল,—ভয় নেই, তোর বিশুদা তা বলে সত্যি সত্যিই ডাকাতি করবে না।

শোভা মুখখানার এক অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া কহিল,—ও ছেলে সব পারে!

পরি কহিল,—তবে ওদের কথায় তুই রেগে মরছিস্ কেন? না হয় তোর বিশুদাকে বিশে ডাকাতই বলেছে, তাতে তোর অত ঝাল কেন, শুনি?

শোভা মুখে বিস্ময়ের ভঙ্গী আনিয়া কহিল,—বা-রে! আমি বুঝি ঐ জন্যে রেগেছি!

পরি কহিল,—যত রাগ তোর পাঁচীল তোলার জন্যে তা বুঝেছি। কিন্তু তারও জবাব ত তুই দিয়েছিস, দিব্যি জবাব, তার জন্যে সত্যি-সত্যিই, শোভা, তোকে ভাই তারিফ করছি আমি।

—কি আমি বলেছি যে ঠাট্টা হচ্ছে?

—ঠাট্টা কোথায়, তারিফ! তুইই বল, তোর সে কথাটা কি বাহোবা দেবার মতন নয়?

—কোন্ কথা?

—সেই যে, তোর অখিলদার মুখের ওপর যে কথাগুলো বলেছিলি—পাঁচীলই তোলো, আর আমাকে ধরে বেঁধেই রাখো, আমি থাকবো এদিকে আর মন থাকবে ওদিকে—

শোভার মুখখানা হঠাৎ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। মনে মনে কি ভাবিয়া সে কহিল,—সত্যি ভাই, এখন আমার লজ্জা করছে, কি করে তখন এ-কথা বলেছিলুম! তা, ভাই, ওকথাগুলো ত আর আমার নিজের নয়, তোর কাছেই ত শেখা—

পরি জোর গলায় কহিল,—কি রকম?

শোভা কহিল,—মনে নেই, লয়লা-মজনুর গল্প যেদিন শুনিয়েছিলি, লয়লা ত ঐ কথাগুলোই ঠিক বলেছিল! আমার মনে ভাই কথাগুলো বেশ লেগেছিল; রাগের মাথায় সেইগুলোই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল,—সেই থেকে মরছি লজ্জায়!

পরি কহিল,—লজ্জা কিসের? কথাগুলো ত আর মিছে নয়, তোর মনের কথাই ত বলেছিস্, ভাই। শুধু লয়লা কেন, তার মতন যে সব মেয়েদের ওপর ঐ রকম পীড়ন আর বাঁধাধরা চলে, তাদের বুকের ভেতর দিয়ে ঠিক ঐ কথাগুলি ফুটে বেরোয় যে!

পরির কথাটা শোভার মনে বুঝি কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিল ; পরক্ষণেই এই সম্পর্কে আর একটা কথা খপ করিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল, একথাটা পরিকে শুনাইতে সে ভুলিয়াছিল। তাড়াতাড়ি কহিল,—ওদের আর একটা অন্যায় কথা তোকে বলতেই ভুলে গেছি! অখিলদা চোখ মুখ পাকিয়ে বললে কিনা—বিশুদার সঙ্গে ফের যদি কথা বলবি ত, নাকে দিয়ে মুখে গোবোর গুঁজে দেবো ; আর, ও-মুখো হলে, ঘরের ভেতর পুরে চাবি-তালা বন্ধ করে রাখবো। সাধে কি আমার ও রকম রাগ হয়েছিল, ভাই ?

পরি কহিল,—জবাব কিন্তু তোর খাসা হয়েছে, তোর অখিলদাও হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যখন তোদের ঝগড়া হচ্ছিল, বিশুদাও ত তাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনছিল ?

শোভা কহিল,—তাকে আর ত দেখিনি ; যেই আমি 'বিশুদা' বলে ডেকেছি, অখিলদা অমনি যেন বাঘের মত এসে আমার গলাটা চেপে ধরলে। তাই দেখেই বিশুদা মুখখানা কি রকম করে সরে গেলো।

—তার পরেই বুঝি কুসুম এসে আত্মসমর্পণের কথা বললে ?

—হ্যাঁ ভাই,—ঐ এক হতচ্ছাড়া মেয়ে এসে জুটেছে ? এসে অবধি আমাকে যেন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলে। আচ্ছা ভাই, আত্মসমর্পণ মানে কি ? কুসি ত খপ করে কথাটা বললে, শুনে অখিলদা চোখ দুটো কটমট করে আমার পানে তাকালে, আমি কথাটার মানে ঠিক বুঝতে না পেরে চুপ করেই চলে গেলুম। ওর মানেটা আমাকে বুঝিয়ে দিবি ?

পরি মুচকি হাসিয়া কহিল,—মানেটা কি সত্যিই তুই বুঝতে পারিস নি ? আমার ত ভাই, তা' মনে হয় না।

শোভা মুখখানা ভার করিয়া কহিল,—যাও! আর যদি কখখনো তোমাকে কোনো কথা বলি ? তোমাকে আর মানে বোঝাতে হবে না।

পরির মুখখানি তৎক্ষণাৎ হাসিতে ভরিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল,—অমনি মেয়ের রাগ হয়ে গেল! ভালো, তা হলে কথাটার মানে ভালো করেই বুঝিয়ে দিচ্ছি শোনো, রাগ এখ্‌খুনি পড়ে যাবে।—আত্মসমর্পণের দুটো মানে হয় বুঝলে? একটা মানে হচ্ছে—যুদ্ধ করতে করতে এক দলের রাজা অথবা সেনাপতি যখন দেখে আর জেতবার আশা নেই, নিজের দলের সকলকে নিয়ে বিপক্ষের কাছে যদি ধরা দেয়, তা হলেই সেটা হয় আত্মসমর্পণ। এর মানে আর একটা হচ্ছে এই—আপনাকে দান করা অর্থাৎ নিজেকে কারুর হাতে সঁপে দেওয়া। যেমন লয়লী দিয়েছিল মজনুকে, সুভদ্রা দিয়েছিল অর্জ্জুনকে, শৈবলিনী দিয়েছিল প্রতাপকে। এই তিনটি মেয়ের আত্মসমর্পণের গল্পও ত তোমাকে আগেই শুনিয়েছি। চারেরটি শুনিয়ে দিয়েছে কাল রাত্তিরে কুসুম আর সেটা আরো ভালো করে শোনবার ইচ্ছাটি তোমার হয়েছে বলেই, আমাকে—

শোভার মুখখানি পুনরায় লাল হইয়া উঠিল, অপাঙ্গে পরির দিকে চাহিয়া ও তাহার মুখখানি তাড়াতাড়ি চাঁপার কলির মত আঙ্গুলগুলি দিয়া চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া কহিল,—চুপ কর্, পোড়ারমুখী!

পরি শোভার শিথিল আঙ্গুলগুলির ফাঁক দিয়াই হাসির ঝিলিক তুলিয়া কহিল,—মুখে চাপা দিলে কি মনের কথা চেপে রাখা যায়? নিজের মুখেই ত তুই বলেছিস্ ভাই, পাঁচীল তুললেও মনকে আড়াল করা চলে না।

শোভা পরির মুখ হইতে হাতখানি সরাইয়া লইয়া কহিল,—আচ্ছা, তুই আজ আমার সঙ্গে এমন করে লাগছিস কেন, শুনি? আমি তোর কি করেছি?

পরি হাসিয়া কহিল,—বলবো? তুই আমাদের বিশুদাকে বিবাগী

হবার যো করেছিস ! বেচারীর মুখখানা দেখলেই আমার কষ্ট হয়। সে হাসি নেই, কথায় কথায় সে রাগও আর দেখি না, যেন কেমন মনমরা হয়ে গেছে। এর গোড়া ত তুই !

পরির কথায় শোভার চক্ষু দুইটি ছল ছল হইল, গলাটিও সহসা যেন ধরিয়া আসিল, গাঢ়স্বরে সে কহিল,—দোষ বুঝি আমার ! কে আগে ঝগড়া বাধিয়েছিল, তোর বিশুদাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখিস্ না !

পরি কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু ক্লাসে যাইবার ঘণ্টা বাজায় তাহার আর বলা হইল না; তাড়াতাড়িই দুইজনে নিজ নিজ ক্লাসের দিকে ছুটিল।

ছুটির পর টিফিনের সময়ের কথাটা পথে চাপা পড়িয়া গেল হাজীর কথায়। হাজী সহসা পরির কাণের কাছে মুখখানি রাখিয়া চুপি চুপি কহিল,—হ্যাঁ ভাই, নতুন বাড়ীতে বিশু ভাইকে নিয়ে মজলিসের কথা ত ওকে কইলি নি ?

পরি অমনি মুখখানি ঘুরাইয়া কহিল,—ঐ যা। কি ভুলো মন আমার; তখন অত কথা হল, অথচ, আসল কথাটাই তোকে বলতে ভুলে গেছি শোভা।

শোভার মনটি এ সময় ভালো ছিল না; তথাপি পরির কথাটা তাহার বিমর্ষ মনে বিশেষ কৌতূহলের সঞ্চার করিল। দুই চক্ষুতে প্রশ্নের চিহ্ন ফুটাইয়া সে পরির দিকে চাহিল।

পরি কহিল,—বিশুদাকে নিয়ে ভারি একটা মজার কাণ্ড করা হচ্ছে যে।

আবার বিশুদা ? টিফিনের পর শোভা ক্লাসে বসিয়া মনে ঠিক দিয়া রাখিয়াছিল, বিশুদাকে লইয়া কোন কথাই আর সে তাঁহার সহিত বলাবলি করিবে না! কেন,—কিসের জন্য তাহার এত গরজ ? এই

এতদিন বিশুদার সহিত তাহার আর মেলামেশা নাই, কথাবার্ত্তা বন্ধ, তবু কি তাহার দিন কাটিতেছে না? কিন্তু ছুটির পথে পরির মুখে বিশুদার নামটি উঠিতেই শোভার অজ্ঞাতেই যেন তাহার মুখ দিয়া একটা সংক্ষিপ্ত স্বর বাহির হইয়া আসিল,—কি?

পরি কহিল,—বিশুদার অপবাদ ঘুচিয়ে মান বাড়াবার জন্যে আমরা যে সম্বর্দ্ধনা সভা করছি।

ডুই চক্ষু কপালে তুলিয়া শোভা বিস্ময়ের সুরে কহিল,—সে আবার কি?

পরি মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—তুই ভারি নেকী! কেন শুনিস নি, দেশের জন্যে কাজ করে কারুর জেল হলে, দেশের লোকে সভা করে তাকে বাহাবা দেয়, কত কি উপহার দেয়, কত তারিফ করে। বিশুদাকে নিয়েও আমরা সেই রকম একটা কিছু করছি।

শোভা কহিল,—দূর! ওর কি জেল হয়েছে যে ওসব করবি?

পরি কহিল,—জেলে না যাক, আসামী ত হয়েছিল। এই নিয়ে ওদের ইস্কুলের ছেলেরা নাকি কত কি বলেছে। সেই জন্যই দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা এই কাণ্ড বাধিয়ে বসেছি। বাবাকেও কথাটা বলেছি, তিনি খুব খুসী হয়ে মত দিয়েছেন।

শোভা কহিল,—তাতে কি হবে?

পরি জানাইল,—এ অঞ্চলে যতগুলো ইস্কুল আছে, সমস্ত ইস্কুলের ছেলেদের নেমন্তন্ন করা হবে, ইস্কুলের মাষ্টারদের বলা হবে; তারা সকলে সভায় আসবে। সকলের সামনে বিশুদার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হবে, কত কি উপহার দেওয়া হবে, মাষ্টারেরা সকলেই তার প্রশংসা করবে।

একটা অপ্রত্যাশিত উল্লাস শোভার বুকটির ভিতর দিয়া বুঝি কণ্ঠ

পর্য্যন্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, মুখ ও দুই চক্ষুতেও তাহার প্রভাব প্রকাশ পাইল। একটা কি কথা সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময় হাজীর কথা তাহাতে বাধা দিল। পিছন হইতে সে সহসা ছুটিয়া আসিয়া শোভার একখানা হাতে টান দিয়া সহর্ষে কহিল, —আর শুনেছিস, পরি কেমন ছড়া বেধেছে;—সত্যি কি সোন্দোর ভাই—

পরি দুই চক্ষু পাকাইয়া হাজীর দিকে চাহিয়া কহিল,—'সোন্দোর' বললি যে বড়? বল্—সুন্দর।

পরির এই কঠোর শাসনে হাজির প্রফুল্ল মুখখানা নিমেষে ম্লান হইয়া গেল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে কহিল,—ছেরকাল কয়ে এনু—

পরি শিক্ষয়িত্রীর মত মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল,—আবার! একটা ভুল চাপা দিতে আর একটা ভুল? 'ছেরকাল' কেন বললি শুনি? ওটা হবে—চিরকাল। তা চিরকালই কি ভুল করে মরবি? এই যে চিরকাল তোদের বাড়ীর সবাই মূর্খ থেকেই গেছে, তবে তুই লেখাপড়া শিখছিস কেন?

শোভা কহিল,—মাষ্টার মশায় থামুন, ঢের হয়েছে।

পরি কহিল,—এমনি করে ওর প্রত্যেক কথাটি ধরে না দিলে ওকে মানুষ করতে পারব না ভাই, জন্তু হয়েই থাকবে।

হাজী মুখখানা ভার করিয়া গোঁভরে আপনমনেই অগ্রসর হইল। পরি কহিল,—দেখছিস আবার মেয়ের রাগ!

শোভা কহিল,—ওরকম করে বললে রাগ হয় না বুঝি! আয় ভাই হাজী, আমরা দুজনে হাত ধরাধরি করে যাই—

শোভা একটু দ্রুত গিয়া হাজীর একখানি হাত ধরিল। হাজি কহিল,—তুমি ছাড়ো, কাল থেকে আমি আর যদি 'নিকতি' আসি!

পরি পুনরায় ধমক দিয়া কহিল,—ফের বলে 'নিকতি!' কেন, 'লিখতে' বলতে কি হয়েছিল?

হাজী প্রতিবাদের ভঙ্গীতে এবার কহিল,—কেন, ওরা ত সবাই কয়।

পরি কহিল,—ওরা ত সবাই দলিজে বসে কল চালায়, সেলাই করে, তুই কেন করিস না? সবাই যা বলবে, তোকেও তাই বলতে হবে নাকি?

শোভা কহিল,—না বাপু, তোর পণ্ডিতগিরির জ্বালায় আর পারি ন কবিতার কথাটা চাপাই পড়ে গেল।

পরি কহিল,—তোমার মনটি যে ঐ দিকেই পড়ে আছে, তা কি আর আমি জানি না। ভাবনা নেই, বলছি।

শোভা ঝঙ্কার দিয়া কহিল,,—থাক্, আর তোমার বলে কায নেই; আমিও হাজীর দলে ভর্ত্তি হলুম,—চল্ আমরা যাই।

পরি কহিল,—বটে! আমাকে এক ঘরে করতে চাও দুটিতে মিলে? তা হচ্ছে না; এতখানি পথ আমি কিছুতেই মুখ বুজিয়ে যেতে পারবো না—হাঁফিয়ে মরবো। তার চেয়ে আমি না হয় আত্মসমর্পণই করছি তোমাদের কাছে—আমাকে মাপ করো।

পরির কথায় হাজী হাসিয়া উঠিল, শোভা দুই চক্ষুর কোণে হাসি ফুটাইয়া কহিল,—বুঝিছি, কথাটা নিয়ে আমাকেই খোঁটা দেওয়া হ'ল!

পরি কহিল,—না হয় এর জন্যে আর এক দফা মাপ চাইছি।

শোভা হাসিয়া কহিল,—আমরা দুজনেই খুসী হয়েছি, তোর সাত খুন মাপ—

পরি কহিল,—তবে এবার কবিতার কথাই বলি শোন্। ঐ যে সভার কথা বললুম না, দাদা সেই সভায় বিশুদার গুণের কথাগুলো নিয়ে

একটা প্রবন্ধ লিখেছে, আর আমাকে বলেছে—একটা কবিতা লিখ্তে।

শোভা বিস্মিত হইয়া কহিল,—কি করে তুই কবিতা লিখিস্, ভাই; আমি ত ভেবে পাই না।

পরি কহিল,—ও একটা অভ্যেস ; দাঁড়ানা, দিন কতক পরে তোকেও কবিতা বাঁধিয়ে তবে ছাড়বো।

শোভা কহিল,—ওরে বাবা—আমি ? বলে, একখানা চিঠি লিখতে বসলেই বুক ঢিপ ঢিপ করে, হাত কাঁপে।

পরি কহিল,—তা বললে ত হবে না, লিখতেই হবে।

শোভা সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিল,—কি লিখব ?

পরি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল,—কেন, বিশুদার কথা। তার সম্বন্ধে তোর চেয়ে বেশী কথা আর কে জানে বল ?

শোভা কহিল,—আমি পারব না, ভাই !

পরি তাহার কথায় জোর দিয়া কহিল,—পারতেই হবে, পারা চাই। কেন পারবি নি ?

শোভা কহিল,—কি লিখতে হয়, কি রকম করে কথা বেঁধে বেঁধে লোকে লেখে, আমি কি তার কিছু জানি ?

পরি কহিল,—আমি জানিয়ে দেব। তোর কাছে ত আমার বাঁধানো 'প্রদীপ' আছে। তাতে একটা লেখা আছে, সেটার নাম 'লাঞ্ছিতের সম্মান'। সুরেন বাঁড়ুয্যে, তিলক, কাব্যবিশারদ, লাজপত রায়, লিয়াকৎ হোসেন—এই রকম সব নামী লোকের ছবি আর সম্মানের কথা তাতে আছে। বাড়ীতে গিয়ে সেগুলো পড়বি খুব ভাল করে, তারপর ভাববি বিশুদার কথা, তখন দেখবি লেখবার ভাব আপনি আপনিই আসবে। নিজে যা পারবি লিখবি, তার পর ইস্কুলে কাল আমাকে দেখাবি, আমি দাদাকে দিয়ে ঠিক করে দেব।

শোভা কহিল,—তা যেন হল, কিন্তু ভাই আমার বড় লজ্জা করে।

পরি মুখখানি মচকাইয়া কহিল,—আহাহা খুকী! লজ্জা করে লিখতে। আর মুখ দিয়ে সে কথা বলতে লজ্জা করল না—পাঁচীলের এদিকে আনি আর ওদিকে আমার মন?

শোভা ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—ঝকমারি করেছি, ঐ কথাটা তোমাকে বলে; আর যদি কখনো কোন কথা বলি—

পরি মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—কথা আর বলতে হবে না তোমাকে, এখন থেকে লেখাটাই সুরু করো!

শোভা কহিল,—বয়ে গেছে আমার!

পরি সহজকণ্ঠে কহিল,—বেশ, তাহলে কুসুমকেই অগত্যা ধরবো; তাকেই বলবো—তুমি ভাই আত্মসমর্পন নাম দিয়ে একটা কিছু বিশুদার সম্বন্ধে লিখে দাও ত!

পরির কথাটা যেন তীরের ফলার মত শোভার বুকে বিঁধিল। মুখখানা শক্ত করিয়া সে কহিল,—বাবা! তুমি ধন্যি মেয়ে, সব পার তুমি।

পরি কহিল,—কি করি বল? কেউ না কিছু পড়লে সভা জমবে কেন? দাদা পড়বে গল্প, আমি পড়বো পদ্য, তার পরেরটা পড়বার লোক ত একজন চাই। তোমাকে যদি একান্তই না পাই, কুসুমই সই।

শোভা কহিল,—না হয় লিখলুম, কিন্তু তারপর? আমাকে বুঝি সেখানে যেতে দেবে ওরা?

পরি কহিল,—বেশ ত, নাই বা গেলে; লেখাটা আমার কাছে দেবে, আমি পড়বো।

শোভার মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটিল; কহিল,—তা যদি হয়, না হয় চেষ্টা করে দেখি; কিন্তু ভাই, আমি হিজিবিজি যা লিখে আনব, তোমাকে ঠিক করে দিতে হবে।

পরি সম্মতি জানাইয়া কহিল,—তাই হবে। তুইত আগে একটা কিছু লিখে আন।

ইতিমধ্যেই তাহারা বড় বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। শোভা ঘাড়টি দুলাইয়া হাসিমুখে কহিল,—তাহলে ভাই আসি, কাল আবার দেখা হবে।

পরি কহিল,—কিন্তু লেখা আনতে যেন ভুল না হয়।

২৫

তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া ও স্কুলের কাপড় ছাড়িয়াই শোভা পরির দেওয়া বইখানি লইয়া পড়িল।

মা কহিলেন,—এসেই মেয়ে বই মুখে দিয়ে বসলেন, মুখে কিছু দিতে হবে না ?

শোভা কহিল,—আমার এখন ক্ষিদে নেই, একটু পরে খাবো।

মা কহিলেন,—রান্না ঘরে খাবার ঢাকা চাপা আছে ; আমি গা ধুতে চললুম।

শোভার মন তখন প্রকাণ্ড বাঁধানো বইখানার পাতায় নিবদ্ধ। 'লাঞ্ছিতের সম্মান' নামক লেখাটি খুঁজিয়া বাহির করিতে সে পাতার পর পাতা উল্‌টাইয়া চলিল। তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে বইখানার গোড়ার দিকে সূচি পৃষ্ঠাটি ছিল না।

ইতিমধ্যে অখিল শোভার সন্ধানে আসিয়াছিল। বাহির হইতে উঁকি দিয়া সে দেখিল তাহার খেলার সাথীটি স্কুল হইতে ফিরিয়াই আবার বই লইয়া বসিয়াছে। পা টিপিয়া টিপিয়া চুপি চুপি সে ঘরের ভিতরে ঢুকিল এবং তাহার ঠিক পিছনটিতে দাঁড়াইয়া ঐই নূতন ধরণের পড়ার কায়দাটা দেখিতে লাগিল।

শতাধিক পৃষ্ঠার শিরোনামা ইতিমধ্যে দেখা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু লাঞ্ছিতের সন্ধান এ পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই। এত বড় বইখানার ভিতর কোথায় সেটি আছে, কে জানে? যেখানেই থাকুক, শোভার জিদ, খুঁজিয়া তাহাকে বাহির করিবেই।

কিন্তু হঠাৎ এখানেই তাহার উৎসাহে বাধা দিল অখিলের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বর,—ঢের হয়েছে, আর কেন; এত বিদ্যে রাখবি কোথায়?

শোভা তাড়াতাড়ি বইখানা চাপা দিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিল; অখিল বইখানার দিকেই হাত বাড়াইয়া কহিল,—কি বই দেখি?

শোভা বইখানা একটু তফাতে সরাইয়া ও তাহার উপর আঁচোলটি ভাল করিয়া চাপা দিয়া কহিল,—এ বই আমার নয়।

—কার রে?

—আমার এক বন্ধুর।

—ও-বাবা! তোর আবার বন্ধু জুটেছে নাকি? বন্ধুটি কে শুনি?

—যেই হোক না, তাতে তোমার খোঁজে দরকার?

—বটে! ভারি কথা যে আজকাল শিখিছিস দেখছি।

—আমি ত তোমার সঙ্গে কথা কইতে যাই নি, বসে বসে বই পড়ছিলুম, তুমি কেন মিছিমিছি ঝগড়া করতে এলে?

—ও! বই পড়ছিলেন! তবু যদি না দেখতুম পড়ার ঘটা! খালি পাতাগুলো উল্‌টিয়ে জানান হচ্ছিল উনি কত বড় পড়িয়ে!

শোভা ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—বেশ! আমার খুসী। তোমাকে ত ডাকি নি আমার পড়ার বাখ্যানা করতে!

এ পর্য্যন্ত শোভার মুখ দিয়া এরূপ রূঢ় কথা অখিল কোন দিন শুনে নাই। কথাগুলি শুনিয়া কিছুক্ষণ সে গুম হইয়া রহিল। গত রাত্রেও

এই মেয়েটি এমন কতকগুলি কথা তাহাকে শুনাইয়া দিয়াছে, যাহা তাহার নিকট মোটেই প্রীতিকর হয় নাই এবং সেই কথাগুলির সম্বন্ধে বোঝাপড়াও এ পর্য্যন্ত মুলতবী রহিয়াছে। এখনকার কথাগুলির ঝাঁঝ আরও কড়া, সুর আরও চড়া; ইহার স্পর্দ্ধা যেন ক্রমশঃই মাত্রা ছাড়াইয়া চলিয়াছে। অথচ, সে তাহাদেরই একজন গোমস্তার মেয়ে বইত নয়—তাহাদেরই দয়ায় টিকিয়া আছে।

কিন্তু অখিল মনের রাগ মনের ভিতরেই চাপিয়া রাখিল এবং কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর অস্বাভাবিক সুরে কহিল,—আমার ঘাট হয়েছে, তবে বাইরের ঘরে বাবা আপনাকে ডাকছেন, তাই হুকুম না নিয়েই আপনার ঘরে ঢুকেছিলুম। এর জন্যে মাপ চাচ্ছি।

অখিলের মুখখানা দেখিয়া ও মুখের কথা শুনিয়া শোভার বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। গত রাত্রেও অখিলের সহিত তাহার যে কথা কাটাকাটি হয়, তাহাতেই সে লজ্জায় সমস্ত সকালটাই অতি সন্তর্পণেই অখিলকে এড়াইয়া গিয়াছে। এ বেলায় পরির কথায় লেখার নেশায় অখিলের কথা ভাবিবারও সে সময় পায় নাই। তাহার পর সেই অখিলের সহিত এমন অবস্থায় সহসা দেখা হইল এবং সেও এমন খোঁচা দিল, গত রাত্রের কথাগুলি মনে স্থান না দিয়াই শোভা আজ যেন বেপরোয়া হইয়াই তাহাতে পাল্টা আঘাত দিয়াছিল। কিন্তু একটু পরেই হুঁস হইতে সে বুঝিল, কত বড় দুঃসাহসের কাযই সে করিয়া ফেলিয়াছে।

অখিলের কথার উত্তরে শোভা কণ্ঠের স্বর যতদূর সম্ভব কোমল করিয়া কহিল,—রাগ করলে, অখিলদা!

অখিল কহিল,—আমার রাগে আপনার ক্ষতি?

শোভা কহিল,—তোমার দুটি পায়ে পড়ছি, অখিলদা, আমাকে

মাপ করো, আমার কথা যেন তুমি ধরো না—রাগ ক'র না,—লক্ষ্মীটি ! বল, রাগ তোমার নেই ?

অখিল কহিল,—তাহলে আগে বল, তোর বন্ধুটি কে ?

শোভার বুকের ভিতরটা আবার ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল ; কহিল,—আমাদের ইস্কুলের একটা মেয়ে।

—নামটিও শুনি না।

—তার নাম—পরি।

অখিলের মুখখানা আবার অন্ধকার হইয়া গেল। শোভার মুখে কথায় কথায় পরির পরিচয় সে আগেই পাইয়াছে। যদিও ইদানীং শোভা খুবই সতর্ক হইয়া এই ছেলেটির সহিত কথাবার্ত্তা কহিত এবং পরির প্রসঙ্গ একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু গোড়ার দিকে বিশুদার সহিত রহিম নামক ছেলেটির ঝগড়া ও তাহার বোন পরির সাহিত একদিনেই তাহার ভাব হইবার যে আখ্যান সে শুনাইয়াছিল, তাহাতে পরির নামটি অখিলের পক্ষে ভুলিবার কথা নহে, বরং মামলার সম্পর্কে নানা সূত্রে ইহাকেও সে বিরোধী দলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

মুখ দেখিয়া মনের ভাবটুকু ধরিবার মত অভিজ্ঞতা শোভা তাহার বিশুদার কল্যাণেই সঞ্চয় করিয়াছিল, সুতরাং অখিলের শুষ্ক মুখটির ভিতর দিয়াই সে তাহার মনের ক্ষোভটুকু বুঝিতে পারিল এবং সেটা চাপা দিবার অভিপ্রায়েই তাড়াতাড়ি কহিল,—বইখানা কাল সকালেই তোমার পড়বার ঘরে দিয়ে আসব, অখিলদা।

অখিল উপেক্ষার সুরে কহিল,—দরকার নেই, বই তোমাকে দিয়ে আসতে হবে না।

মনে ব্যথা পাইয়া শোভা জিজ্ঞাসা করিল,—কেন ?

অখিল কণ্ঠের স্বর রুক্ষ করিয়া প্রশ্নটার উত্তর দিল,—মোচনমানের বই আমি ছুঁই না, আমি বামুনের ছেলে।

কথাটা শোভার ভাল লাগিল না এবং ইহার উত্তর দিতেও তাহার কিছুমাত্র বাধিল না। মুখখানা শক্ত করিয়াই কহিল,—আমাদের পড়ার বইয়ে আছে, বইগুলো সমস্তই দপ্তরীরা বাঁধে, তারা বুঝি সবাই বামুন ?

অখিল পুনরায় সুর পাল্‌টাইয়া কহিল,—আপনার সঙ্গে তর্কে আমি পারব না, বললুম না—বাবা ডেকেছেন, যেতে ইচ্ছে হয় আসুন।

শোভা নিরুত্তরে অখিলের মুখের দিকে একবার প্রখর দৃষ্টিতে চাহিল ; তাহার পর বইখানা যথাস্থানে তুলিয়া রাখিয়া বিরক্তির ভাবেই কহিল,—চল।

ঘরের বাহিরের বারান্দাটির উপর উভয়ে আসিবামাত্রই অখিল হঠাৎ মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া শোভার দিকে চাহিয়া হাসিল।

শোভাও মুখে হাসি ফুটাইয়া কহিল,—এই ছেলের অত রাগ, আর এখুনি মুখে হাসি !

অখিল উঠানটির দিকে হাতের একটি অঙ্গুলি হেলাইয়া কহিল, হাসি এল ঐটে দেখে। কেমন হচ্ছে ?

শোভা দুই পা অগ্রসর হইয়া বারান্দাটির রেলিংএ ভর দিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে বুকের ভিতরটি তাহার ছ্যাঁত করিয়া উঠিল ; আড়ষ্ট হইয়াই সে দেখিল, উঠানের প্রান্তভাগে তাহাদের সীমানাটির উপর ইতিমধ্যেই প্রাচীর হাত দুই উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে প্রাচীরের অপর প্রান্তে বিশুদের মুক্ত বারান্দাটির দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিল—আজ তাহা এখান হইতে লক্ষ্য হইতেছে, কিন্তু ইহার পর ?

অখিলই ইহার উত্তর দিল। হাসিমুখেই কহিল,—আজ দেখছিস ঐটুকু উঠেছে, কাল ইস্কুল থেকে এসে দেখবি মাথায় মাথায়, তারপর পরশু দিন একবারে জেলখানা। বিশে ডাকাতদের বাড়ীর তিরসীমাও আর চোখে পড়বে না,—কি মজা!

শোভা কোন উত্তর না দিয়াই অখিলের পাশ কাটাইয়া নীচের দিকে চলিল।

অখিল শোভার অনুসরণ করিয়া কহিল,—আর একটা মজার খবর তোকে দেওয়া হয় নি, শোভা!

শোভা কোনও কথা কহিল না বা মজার খবরটি শুনিবার জন্য তাহাকে পিছনে ফিরিয়া চাহিতেও দেখা গেল না।

অখিল কহিল,—সেই মংচুর কথা তোকে বলেছিলুম, মনে আছে ত? রেঙ্গুনে আমাকে পড়াতো, সে আজ দুপুরের গাড়ীতে এখানে এসেছে। এখানেই সে থাকবে, আর তোকে আমাকে পড়াবে।

সিঁড়ি পার হইয়া তখন তাহারা উঠানে নামিয়াছে। শোভার মুখ দিয়া এই সময় একটা মৃদু স্বর বাহির হইল,—কে?

অখিল কহিল,—তবে শুনলি কি? বললুম না—মংচু! চমৎকার ছেলে। বয়সে যদিও আমার চেয়ে বড়, কিন্তু দেখতে ঠিক আমারই মতন মাথায় মাথায়; কিন্তু তা বললে কি হয়—এই বয়েসেই মংচু এফ্ এ পড়ছে; বাবা বলেছেন, মংচু আমাদের পড়াবে আর আমাদের বাড়ীতে থেকেই নিজেও পড়বে।

শোভা নীরবেই শুনিল, কিন্তু মংচুর সম্বন্ধে কোনও রূপ আগ্রহই তাহার দেখা গেল না বা কোনও প্রশ্নও সে অখিলকে করিল না।

অখিলের সকল কথা তখনও শেষ হয় নাই। একটু থামিয়াই সে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল,—হ্যাঁরে, মংচুর প্যাঁচের কথা কি তখন তোকে বলেছিলুম? সেই যে—জিজিৎসুর প্যাঁচ—

শোভা এবার কহিল,—কই না ত! সে আবার কি?

অখিল কহিল,—সে একটা ভারি মজার কায়দা; এই ত তুই দাঁড়িয়ে আছিস, মংচু হঠাৎ তোর কাঁধটা ধরে একটু টিপলে, ব্যস—অমনি তুই একবারে চিৎপটান। যত বড়ই জোয়ান হোক না কেন, মংচুর পাল্লায় পড়লেই একবারে কুপোকাৎ। এইবার বিশে ডাকাতের যম এসেছে—জানলি?

শোভার বুকখানা এবার যেন দুলিয়া উঠিল। যতই তাহার অল্প বয়স হউক না কেন, এভাবে অখিলের মংচু নামক মানুষটির বাখ্যানা করিবার আসল কারণটুকু সে এতক্ষণে বেশ স্পষ্ট করিয়াই বুঝিতে পারিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও আর বাহির হইল না। সঙ্গিনীটিকে নীরব দেখিয়াও অখিলের উৎসাহ কিছুমাত্র হ্রাস পাইল না, মংচুর সম্বন্ধে নানারূপ উচ্ছ্বাস ও তাহার সাহায্যে বিশে ডাকাতকে জব্দ করিবার বিবিধ আভাস প্রকাশ করিয়াই সে বাহিরের ঘরের দিকে চলিল।

আরাম কেদারায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আলবোলার নলটি মুখে দিয়া চন্দ্রনাথ বাবু যে ছেলেটির সহিত গল্প করিতেছিলেন, হঠাৎ তাহাকে দেখিলে বুঝিবার উপায় ছিল না যে, ছেলেটি বাঙ্গালী নহে—ব্রহ্মবাসী। বাঙ্গালীর মতই তাহার বেশভূষা, এমন কি মাথায় চুলের টেরীটি পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর রুচি অনুযায়ী কাটা। বাঙ্গালা কথাও তাহার ঠিক বাঙ্গালীর মত, যদিও উচ্চারণে একটু টান দেখা যায়, কিন্তু সে রকম টান বাঙ্গালার সুদূর পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের উচ্চারণেও থাকে। ছেলেটির আকৃতি বয়সের অনুপাতে যথেষ্ট খর্ব্ব, কিন্তু তাহা হইলেও প্রত্যেক অঙ্গটি তাহার নিটোল ও সুদৃঢ়। বৈষম্য তাহার চ্যাপটা মুখখানিতেই দেখা দিয়াছে। কিন্তু তথাপি তাহাতে সৌন্দর্য্যের অভাব ছিল না। মুখের তুলনায় চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র হইলেও, এত অধিক তীক্ষ্ণ যে, কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না।

দৃষ্টি যেন চর্ম্মভেদ করিয়া মর্ম্মের ভিতর জোর করিয়া প্রবেশ করিতে ব্যগ্র। গায়ের রং ছেলেটির এত সুন্দর যে, অখিলের মত পরম সুন্দর ছেলেও তাহার পাশটিতে দাঁড়াইলে মনে হইবে যে, গায়ের রংয়ের দিক দিয়া অখিলই একমাত্র আদর্শ নহে—তাহার অনেক উপরেই মংচুর স্থান।

অখিল ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই কহিল,—শোভা এসেছে।

চন্দ্রনাথবাবু দ্বারের দিকে চাহিয়া ডাকিলেন,—কইরে শোভা, আয়—এদিকে।

মংচু ঘরের দরজাটির দিকেই মুখ করিয়া বসিয়াছিল। শোভা ধীরে ধীরে লজ্জিত ভাবেই ঘরের ভিতর ঢুকিতেছিল। পরদার পাশ দিয়া চৌকাঠটি পার হইতেই সর্ব্বাগ্রে মংচুর সহিতই তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল এবং তাহার ফলে একটা ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি উপস্থিত হইয়া সকলকেই বিচলিত করিয়া দিল।

মংচুর মুখখানার উপর শোভার দুইটি উৎসুক চক্ষুর পরিপূর্ণ দৃষ্টি পড়িবামাত্রই তাহার সমস্ত দেহখানা মোচড় দিয়া একটা ভয়াবহ স্মৃতি তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্কের ভিতর ফুটিয়া উঠিল; পরক্ষণেই মংচুর দুই চক্ষুর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিও যেন সুস্পষ্ট ও সুপরিচিতের মত শোভাকে এক নিমেষে স্তব্ধ করিয়া দিল। এ মুখ, এ চেহারা, এই দৃষ্টি আর এই ভয়ঙ্কর মানুষটি ত তাহার অপরিচিত নহে, শোভা যে ইহাকে দেখিয়াছে—সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার রাত্রে স্বপ্নের ভিতরে এবং তাহার পর আরও কত রাত্রেই গভীর নিদ্রার ঘোরে এই মুখখানাই তাহার অন্তরে শিহরণ তুলিয়াছে। সেই মুহূর্ত্তেই শোভার চক্ষুর উপর যেন ভাসিয়া উঠিল—সেই কালো ঘোড়ার গাড়ী, ভিতরে বন্দিনী অবস্থায় সে বসিয়া আছে, পার্শ্বে অখিল এবং সম্মুখে যে লোকটা ছোরা উঁচাইয়া বসিয়াছিল

এবং শোভা চীৎকার করিতেই ছোরাখানা তাহার বুকে বসাইয়া দিয়াছিল, সেই লোকটা—ঐ—ঐ—ঘরের ভিতর চেয়ারখানির উপরে বসিয়া!

অমনই শোভার মাথাটা ঘুরিয়া গেল, একটা আর্ত্তস্বর কণ্ঠের ভিতর দিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তাহা আর বাহির হইল না। সটান সম্মুখের দিকে তাহার সংজ্ঞাহীন দেহখানা হেলিয়া পড়িল।

মংচু এই সময়টুকু বদ্ধ দৃষ্টিতেই এই অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়াছিল। সে যে হঠাৎ বেসামাল হইয়া পড়িয়াছে, মংচুই তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল; সুতরাং সেই মুহূর্ত্তেই সে সবেগে আসিয়া শোভার পতনোন্মুখ দেহখানা দুই হাতে ধরিয়া ফেলিল এবং যে চেয়ারখানিতে সে বসিয়াছিল, ধীরে ধীরে তাহার উপরেই তাহাকে রাখিয়া অখিলের দিকে চাহিয়া কহিল,—পানি, জলদি।

পিতা পুত্র উভয়েই তখন বিস্ময়ে অবাক! ঘরের ভিতরেই কোণের দিকে একটা কুঁজা ছিল, তাহার মাথায় একটা গেলাসও ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে দেখা গেল। অখিল সেইদিকে ছুটিল।

চন্দ্রনাথ বাবু গড়গড়ার নলটা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিলেন,—হল কি? ফিট নাকি! ওর কি তাহলে ফিট হয়?

জোরে হাঁকিলেন,—বাহাদুর!

পাশের ঘরেই বাহাদুর ছিল; ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—জী, হুজুর!

চন্দ্রনাথ বাবু হুকুম দিলেন,—পাখা করো জলদী!

কাছেই একখানা অতিকায় পাখা রাখা ছিল, সময়বিশেষে প্রভুর পরিচর্য্যায় বাহাদুরই ইহা ব্যবহার করিত। হুকুম পাইবামাত্রই বাহাদুর দুইহাতে সজোরে সুবৃহৎ পাখাখানা হাঁকরাইতে আরম্ভ করিল।

মংচু অখিলের হাত হইতে জলের গেলাসটি লইয়া নিজেই শোভার

চোখে ও মুখে আস্তে আস্তে জলের ছিটা দিল, কপালের শিরাগুলি সুকৌশলে দলিয়া দিয়া তাহার চৈতন্য সঞ্চারের চেষ্টা করিতে লাগিল।

চন্দ্রনাথ বাবু শোভার বাবাকে ডাকিয়া আনাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় শোভা দুই চক্ষু মেলিয়া চাহিল। পরক্ষণেই সে সোজা হইয়া বসিল এবং হাত দিয়া মংচুর হাতখানা তাহার মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিল।

চন্দ্রনাথ বাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—বাঁচা গেল!

তাহার পর শোভার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—কি হয়েছিল রে? তোর বুঝি ফিটের ব্যারাম আছে?

শোভা ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল—না।

চন্দ্রনাথ বাবু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—তবে এ রকম হল কেন?

শোভা কহিল,—মাথাটা কেমন হঠাৎ ঘুরে গেল। আমি বাড়ীর ভেতর যাই—

চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—না, এখন যেতে হবে না; চুপ করে বসে থাক্। বাহাদুর হাওয়া করুক খানিকক্ষণ।

মংচু এই সময় প্রশ্ন করিল,—এরই নাম বুঝি শোভা?

অখিল এই প্রশ্নটির উত্তর দিল; কহিল,—হাঁ।

চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—একেই তোমায় পড়াতে হবে, মংচু। স্কুল থেকে ওর নাম কাটিয়ে দেব। কিচ্ছু পড়াশোনা সেখানে হয় না, শুধু ডেঁপোমী শেখে।

শোভা নির্জ্জীবের মত চেয়ারখানির উপর বসিয়া কথাগুলি শুধু শুনিয়া যাইতে লাগিল। শরীরের এই অবস্থাতেও তাহার এই চিন্তাটি তালগোল পাকাইতেছিল যে, ইহাদের আসার সঙ্গে সঙ্গেই বিশুদায়

সঙ্গে সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে, এবার মংচু আসাতে পরির সঙ্গেও বুঝি দেখা সাক্ষাতের পাঠ উঠে!

এই সময় দরজার পরদাটি এক পাশে ঠেলিয়া ঘরের ভিতরে সপ্রতিভ-ভাবে প্রবেশ করিল রহিম। তাহার হাতে একখানি চিঠি। চিঠি শুদ্ধ হাতখানি তুলিয়া সে সসম্ভ্রমে চন্দ্রনাথ বাবুর উদ্দেশে অভিবাদন জানাইল।

চন্দ্রনাথ বাবু রহিমের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিলেন, পরক্ষণেই রুক্ষকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—কি খবর?

রহিম নিরুত্তরে অগ্রসর হইয়া চিঠিখানি তাঁহার হাতে দিল। ইতি-মধ্যেই অখিল পিতার চেয়ারখানির ঠিক পাশটিতে গিয়া তাঁহার কাণের কাছটিতে মুখখানি রাখিয়া চুপি চুপি জানাইয়া দিল,—এই ছেলেটার নাম রহিম, বিশুর বন্ধু।

চন্দ্রনাথ বাবু চিঠি হইতে চক্ষুর দৃষ্টিটুকু তুলিয়া আরও তীক্ষ্ণ করিয়া আর একবার পত্রবাহক ছেলেটির দিকে চাহিলেন। সে দৃষ্টির অর্থটুকু অদূরে চেয়ারখানায় আড়ষ্ট ভাবে বসিয়া শোভা পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিল।

চিঠি পড়িতে পড়িতে তাঁহার সুন্দর মুখখানা যেন একেবারে বদলাইয়া গেল। হাতের লেখা একখানা সাধারণ চিঠি, কিন্তু তাহাতে বিবৃত বিষয়টি অসাধারণ! চিঠিতে যথাবিহিত সম্মান পূর্ব্বক নিবেদন করা হইয়াছে যে, আদর্শ বিদ্যালয়ের আদর্শ ছাত্র শ্রীমান বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি সম্প্রতি যে লাঞ্ছনা করা হইয়াছে, তাহার ক্ষালনের জন্য আগামী রবিবার অপরাহ্নে আদর্শ বিদ্যালয়ে এক সভায় তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইবে। উক্ত বিদ্যালয়েরই প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন, সেই সভায় মাননীয় ভূস্বামী শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বাবু যোগদান করিলে অনুষ্ঠাতৃগণ যার পর নাই আনন্দিত

হইবে। অনুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে যে কয়টি নাম লেখা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে রহিম আলি চৌধুরীর নামটিও অন্যতম।

চন্দ্রনাথবাবু অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া রহিমের দিকে পুনরায় চাহিলেন, দেখিলেন, ছেলেটির মুখে ভয় বা সঙ্কোচের চিহ্ন মাত্রও নাই। প্রায় ধমকাইবার ভাবেই তিনি উদ্ধত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—কারা এ সব করছে ?

রহিম বিনীত ভাবে উত্তর দিল,—আজ্ঞে আমরাই।

—কে করতে বলেছে ?

—আমাদের বিবেক, স্যার।

এই উত্তর শুনিয়াই চন্দ্রনাথ বাবু যেন জ্বলিয়া উঠিলেন। একটা কি কঠোর কথাই বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহা হঠাৎ চাপিয়া পরক্ষণেই কহিলেন,—তাহলে বিবেককে বুঝিয়ে দাও—এ সব হবে না।

—কেন, স্যার ?

—আমার ইচ্ছা, আমার হুকুম।

রহিম স্যারের নির্দ্দেশটুকু শুনিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া ধীর অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল,—কিন্তু বিবেক যে বাধা মানে না, স্যার !

চন্দ্রনাথ বাবু রুক্ষকণ্ঠে কহিলেন,—কি বল্‌লে ?

রহিম কহিল,—আমি বলছি, স্যার, অন্যায় যদি হয়, বুঝিয়ে দিলে বিবেক শোনে; কিন্তু যেটা অন্যায় নয়, ঠিক, হাজার বাধা দিলেও বিবেক তা গ্রাহ্য করে না; যা ধরে, তা করেই।

চন্দ্রনাথ বাবু স্তব্ধ হইয়া পুনরায় পূর্ণ দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে চাহিলেন এবং সে দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক যেন তন্ন তন্ন করিয়াই দেখিয়া লইলেন। তাঁহার মত রাসভারি লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহারই ছেলের বয়সী এই ছোকরা এইরূপ স্পর্দ্ধার কথা কহিতে সাহস পায় ;—

তাহার মুখে ভয় বা ভাবনার চিহ্ন মাত্রও নাই! আদালতের প্রাঙ্গনে কিছুদিন পূর্ব্বে এই ছেলেটির পিতার প্রতিভাদৃপ্ত মুখখানা ও সেই মুখের স্পষ্ট কথা চন্দ্রনাথ বাবুর স্মৃতিপথে সহসা ভাসিয়া উঠিল ;—পিতাপুত্রে কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য!

এ চিন্তা ক্ষণিকের, ইহার পরেই যেন বোমা ফাটিয়া গেল। কণ্ঠের স্বর উচ্চ পরদায় চড়াইয়া তিনি এবার তর্জ্জনের ভঙ্গীতেই কহিলেন,—চোপরাও বেয়াদপ ; ভারি যে মুখের দৌড় দেখছি।

কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবুর তর্জ্জনে রহিমের ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদুহাসি ফুটিয়া উঠিল এবং অবিচলিত কণ্ঠেই সে কহিল, আপনি আমার বাবার বয়সী, স্যার, বাপ যদি ধমকায়, ছেলের তাতে রাগ করা উচিত নয়। কিন্তু যেটা অন্যায় নয়, হাজার ধমকালেও ছেলেরা তা থেকে পেছোয় না। ছেলেদের মন নিয়ে ছেলেদের কথা বিচার করতে হয়, স্যার, আপনিও একদিন ছেলে ছিলেন।

চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—ছিলুম কিন্তু আমরা ছেলেই ছিলুম, এ রকম এঁচোড়ে পাকিনি। আমরা ছেলে বয়েসে এই ধরণের কথা বলা ত পরের কথা, ভাবতেও পারিনি।

রহিম ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—কিন্তু স্যার, পঞ্চাশ বছর আগে দেশের যে অবস্থা ছিল, এখনও কি তাই আছে, স্যার? সভা আমাদের হবেই, তবে আপনার পায়ের ধূলো সেখানে পড়লে ছেলেদের উৎসাহ আরো বাড়বে। তা ছাড়া আপনি হচ্ছেন জমিদার, আপনাকে না জানিয়ে কিছু করা উচিত নয়, সেই জন্যই আসা। তাহলে আসি, স্যার!

যে ভাবে আসিয়াই সে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাইয়াছিল, পুনরায় সেইরূপ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

চন্দ্রনাথ বাবু অভিভূতের মতই কিছুক্ষণ দ্বারের দিকে চাহিয়া চুপ

করিয়া বসিয়া রহিলেন। ছেলেটির আকৃতি, আশ্চর্য্যরকম ধীরতার সহিত কথা বলিবার ভঙ্গী এবং প্রতি কথার ভিতর অকাট্য যুক্তি—সত্যই কি তাঁহার চিত্ত স্পর্শ করিয়াছিল? অতীত পঞ্চাশ বৎসরের স্মৃতি ত নানা দিক দিয়াই তাঁহার চক্ষুর উপর জ্বল জ্বল করিতেছে। কত পরিবর্ত্তন, কত সংস্কার প্রগতির পথে কত অঘটনই ঘটাইয়াছে;—কিন্তু পিছনে যাহা ফেলিয়া আসিয়াছেন, আজও কি সেই অবস্থায়ই তাহারা রহিয়াছে! প্রগতির গতি কি শুধু বহির্জ্জগতে, অন্তর্জ্জগতেও কি তাহার দোলা লাগে নাই?

২৬

পরদিন আর শোভার স্কুলে যাওয়া হইল না। স্কুলে যাইবে বলিয়াই সে যথা সময় খাওয়ার পাঠ সারিয়া লইল; কিন্তু তাহার পরই হঠাৎ সে মাথা ধরাইয়া বসিল। মাকে কহিল,—মাথাটা কি রকম করছে মা, আজ আর ইস্কুলে যাব না।

বাহিরের ঘরে আগের দিন মেয়ে যে কাণ্ড বাধাইয়াছিল, তাহার ভাবনা মায়ের মন হইতে এখনও মুছে নাই; সর্ব্বদাই ভয় হইতেছিল, পাছে ইহা হইতে ফিটের ব্যামো দেখা দেয়। আজ মেয়ের মুখে পুনরায় মাথা কেমন করিতেছে শুনিয়া তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ মেয়ের কথায় সায় দিয়া কহিলেন,—কাজ নেই গিয়ে, চুপটি করে ঘরে শুয়ে থাকো, একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।

শোভা কহিল,—তাই যাচ্ছি মা। আমাকে যেন ডেকো না।

নিজের ঘরে গিয়াই শোভা দরজা বন্ধ করিল, ভিতর হইতে খিলটিও আঁটিয়া দিল। তাহার পর বাঁধানো বইখানা পাড়িয়া মাথার কাজ আরম্ভ করিল। পূর্ব্ব হইতেই সে মনে মনে ঠিক দিয়া রাখিয়াছিল, আজ

স্কুল কামাই করিয়া পরির ফরমাজটি সে শেষ করিয়া ফেলিবে। কালই সেটি লইয়া তাহার হাতে দিবে।

ঘণ্টা খানেক পরে অখিল আসিল শোভাকে ডাকিতে। সে শুনিয়াছিল, শোভা আজ স্কুল কামাই করিয়াছে। শোভার মা অখিলকে দেখিয়াই কহিলেন,—তার ভারি মাথা ধরেছে, বাবা, তাই ঘুমুচ্ছে; এখন আর তুলো না। আমি ত ভেবেই সারা হচ্ছি—এ থেকে না আর কিছু হয়।

অখিল বিমর্ষ ভাবেই ফিরিয়া গেল। অনেকগুলি নূতন খবর সংগ্রহ করিয়াই সে আসিয়াছিল, তাহা আর তাহাকে শুনানো হইল না।

প্রায় ছয়ঘণ্টা খাটিয়া একখানা পুরা খাতার কাগজগুলি নষ্ট করিয়া অবশেষে শোভা বিশুদাকে অভিনন্দন দিবার একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। ইহার ফল আর কিছু না হউক, একটি দিনের এই সাধনায় পাঠস্পৃহাটা তাহার প্রবল হইয়া উঠিল। স্কুলের বই ছাড়াও যে পড়িবার মত বই আছে এবং সেই সকল বইয়ের ভিতর কত রহস্যই লুকানো আছে, এই দিন হইতে সে বুঝি তাহার সন্ধান পাইল।

বৈকালে সে যখন ঘরের খিল খুলিয়া বাহির হইল, মা কহিলেন,—মুখখানা যে একেবারে শুখিয়ে গেছে রে! কেমন আছিস্ এখন?

শোভা কহিল,—মাথা ছেড়ে গেছে, মা, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে এখন।

মা কহিলেন,—পাবে না আর! কোন্ সকালে দুটি হাতে মুখে করেছিস,—আয়।

খানিক পরেই অখিল আসিয়া উপস্থিত। কহিল,—ছাতের ওপর ।, অনেক কথা আছে।

যে কথাগুলি খুব আড়ম্বর করিয়া অখিল শোভাকে শুনাইল, তাহার এই যে, তাহার বাবা কিছুতেই সভা করিতে দিবেন না। স্কুলের

মাষ্টারকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে ধমকাইয়া দিবেন, তিনি যাহাতে মাথা না দেন। আর মংচুকে বলিয়া দিয়াছেন যে, বিশে ডাকাত একটু বাড়াবাড়ি করিলেই যেন তাহাকে সায়েস্তা করিয়া দেয়। শোভাকেও শীঘ্রই স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আনা হইবে। মংচুই তাহাকে পড়াইবে।

শোভা চুপ করিয়া অখিলের খবরগুলি শুনিল। আর কোনও বিষয়ে সে কোন কথাই কহিল না, কিন্তু মংচুর কাছে তাহার পড়িবার কথা শুনিবামাত্রই সে ফোঁস করিয়া উঠিল। তীব্র আপত্তির ভঙ্গীতে কহিল, —বয়ে গেছে আমার ওর কাছে পড়তে।

অখিল মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিল,—পড়ব না বললেই হল আর কি! বাবা বলেছেন—পড়তে হবে।

শোভা কহিল,—পড়তে হয় আমি নিজে নিজেই পড়বো, তা বলে তোমার কচু-ঘেঁচুর কাছে গিয়ে পড়বো না এ আমি বলে রাখছি।

অখিল কহিল,—বাবার কথাও তাহলে শুনবিনি বল?

আমি জানি না—বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল। হঠাৎ উঠানটির দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল, প্রাচীরটা আরও হাত দুই উঁচু হইয়া উঠিয়াছে দেখা গেল। নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি একটা চাপা নিশ্বাস এতক্ষণে সশব্দে নির্গত হইয়া গেল। ইহার পরেই ম্লান মুখখানা তুলিয়া সোজাসুজি সম্মুখের দিকে চাহিতেই সে চমকিয়া উঠিল! ওকি,— তাহার বিশুদা যে ঠিক সেই জায়গাটিতে সেই দিনের মত দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু আজ তাহার মুখ ও চক্ষু দিয়া সেদিনের মত উৎসাহ ত ফুটিয়া উঠে নাই, তবে কি উঠানের পাঁচীলটা তাহারও মুখের হাসি মনের উৎসাহ সমস্তই রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে! আজ যেন মনে হইতেছে একটা নিষ্প্রাণ পুতুল ওপারের খোলা বারান্দাটির উপর শুধু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

অখিলের তীক্ষ্ণস্বরে তাহার মনের এই চিন্তাটুকু সহসা ভাঙ্গিয়া গেল।

—দুজনের দশাই সমান; কিন্তু আর দুটো দিন, তার পরই জেলখানা।

মুখখানা সবেগে ঘুরাইয়া সে অখিলের দিকে চাহিল; অখিলের মনে হইল, শোভার দুই চক্ষু দিয়া যেন আগুনের কণা ঠিকরাইয়া আসিতেছে।

সে হাসিয়া কহিল,—বাপরে—যেন আকাশের ষ্টার!

টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল্ ষ্টার,
হাউ আই ওয়াণ্ডার, হোয়াট'য়ু আর!

শোভা মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিল,—সঙ!

অখিল পূর্ব্ববৎ হাসিয়া কহিল,—ঐ দ্যাখ, আমার আবৃত্তি শুনেই বিশে ডাকাত ভেগেছে।

শোভা চাহিয়া দেখিল, সত্যই সম্মুখের বারান্দা শূন্য, বিশুর চিহ্নও সেখানে নাই।

পরদিন বিদ্যালয়ে দেখা হইতেই পরি জিজ্ঞাসা করিল,—কি হয়েছিল রে তোর? দাদার মুখে শুনলুম, তুই রুগীর মত একখানা চেয়ারে পড়েছিলি! অসুখ করেছিল?

শোভা তাহাকে সব কথাই খুলিয়া বলিল, মংচুর কথাও বাদ পড়িল না। পূর্ব্বেই সে স্বপ্নের কথা তাহার প্রিয় সখীটির নিকট একদিন আর্ত্ত-কণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছিল; আজ তাহাকে শুনাইয়া দিল—স্বপ্নের দেখা সেই দস্যি ছেলেটাই ঐ মংচু। মাগো! তাহাকে দেখিয়াই যে তাহার মাথাটা ঘুরিয়া গিয়াছিল।

পরি কহিল,—দাদাও তাকে দেখে এসেছে। যতক্ষণ দাদা সেখানে

ছিল, তোর অখিলদা তাকে ফিস্ ফিস্ করে কি বলে, তার পরই দাদার দিকে তোর ঐ মংচুর কি কটমট করে চাউনি। দাদা বললে, ছেলেটা পাজী। তুই কিন্তু ওর সঙ্গে মিশিসনি, খুব সাবধানে থাকিস্।

শোভার বুকের ভিতরটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি কহিল,—তবে বলি শোন্, ভাই, অখিলদা সব কথা ঐ লোকটার সম্বন্ধে বলেছে।

অতঃপর শোভা মংচুর সম্বন্ধে অখিলের নিকট এ পর্য্যন্ত যাহা শুনিয়াছিল, একটি একটি করিয়া সমস্তই বলিয়া ফেলিল।

পরি হাসিয়া কহিল,—বুঝিছি, অখিলের বাবা ঐ মংচুটাকে আনিয়েছে ছেলের বডি গার্ড করে রাখতে। লোকে যেমন দরোয়ান রাখে, ডালকুত্তা পোষে, এও তাই।

শোভা কহিল,—এবার ওরা আমাকে নিয়ে পড়েছে, ভাই। বলাবলি আরম্ভ করেছে, স্কুলে গিয়ে আর কায নেই, মংচু বাড়ীতেই পড়াবে। আমি বলিছি, কিছুতেই ওর কাছে পড়বো না।

পরি কহিল,—সত্যি, এতে রাগ হবারই কথা। কিন্তু রাগ করেই বা করবি কি বল ?

শোভার দুই চক্ষু ছল ছল হইয়া আসিল। কাঁদিবার মত হইয়াই সে কহিল,—বিশুদার সঙ্গে মেলামেশার পথে ওরা কাঁটা দিয়েছে, এর পর তোর সঙ্গেও যাতে আর দেখা না হয়, তাই এ রাস্তাও বন্ধ করে দিচ্ছে। কি করে আমি থাকবো ভাই ?

পরি কহিল;—সবই ঈশ্বরের হাত, ভাই! তাঁকে ডাক ; উপায় তিনিই করে দেবেন।

টিফিনের ছুটির সময় আবার সাক্ষাৎ হইলে পরি প্রথমেই লেখার কথা পাড়িয়া কহিল,—কি হল, এনেছিস লিখে।

শোভা তাহার হাতের বড় বড় আঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা কাগজ কখানা পরির হাতে দিয়া কহিল,—লিখিছি, কিন্তু ভাই ছাই হয়েছে!

পরি এক নিঃশ্বাসে লেখাটি পড়িয়া কহিল,—ছাই হবে কেন, খাসা হয়েছে; বাঃ! এখন মনে হচ্ছে, কুসুমও এমন করে প্রাণের কথা লিখতে পারত না।

শোভা কহিল,—বুঝিছি ঠাট্টা হচ্ছে!

পরি কহিল,—ও বদ অভ্যেস আমার নেই, ভাই! আমার বাবা বলেন, কারুর কাযে কখনো ঠাট্টা করতে নেই; ক্ষমতা থাকে উৎসাহ দিয়ো, শুধরে দিও, কিন্তু উপহাস করে কখনো দমিয়ে দিয়ো না।

শোভা কহিল,—তাহলে বাঁচলুম ভাই, যা করবার তুই করিস।

পরি কহিল,—এটা আমার কাছে আজ থাক। দেখে শুনে কাল তোকে ফিরিয়ে দেব। তারপর তুই ভালো করে লিখে শনিবারের ভেতরে আমাকে ফিরিয়ে দিবি।

শোভা কহিল,—সভা তাহলে ঐ দিনই হচ্ছে?

পরি কহিল,—হবে না? দাদা যে এর মধ্যেই সব ঠিক ঠাক করে ফেলেছে, কেন, তুই ত সবই শুনিছিস্!

শোভা কহিল,—কিন্তু ভাই কাল অখিলদা আমাকে ডেকে বলছিল যে, ওর বাবা কিছুতেই এ সভা করতে দেবে না। মাষ্টারকেও নাকি ডেকে মানা করে দেবে।

পরি কহিল,—দেবে কি, দিয়েছিল। কিন্তু মাষ্টার তাতে কাণ দেয় নি। সভা বন্ধ করবার অনেক চেষ্টাই উনি করেছেন, আর এখনও করছেন, কিন্তু মাষ্টার মশায়েরও রোক চেপে গেছে; তিনি বলেছেন, সভা হবেই।

সত্যই, এই সভাটি বন্ধ করিবার জন্য চন্দ্রনাথ বাবু নানাপ্রকার চেষ্টা

ও উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার যাবতীয় প্রয়াসই ব্যর্থ হইয়া গেল।

প্রধান শিক্ষককে ডাকাইয়া তিনি হাকিমী মেজাজে হুমকী দিয়াছিলেন। কিন্তু শিক্ষক মহাশয় তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে সেবার বিদ্যালয়ে পুলিসের ঘাঁটী বসাইয়া যে অন্যায় করা হইয়াছে, তাহারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ উক্ত বিদ্যালয়ে এই সভা বসাইবার প্রয়োজন হইয়াছে।

চন্দ্রনাথ বাবু ইহার প্রতিবাদে আইনের দিক দিয়া নানাবিধ ভীতিজনক নির্দ্দেশ দিলেন, আয়ের পথ রুদ্ধ করিবার আভাস জানাইলেন, এমন কি বিদ্যালয়টি বন্ধ করিয়া দিবার আশঙ্কা পর্য্যন্ত দেখাইলেন, কিন্তু প্রধান শিক্ষক শেষ পর্য্যন্ত অটল রহিলেন। তিনি চন্দ্রনাথ বাবুকে দৃঢ়তার সহিত জানাইয়া দিলেন,—আদালতের আবহাওয়া আপনার মনোবৃত্তিকে বিকৃত ও দূষিত করেছে বলেই আপনি আইনের সাহায্য নিয়ে শিক্ষায়তনের ওপর আপনার কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করতে ব্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, বর্ত্তমানের রুচি ও আদর্শ বিরোধী কর্ত্তৃত্ব প্রকাশের চেষ্টা না করে, এই আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির সংস্রব ত্যাগ করে আপনার পক্ষে আইনের ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করাই উচিত।

পত্র পুষ্পে সুশোভিত বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে নির্দ্দিষ্ট দিনেই সভার অধিবেশন হইল। বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই ছাত্র সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, বাহির আনন্দপুরের মুসলমানগণও হাতে খড়ি দিয়া এই বিদ্যালয়ে নাম লিখাইয়াছে। বিশুর সম্বর্দ্ধনা উৎসবে ইহাদের উৎসাহই বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য।

বিশুকে উপহার দিবার জন্য পূর্ব্বেই বাহির-আনন্দপুরের মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে চুপি চুপি এক আলোচনা বৈঠক বসে এবং তাহাতে

সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, এ অঞ্চলের প্রত্যেক পড়ুয়া সভার দিন বিশুকে কিছু না কিছু উপহার দিবে।

সভার প্রাক্কালে সকলেই দেখিল, বিবিধ উপহার দ্রব্যে সভাপতির সম্মুখের টেবলখানি ভরিয়া গিয়াছে। নানা রকমের জামা, রুমাল, কত প্রকার বই, সুন্দর সুন্দর মসীপাত্র, কলমদানী, ঘড়ি প্রভৃতি উপহার সামগ্রীর পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে রহমান আলি এমন কতকগুলি মূল্যবান অথচ ছাত্র জীবনে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাঠাইয়াছিলেন, এ অঞ্চলে যাহা এ পর্য্যন্ত পরিচিত হইবার সুযোগ পায় নাই।

রহিম এই অনুষ্ঠানটির নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, আরও কতিপয় ছাত্র তাহারই সাহচর্য্য করিতেছিল। সম্বর্দ্ধনা বিশুর, সুতরাং তাহাকে এ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। আনন্দপুর ও বাহির-আনন্দপুরের প্রত্যেক অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিকেই সভায় যোগ দিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, সন্নিহিত গ্রামগুলির বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও আহূত হইয়াছিলেন। এই নিমন্ত্রণে এইটুকু বৈশিষ্ট্য ছিল যে, নিমন্ত্রণ পত্র ছাপানো হয় নাই, ছেলেরাই হাতে লিখিয়া বিলি করিয়াছিল। ফলতঃ এই অনুষ্ঠানটিকে উপলক্ষ করিয়া এই অঞ্চলে রীতিমত চাঞ্চল্যই উপস্থিত হইয়াছিল।

কিন্তু যে নিয়মে সাধারণ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়, এক্ষেত্রে সেরূপ কিছু হইল না। প্রধান শিক্ষক মহাশয় জানাইলেন,—বাহ্যাড়ম্বরের কোনও প্রয়োজন নাই, যে জন্য এই অনুষ্ঠান, তাহাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা চাই। সুতরাং সভাপতি নির্ব্বাচন, একজনের প্রস্তাব ও সেই সূত্রে তাঁহার বক্তৃতা, আর একজনের তাহা সমর্থন এবং সমর্থন করিতে উঠিয়া তাঁহারও কতকগুলি কথা শুনাইয়া দেওয়া—সভায় এ সকল কিছুই হইল না। এমন কি, পরির যে কবিতা পড়িবার কথা ছিল এবং শোভার লিখিত

সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, এ অঞ্চলের প্রত্যেক পড়ুয়া সভার দিন বিশুকে কিছু না কিছু উপহার দিবে।

সভার প্রাক্কালে সকলেই দেখিল, বিবিধ উপহার দ্রব্যে সভাপতির সম্মুখের টেবলখানি ভরিয়া গিয়াছে। নানা রকমের জামা, রুমাল, কত প্রকার বই, সুন্দর সুন্দর মসীপাত্র, কলমদানী, ঘড়ি প্রভৃতি উপহার সামগ্রীর পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে রহমান আলি এমন কতকগুলি মূল্যবান অথচ ছাত্র জীবনে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাঠাইয়াছিলেন, এ অঞ্চলে যাহা এ পর্য্যন্ত পরিচিত হইবার সুযোগ পায় নাই।

রহিম এই অনুষ্ঠানটির নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, আরও কতিপয় ছাত্র তাহারই সাহচর্য্য করিতেছিল। সম্বর্দ্ধনা বিশুর, সুতরাং তাহাকে এ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। আনন্দপুর ও বাহির-আনন্দপুরের প্রত্যেক অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিকেই সভায় যোগ দিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, সন্নিহিত গ্রামগুলির বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও আহুত হইয়াছিলেন। এই নিমন্ত্রণে এইটুকু বৈশিষ্ট্য ছিল যে, নিমন্ত্রণ পত্র ছাপানো হয় নাই, ছেলেরাই হাতে লিখিয়া বিলি করিয়াছিল। ফলতঃ এই অনুষ্ঠানটিকে উপলক্ষ করিয়া এই অঞ্চলে রীতিমত চাঞ্চল্যই উপস্থিত হইয়াছিল!

কিন্তু যে নিয়মে সাধারণ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়, এক্ষেত্রে সেরূপ কিছু হইল না। প্রধান শিক্ষক মহাশয় জানাইলেন,—বাহ্যাড়ম্বরের কোনও প্রয়োজন নাই, যে জন্য এই অনুষ্ঠান, তাহাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা চাই। সুতরাং সভাপতি নির্ব্বাচন, একজনের প্রস্তাব ও সেই সূত্রে তাঁহার বক্তৃতা, আর একজনের তাহা সমর্থন এবং সমর্থন করিতে উঠিয়া তাঁহারও কতকগুলি কথা শুনাইয়া দেওয়া—সভায় এ সকল কিছুই হইল না। এমন কি, পরির যে কবিতা পড়িবার কথা ছিল এবং শোভার লিখিত